কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

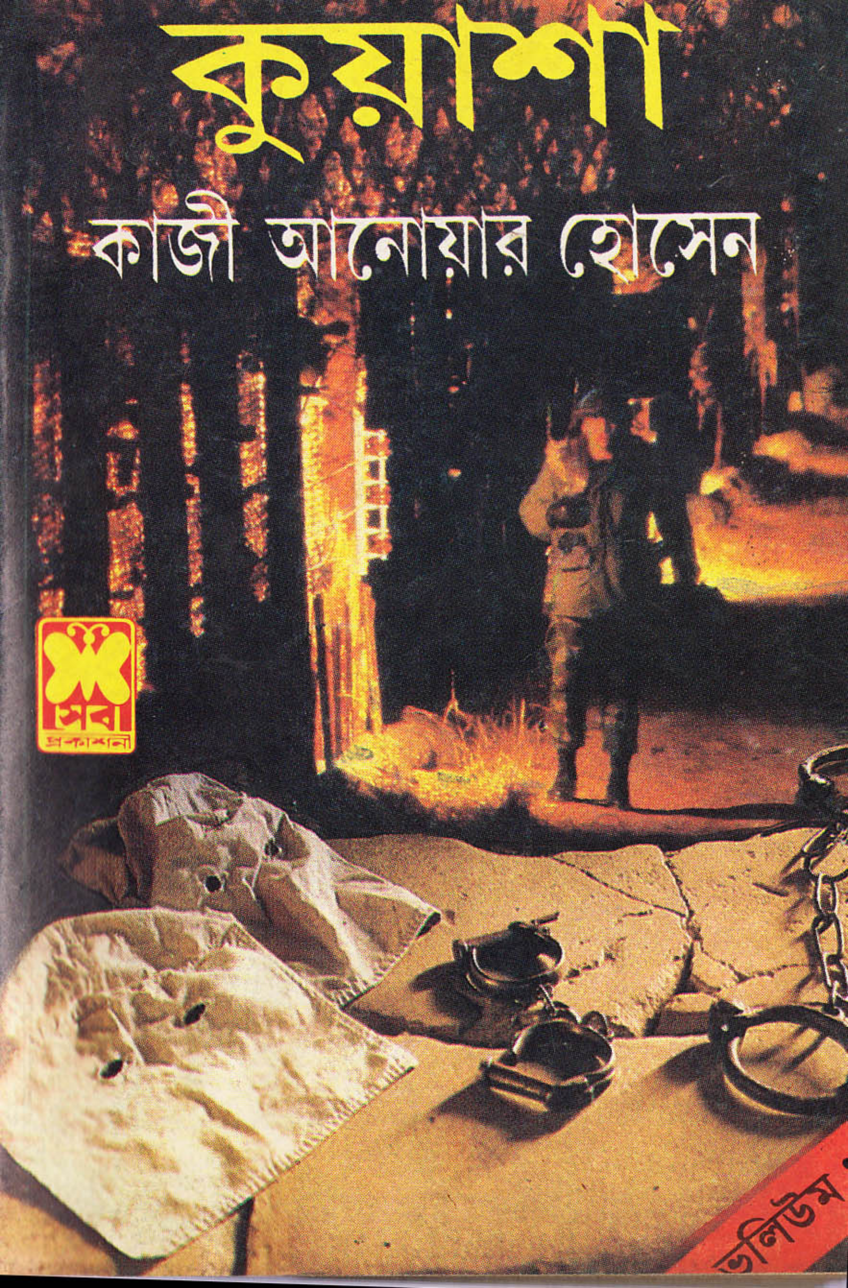

সেবা
প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

ISBN 984-16-1101-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: শরাফত খান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 11
KUASHA SERIES: 31, 32, 33
By: Qazi Anwar Husain

সূচি

কুয়াশা ৩১ —— ৫
কুয়াশা ৩২ —— ৬০
কুয়াশা ৩৩ —— ১০৯

কুয়াশা ৩১

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

এক

চৌধুরী পরিবারে বাহ্যত কোন অশান্তি ছিল না।

চৌধুরী সাহেবের বয়স হয়েছে। দুই ছেলের পিতা তিনি, এবং তিন মেয়ে তাঁর। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। তিন মেয়ের মধ্যে দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ছেলে এবং ছোট মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে, কিন্তু এদের দু'জনের বিয়ে তাড়াতাড়ি হবে বলে মনে হয় না। তা না হোক, সে ব্যাপারে চৌধুরী সাহেবের বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নেই আপাতত। ছোট ছেলের ব্যাপারটা হল এই যে সে এখনও চঞ্চল। আর ছোট মেয়েটি এখনও পড়াশোনা করছে।

খারাপ অবস্থা থেকে জীবন শুরু করেছিলেন চৌধুরী সাহেব। খারাপ অবস্থা থেকে ভাল অবস্থায় পৌঁছেছেন তিনি। জীবনে কষ্ট করলে প্রতিদান পাওয়া যায়ই। চৌধুরী সাহেব জীবনে কোনদিন চাকরি করেননি। খাওয়া পরার কষ্ট গেছে দিনের পর দিন, তবু চাকরি করার মনোবৃত্তি শিকড় গাড়েনি কোনদিন তাঁর মধ্যে। ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। হোক স্বল্প পুঁজি, তবু তো নিজের ব্যবসা।

ধীরে ধীরে, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসেবে চৌধুরী সাহেব বড় হয়েছেন। প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন তিনি। ব্যাঙ্কে নগদ টাকা রয়েছে লাখখানেক। ছোটখাট একটা ইণ্ডাস্ট্রি দাঁড় করিয়েছেন তিনি। আজ বয়স হয়েছে। নিজে আর কারখানা দেখাশোনা করতে পারেন না। ছেলে উপযুক্ত হয়েছে। সে-ই দেখাশোনা করে। বড় ছেলের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা। এমন ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। সংসারী, মিতব্যয়ী, শান্ত প্রকৃতির। চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলের বিয়েও দিয়েছেন তেমনি দেখে। গরীবের মেয়েকে ছেলের বউ করে এনেছেন তিনি। সুন্দরী বউ। সংসারী বউ।

মেয়ে দুটোর বিয়ের ব্যাপারেও একটু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন চৌধুরী সাহেব। দুই মেয়েরই বিয়ে দিয়েছেন ভাল এবং আত্মীয়স্বজনহীন দুই ছেলে দেখে। মেয়েদের দূরে পাঠিয়ে দিতে হবে বিয়ে দিয়ে, এ চিন্তা দুর্বল করে ফেলত চৌধুরী সাহেবকে। তাই নিজের বাড়ির দুই পাশে দুই জামাইকে চমৎকার দুটো বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। দুই জামাই সেই বাড়ি দুটোতেই বসবাস করে সানন্দে। ছোট মেয়ের জন্যেও জমি রাখা আছে।

জামাইদের মধ্যে বড় জামাইটার অবস্থা একটু খারাপ। খারাপ আগে ছিল না। কারবারে ফেল মেরে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। চাকরি করে এখন। মেজ জামাই একটা হোটেল অ্যাণ্ড বারের অংশীদার এবং ম্যানেজার। ভাল আয় তার। দুই জামাইয়ের চরিত্র দেখেই বিয়ে দিয়েছেন চৌধুরী সাহেব। বড় জামাই আজকাল কেমন যেন বিরস মুখ করে থাকে বটে, কিন্তু আগে সে এমনটি ছিল না। ছোট জামাই আগের মতই আছে। দিলদরিয়া, উদার, হাসি খুশিতে ভরপুর।

বড় ছেলের খোকা হয়েছে একটা। নাতিকে নিয়েই আজকাল চৌধুরী সাহেবের সারাদিন কাটে। রাতে পড়াশোনা করেন। আনন্দময়, স্বস্তিময় জীবন। সুখী মানুষ তিনি। কোথাও কোন সমস্যা নেই। কোথাও কোন অশান্তি নেই।

কিন্তু চৌধুরী সাহেবের 'হ্যাপি কটেজ'-এ সমস্যার এবং ভীতিকর মারাত্মক অশান্তির আগুন তলে তলে বিস্তার লাভ করছিল। প্রথমে যে ঘটনাটি সূচনা হিসেবে লক্ষ করা যায় সেটি হল বড় জামাইয়ের টাকা প্রার্থনা। শ্বশুরের কাছ থেকে কিছুদিন ধরে দশ হাজার টাকা চেয়ে আসছে বড় জামাই রুহুল আমিন। নতুন করে ব্যবসা আরম্ভ করতে চায় সে। চৌধুরী সাহেব এখনও কোন কথা দেননি। শাশুড়ি কিন্তু টাকা দেবার পক্ষে। কিন্তু রুগ্ন স্ত্রীর চেয়ে চৌধুরী সাহেব, বড় ছেলে সালাম চৌধুরী এবং ছোট ছেলে জামাল চৌধুরীর মতামতের দাম বেশি দেন। ছেলেরা তাঁর বড় হয়েছে। সংসারের ভালমন্দ নির্ধারণ করবে এখন তারাই। তাদের কথা ফেলে রুগ্ন স্ত্রীর কথায় বড় জামাই রুহুল আমিনকে এককথায় দশ হাজার টাকা দিয়ে দিতে পারেন না চৌধুরী সাহেব। দুই ছেলেই টাকা দেবার ব্যাপারে ঘোর বিরোধী। মেজ জামাই আবদুর রশিদকে নিয়ে কোন সমস্যাই নেই। যদিও বড় জামাইকে টাকা দিলে সে-ও দাবি করবে না এমন নয়।

এই পরিবারটির অভ্যন্তরে গোপনীয় আরও কয়েকটি কারণ সৃষ্টি হয়েছে, যে কারণগুলো মারাত্মক আগুন জ্বালবে অচিরেই। বড় জামাই তার জীবনের একমাত্র মূল্যবান একটি জিনিস হারাতে যাচ্ছে। মেজ জামাই হোটেল অ্যাণ্ড বারে চাকরি করে, সুতরাং মদ্যপান করে এবং বেআইনী উপায়ে তার রোজগার প্রচুর। ছোট ছেলেও মদ পান করে, জুয়া খেলে। ছোট মেয়ে ফিরোজা করে প্রেম। পাড়ারই একটি গরীব অথচ স্বাস্থ্যবান, বেপরোয়া, উদ্যমী, সপ্রতিভ এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক যুবকের সঙ্গে। যার অনেক বদনাম এবং যার সম্পর্কে পাড়ার বয়স্ক লোকেরা কঠোর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া বড় ছেলে তার শ্বশুর এবং শাশুড়িকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে আসছে মা-বাবার অজান্তে। এসব কারণ এবং এসব ঘটনার কথা প্রকাশিত নয় চৌধুরী সাহেবের কাছে। শুধু চৌধুরী সাহেবের বেলায় একথা খাটে না, খাটে অনেকের বেলাতেই। কেউ একটা কথা জানে, বাকিগুলো জানে না। বেশির ভাগই জানে না কেউ। পরস্পরের চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে পরস্পর প্রায় অজ্ঞই বলা চলে।

সেদিন ছোট ভাই জামাল কলেজ থেকে ছোট বোন ফিরোজাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। গাড়ি করেই ফিরছিল ওরা। জামাল গিয়েছিল ফ্যাক্টরিতে। বড়দার কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি আসার পথে কলেজ থেকে তুলে নিয়েছিল ফিরোজাকে।

দুই ভাই বোন অনর্গল গল্প এবং হাসিতে মশগুল হয়ে ফিরছিল। দু'জনের কেউই ভাবেনি একটু পর কি থেকে কি ঘটবে। পাড়ার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল গাড়ি। পাড়ার ক্লাবের পাশ ঘেঁষে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা। ক্লাবের দরজায় এসে দাঁড়াল লম্বা, ফর্সা, স্বাস্থ্যবান শফিক। উজ্জ্বল, সপ্রতিভ দুটি চোখ শফিকের। পাড়ার স্কুল-কলেজের ছাত্ররা শফিকদা বলতে অজ্ঞান। পাড়ার ক্লাব তথা লাইব্রেরির স্রষ্টা। পাড়ার প্রাণ এই শফিক। অন্যায়, অবিচারের যম। দরকার হলে গুরুজনদেরকেও শাসিয়ে দেয়। মারামারিতেও ওস্তাদ। বয়স্ক ডানপিটেই বলা যায়। এই শফিকই চৌধুরী বাড়ির ছোট মেয়ে ফিরোজার প্রেমিক।

ক্লাবের দরজায় দাঁড়িয়ে ফিরোজার দিকে তাকিয়ে রইল শফিক। ফিরোজা তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল লজ্জায়। ছোটদা দেখে ফেললে সব জানাজানি হয়ে যাবে এই ভয়ে। শফিক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দুষ্টুমি করে একটু শব্দ করেই হেসে ফেলল। সেই হাসির শব্দে গাড়ি চালাতে চালাতে জামাল তাকাল শফিকের দিকে। শফিক তখনও হাসছে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরোজার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ কি যে হল, পা থেকে মাথা অবধি আগুন জ্বলে উঠল জামালের। রাগে লাল হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। এই ছোকরা যে পাড়ার হিরো তা সে জানে। ছোকরার হাবভাব তার কোনদিনই ভাল ঠেকেনি। আজ তার ছোট বোনের দিকে বেহায়ার মতো তাকিয়ে হাসছে দেখে আগুন জ্বলে উঠল তার সর্বশরীরে। কি করবে ভেবে না পেয়ে ব্রেক কষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ফেলল জামাল। ফিরোজা কিছু একটা সন্দেহ করে প্রায় আঁতকে উঠে জানতে চাইল, 'কি হল, ছোটদা!'

'দাঁড়া, হারামজাদাটাকে শিক্ষা দিয়ে দিই! মেয়েছেলের দিকে তাকিয়ে হাসা ওর আমি বের করছি!'

জামাল ঝট্ করে খুলে ফেলল গাড়ির দরজা। ফিরোজা চমকে উঠে ধরে ফেলল জামালের হাত। বলে উঠল, 'এই ছোটদা, তোমার দুটো পায়ে ধরি—দাঁড়াও!'

জামাল ফিরোজার হাতটা ছাড়িয়ে নিল ঝাঁকানি দিয়ে। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে সে। হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে সে ক্লাবটার দিকে।

ক্লাবের দরজায় শফিক তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বিমূঢ় আকার নিয়েছে ইতিমধ্যে তার মুখ। ফিরোজার দিকে তাকিয়ে সে হেসেছে এবং ওর ছোটদা তা দেখে ফেলে রেগে গেছে, এটুকু বুঝতে না পারার কথা নয়। কিন্তু শফিক বিপজ্জনক কিছু একটা আশঙ্কা করেনি। বড় জোর দুকথা রাগের মাথায় শুনিয়ে

চলে যাবে জামাল চৌধুরী, এই ভেবেছিল সে। কিন্তু জামাল সরাসরি তার সামনে দাঁড়িয়েই শার্টের কলার চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'তোকে কেউ কিছু বলে না বলে মাথায় চড়ে গেছিস, নারে বাঁদর! মেরে হাড়-গোড় গুঁড়ো করে দিতে পারি, তা জানিস!'

শফিক প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। জামাল চৌধুরী যে তাকে এভাবে সম্বোধন করে তার শার্টের কলার চেপে ধরে ঝাঁকানি দেবে তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ক্লাবের দরজার উপর থেকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে আনল জামাল তাকে। ক্লাবের ভিতর থেকে চার পাঁচজন যুবক ছুটে এল। তাদের শফিকদাকে কেউ মারধর করছে, এ যে অবিশ্বাস্য!

শফিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠল। অপমানে গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে তার। থমথমে গলায় ও শুধু বলে উঠল, 'শার্ট ছাড়ুন আমার। যা বলতে চান ভালভাবে বলুন।'

'মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হারামীপনা করা হয়, তোর সাথে আবার ভালভাবে কি কথা বলব রে, হারামজাদা!'

চিৎকার করে উঠল জামাল। সঙ্গে সঙ্গে বসিয়ে দিল প্রচণ্ড এক ঘুসি শফিকের মুখে। গাড়ির দরজা খুলে ফিরোজা সেই সময়ই বের হয়ে এল। আর্তকণ্ঠে ককিয়ে উঠল, 'ছোটদা, তুমি…!'

শফিক এবং জামালকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন যুবক। শফিক অনড় দাঁড়িয়ে আছে। জামাল অনর্গল গালাগালি দিয়ে চলেছে। হঠাৎ এলোপাতাড়িভাবে কয়েকটা চড়ও বসিয়ে দিল শফিকের গালে। দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করছে শফিক। মাঝে মাঝে সে শুধু তাকাচ্ছে ফিরোজার দিকে। যা ঘটেছে তার এক হাজার ভাগের এক ভাগও সহ্য করার ছেলে নয় শফিক। তবু আজ তাকে সয়ে যেতে হচ্ছে এত মারাত্মক এবং দুঃসাহসিক অপমান। সে কেবল ফিরোজার খাতিরে। ফিরোজার ভাই না হলে এতক্ষণ জামাল চৌধুরীকে পাওয়া যেত না, তার লাশ পড়ে থাকত রাস্তার ওপর।

ফিরোজা ভিড় ঠেলে এগোতে চাইছে। রীতিমত কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে সে। কিন্তু যুবকদল তাকে পথ করে দিচ্ছে না। জামাল চৌধুরীকে পালাবার সুযোগ করে দিতে রাজী নয়। শফিকের একটা ইঙ্গিতের জন্য শুধু অপেক্ষা করছে ওরা। ইঙ্গিত পেলেই খতম করে ফেলবে জামাল চৌধুরীকে।

শফিক আবার মৃদু স্বরে শার্ট ছেড়ে দিতে বলল জামালকে। নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে শার্ট ভিজে গেছে শফিকের। জামাল বারবার দাবি জানাচ্ছে, 'মাফ চা আমার কাছে, তা না হলে খুন করে ফেলব বলছি!'

এমন সময় জামালের দুই ভগ্নিপতি বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ল। ভিড় ঠেলে ওদের দু'জনের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। প্রথমেই দু'জনে মিলে ওদেরকে ছাড়িয়ে

নিল। তারপর কারণ জিজ্ঞেস করবার পালা। একতরফা কথা বলে গেল জামাল। শফিক একটি কথাও উচ্চারণ করল না। জামালের দিকে শুধু তাকিয়ে রইল সে। তার বিস্ময় এখনও কাটেনি যেন। যুবকদের মধ্যে সকলেই জামালের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করল। বড় ভগ্নিপতি রুহুল আমিন বলল, 'এ কাজ করা উচিত হয়নি মোটেই। মারামারি না করাটাই উচিত ছিল। এক পাড়ায় বাস করি আমরা সবাই, কেউ কোন অন্যায় আচরণ করলে তার বিচার করা উচিত।'

মেজ জামাই কিন্তু উল্টো কথা বলল। ফোঁস করে উঠে বলে উঠল সে, 'বিচার আবার কিসের, শুনি? মেয়েদের দেখে শয়তানি করার মজা বুঝিয়ে না দিলে এরা ধরাকে সরা জ্ঞান করবে না? ঠিক করেছে জামাল, কয়েকটা দাঁত ভেঙে দিতে পারলে আরও ভাল হত।'

পাড়ার বয়স্ক লোকেরা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে জমায়েত হয়েছেন। তাঁরা মেজ জামাইকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। প্রকৃতপক্ষে মেজ জামাইকে সমর্থন করলেন তাঁরা। শফিক এবারও মুখ খুলল না। যাই হোক, দুই ভগ্নিপতি জামাল এবং ফিরোজাকে নিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে। মেজ জামাই ফেরার পথে বারবার বলতে লাগল, 'ঠিক করেছ তুমি জামাল, হারামজাদাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছ।'

বড় জামাই শুধু বলল, 'মোটেই ভাল কাজ হয়নি এটা। বড় সাংঘাতিক প্রকৃতির ছেলে সে। জামাল, তুমি রাত করে বাড়ি ফেরো,বলা যায় না কি সর্বনাশ ও করে বসে তোমার। সাবধানে চলাফেরা করো তুমি ক'দিন।'

জামাল বড় ভগ্নিপতি রুহুল আমিনের কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল।

এ ব্যাপারটা বাড়িতে বিশেষ আর আলোচিত হল না। প্রতিক্রিয়া যা হল তা কেবল ফিরোজার। খেল না ও দুপুরবেলা। ভাবী জিজ্ঞেস করাতে দরজা খুলল বটে, কিন্তু শরীর ভাল নয় বলে এড়িয়ে গেল। মেজ জামাই আবদুর রশিদ একবার ঢুকল ফিরোজার ঘরে। ছোট শালীর সঙ্গে রসিকতা করে বলল, 'বাপরে বাপ, রাস্তার একটা বখাটে ছেলের জন্যে ছোট রানীর এমন কান্না! আমি তো ভাবলাম কিনা কি। তা ফিরোজা, কোন মেন্টাল উইকনেস ফিল করছ নাকি ছোকরা সম্পর্কে? সাবধান কিন্তু, ওসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। মেয়েরা ঝট্‌পট্ প্রেমে পড়ে যায় এরকম পরিস্থিতিতে।'

ফিরোজা কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল। হাঃ হাঃ করে বাড়ি মাত করা হাসি হেসে আবদুর রশিদ ফিরে গেল পাশের বাড়িতে। পাশের বাড়ি বলা চলে বটে, কিন্তু তিনটে বাড়ির সদর দরজা একটিই। আসলে বাড়ি একটাই। তিনভাগে ভাগ করা। কোন দেয়ালও নেই, যা আলাদা করে রাখতে পারে বাড়িটাকে।

বিকেল বেলা দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ঘটল।

বড় জামাই রুহুল আমিন আজ এক সপ্তাহ পর আবার শ্বশুর সাহেবের ঘরে পদার্পণ করল। উদ্দেশ্য সেই দশ হাজার টাকা প্রার্থনা। বিকেলের চা পান

করছিলেন চৌধুরী সাহেব। রুহুল আমিন ঘরে ঢুকে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার টাকার কি হবে, আব্বা?'

চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন চৌধুরী সাহেব। হঠাৎ মুখের ভিতরটা তেতো স্বাদে ভরে গেল। মহা মুশকিলে পড়েছেন তিনি। ছেলেরা বড় জামাইকে টাকা দেবার বিপক্ষে। অথচ কথাটা তিনি জামাইয়ের মুখের উপর বলতে পারেন না। চৌধুরী সাহেব চুপ করে রইলেন। বড় জামাই এবার একটু অভিমানী কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমাকে আপনাদের দেবার কথা ছিল তো অনেক কিছুই। কি দিয়েছেন বলুন? দরকারের সময় যদি না পাই, তাহলে আমার ভাগ্য খারাপ বলতে হবে। আমাকে কিন্তু গাড়ি দেবার কথা আপনাদের ছিল, আমিই নিতে চাইনি। তখন গাড়ি আমারই ছিল। গাড়ির বদলে টাকাটা দিচ্ছেন মনে করুন।'

চৌধুরী সাহেব মুখ খোলার আগেই ছোট ছেলে জামাল ঢুকল ঘরে। সে শুনেছে বড় ভগ্নিপতির কথাগুলো। সকালবেলা অযাচিতভাবে উপদেশ দিয়েছিল বলে মেজাজ তার এমনিতেই তিক্ত হয়ে আছে। তার উপর আবার আব্বার কাছ থেকে টাকা চাইতে এসেছে বুঝতে পেরে ঘৃণা জাগল মনে লোকটা সম্পর্কে। তাছাড়া আজ তার নিজেরই শ'দুয়েক টাকা দরকার। বড়দার কাছে চেয়ে পায়নি। আব্বার কাছ থেকে আদায় করার ইচ্ছা তার। সেজন্যেই এমন সময় আব্বার ঘরে প্রবেশ তার। এদিকে ঘৃণিত লোকটা আগেই নিজের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টায় পাঁয়তারা কষতে শুরু করে দিয়েছে।

ঘরে পা দিয়ে জামাল আব্বার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমিনদাকে তুমি কথাটা পরিষ্কার করে বলে দাওনি কেন, আব্বা! বড়দা তোমাকে সেদিন বলল না যে কারবারের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, এখন টাকা-পয়সা দেয়া যাবে না।'

'আজ নতুন শুনলাম কারবারের অবস্থা খারাপ। কই, এতদিন তো শুনিনি একথা। আমাকে টাকা দেবার বেলাতেই…।'

রুহুল আমিন গম্ভীর কণ্ঠে অভিযোগ করে যাচ্ছিল। চৌধুরী সাহেব কথা বলে উঠলেন, 'তোমার কি ধারণা বলো তো আমিন, সালাম কি তাহলে মিথ্যে কথা বলেছে?'

জামাল বলে উঠল, 'কারবারের অবস্থা সত্যি খারাপ। একথা কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক।'

রুহুল আমিন বলে উঠল, 'তাতেই বা কি হয়েছে! আজ খারাপ কাল ভাল হবে, কারবারের যা নিয়ম। আমাকে টাকা না দেবার কারণটা তো দেখছি না।'

জামাল মন্তব্য করল, 'দশ হাজার টাকাও তো মুখের কথা নয়। চাইলেই দেয়া যায়?'

'অন্যায়ভাবে কি চাইছি আমি? গাড়ি দেবার কথা ছিল কিনা মনে করে দেখো

একবার।'

চৌধুরী সাহেব বললেন, 'গাড়ি দেবার কথাটা বারবার তুলে কি লাভ বলো। গাড়ি আমি দেব বলেছিলাম শখ করে। দেনা পাওনার বাইরে ছিল ও কথাটা। তা দিলেও কি নতুন গাড়ি দিতে পারতাম? চার পাঁচ হাজারের পুরানো একটা গাড়ি কিনে দিতাম। তা সে সময় তুমি রাজী হলে না হয় দিতামও। এখন সে কথা তুলে কি হবে।'

জামাল বলল, 'তাছাড়া বাড়ি দেবার কথাও ছিল না। দেয়া হয়েছে। এরপর পাওনা আছে মনে করে টাকা চাওয়াটা কেমন কথা বুঝি না।'

বড় জামাই ছোট শালার শত্রুতামূলক কথাবার্তা সহ্য করতে না পেরে বলে উঠল, 'তুমি কেন আমাদের মাঝখানে ফুট্ কাটতে এসেছ, জামাল? তুমি চুপ করে থাকো।'

চৌধুরী সাহেব ছোট্ট মন্তব্য করলেন একটা, 'আহা, রাগারাগি কেন আবার। কথা তো মিটেই গেল। কারবারের অবস্থা ভাল হলে তোমার কথা না হয় ভেবে দেখা যাবে। এত তাড়াতাড়ি কি কোন কাজ হয়!'

রুহুল আমিন শ্বশুর সাহেবের চালাকী ধরতে পেরে মরিয়া হয়ে বলল, 'টাকা তো আজকে থেকে চাইছি না। এতদিন আমায় আশায় রেখে আজ হঠাৎ "না" বলে দেয়াটা কি উচিত হল আপনাদের?'

'কে আশা দিয়েছিল আপনাকে! আর উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তুলতে খারাপ লাগল না আপনার, আমিনদা?' জামাল চটে উঠে বলল।

রুহুল আমিন এবার চিৎকার করে উঠল প্রায়, 'আবার তুমি কথা বলছ আমাদের মাঝখানে?'

জামালও চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'একশোবার বলব। টাকা পয়সা সবই তো আমাদের, আমরা মতামত দেব না তো কে দেবে শুনি? শেষ কথা জেনে রাখুন, টাকা আমরা আপনাকে দেব না ঠিক করেছি। বুঝলেন?'

'বেশ! দেখে নেব আমি!'

চরম উত্তেজনায়, অপমানে, লজ্জায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে ঝড়োবেগে বের হয়ে গেল বড় জামাই রুহুল আমিন কথাগুলো বলে।

বড় জামাই ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতেই মেজ জামাই আবদুর রশিদ চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকল। আবদুর রশিদ পারিবারিক অশান্তির ঘোর বিরোধী। সব সমস্যা পারস্পরিক সহনশীলতার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলারই পক্ষপাতি সে। এই ত্রিকোণাকৃতি পরিবারে এমন গুণ তারই শুধু আছে। ফলে সকলের আস্থা তার উপর। ছোট শালার মুখে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনল সে। বিচলিত দেখাল তাকে। জামাল যে বড় ভগ্নিপতিকে রীতিমত অপমান করে ফেলেছে তা বুঝতে বাকি রইল না তার। কথাটা সে জামালকে বলতেও কসুর করল না, 'আমাদের

সম্মানী লোক উনি। ওঁর সাথে সম্মান বজায় রেখে কথা বলা উচিত আমাদের সকলের! তাই না, জামাল?'

জামাল অভিযোগ করল, 'কিন্তু সব জিনিসের একটা সীমা আছে, রশিদদা। কই, আপনি তো কোনদিন একটা পয়সা চাননি। কই, আপনার সাথে তো কারও মন কষাকষি হয় না।'

আবদুর রশিদ বলে উঠল, 'সব মানুষকে সমান চোখে দেখো না, জামাল। উনি খারাপ মানুষ একথা বলা অপরাধ, কথাটা সত্যি নয়। বিপদে পড়লে ভাল মানুষও খারাপ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। চলো, ঝগড়া করে বসে থাকা উচিত নয়, তোমাদের মিল করিয়ে দিই।'

আব্দুর রশিদের কথা আগ্রাহ্য করা জামালের পক্ষে অসম্ভব। শুধু জামালের কাছেই নয়, এ বাড়ির সকলের কাছেই মেজ জামাই আবদুর রশিদ শ্রদ্ধা, ভালবাসার পাত্র। এর কথা ফেলা অসম্ভব।

কিন্তু বড় জামাই রুহুল আমিনের ঘরে গিয়ে দেখা গেল সে বের হয়ে গেছে বাইরে। ব্যাপারটা স্থগিত রইল আপাতত। প্রকৃতপক্ষে চিরতরে।

সন্ধ্যার পর, রোজকার মতন হোটেল অ্যাণ্ড বারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল মেজ জামাই আবদুর রশিদ। গভীর রাতে ফিরবে সে। জামালও বের হল ঘন্টা দেড়েক পর। আব্বার কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল সে একশো। পায়নি। মেজাজ গরম নিয়েই বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে সে। ফিরোজা দুপুর থেকে দরজা বন্ধ করে ছিল। মাঝে একবার বের হয়েছিল বুঝি। তারপর দরজা-জানালা বন্ধ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে শুধু। বাড়ির বড় মেয়ে সালমাও আজ কান্নাকাটি করেছে। স্বামীকে আব্বা এবং ছোট ভাই মিলে অপমান করেছে এ লজ্জা ঢাকবার আর উপায়ই বা কি, সে তো মেয়েছেলে মাত্র। মেজ মেয়ে ফাহমিদা বড় বোনের ঘরে এসে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। তাতে কাজ হয়নি কোন। ভাবী রাহেলাও বড় ননদের ঘরে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। শাশুড়িও খবর নিয়েছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বড় মেয়ের। চৌধুরী সাহেব অসুস্থ স্ত্রীকে বিছানা থেকে উঠতে দেননি। তা না হলে মেয়েকে গিয়ে স্বয়ং বুঝিয়ে-পড়িয়ে কান্নাকাটি করে মানসিক কষ্ট বাড়াতে মানা করে আসতেন।

মেজ জামাইয়ের ফেরবার কথা গভীর রাতে। কিন্তু রাত আটটার সময়ই সে আজ ফিরে এল। ফিরেই বাড়ি মাত করে তুলল সে স্বভাবসিদ্ধ হাস্য-কৌতুকে। বাড়ির সবগুলো মেয়েছেলেকে ডেকে জড়ো করল সে ছোট শালীর ঘরে। মেজ জামাইয়ের ডাক শুনে আসবে না কেউ এমন হতেই পারে না। খোলামেলা মানুষকে সবাই ভালবাসে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মেজ জামাই আবদুর রশিদ ঘোষণা করল, 'সিনেমায় যাব আমরা সবাই। এই যে, টিকিট পর্যন্ত কিনে এনেছি।'

সত্যি তাই। পাঁচটা ডি.সি'র অ্যাডভান্স টিকিট করে নিয়ে এসেছে সে।

টিকিটগুলো রক্সি সিনেমা হলের। ন'টা-বারোটা শো। ইংরেজি ছবি। একটা সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে তৈরি।

মেজ জামাইয়ের এত পরিশ্রম কিন্তু ব্যর্থ হল। এমনিতেই নানারকম অশান্তি সকলের মনে। তার উপর সিনেমায় গিয়ে আনন্দ করার প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য হল না কারও কাছেই। মেজ মেয়ের রাজি রাজি ভাব দেখা গেল। কিন্তু একে নাইট শো, তার উপর ইংরেজি ছবি। তাছাড়া কেউ যখন যেতে রাজি নয় তখন তারও যাবার সাধ রইল না। মেজ জামাই বহু চেষ্টা করল। কিন্তু রাজি করাতে পারল না কাউকে। রীতিমত নিরাশ হয়ে পড়ল বলে মনে হল। মনক্ষুণ্নতার কারণ অবশ্যই আছে। বাড়িতে অশান্তি দেখেই সকলকে একটু আনন্দ দিয়ে স্বাভাবিক করতে চেয়েছিল সে পরিবেশটা। কিন্তু কোন কাজ হল না। অগত্যা একটু রেগে উঠেই সে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, কেউ না যাক, আমি একাই যাব।'

চলে গেল সে পৌনে ন'টার সময়।

বাড়ির বড় ছেলে সালাম চৌধুরী ফিরে এল রাত সাড়ে দশটায়। সন্ধ্যার পর কোথায় যেন বেরিয়েছিল সে। বড় জামাই ফিরল এগারোটায়। মেজ জামাই সিনেমা দেখে ফিরল সোয়া বারোটায়। রাত শেষ হতে চলেছে অথচ ছোট ছেলে জামালের বাড়ি ফেরার নাম নেই।

রাতটা কেটে গেল। সকালে সকলে জানতে পারল জামাল গতরাতে বাড়ি ফেরেনি। খুব একটা চিন্তিত অবশ্য কাউকেই মনে হল না। জামাল আজকাল প্রায়ই বাইরে রাত কাটায়।

কিন্তু কোন কোন রাত বাইরে কাটালেও পরদিন সকাল বেলাতেই বাড়ি ফিরে জামাল। আজ কিন্তু সকাল পেরিয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল এবং বিকেল উতরে সন্ধ্যা হয়ে গেল—তবু বাড়ি ফিরল না জামাল। দুশ্চিন্তার কথা। সকলেই বলাবলি করতে লাগল ওর আচরণ সম্পর্কে। শয্যাশায়িতা মায়ের দুশ্চিন্তাই সবার চেয়ে বেশি। মেজ জামাই বারবার করে শাশুড়ির পাশে গিয়ে বসছে। দুশ্চিন্তা করতে মানা করছে। কিন্তু মায়ের মন, বিপদের কথা অনুভব করতে পারে। রীতিমত কান্নাকাটি শুরু করছেন তিনি জামাইয়ের হাত ধরে। বললেন, 'না বাবা, তোমরা বুঝতে পারছ না। আমার মন বলছে জামালের কোন বিপদ হয়েছে।'

মেজ জামাই চিন্তিত ভাবে বড় জামাই রুহুল আমিনের ঘরে এল। বলল, 'কি করা যায় বলুন দেখি। জামাল তো কখনও এমন করে সকলকে দুশ্চিন্তায় ফেলে না।'

বড় জামাইয়ের রাগ আজও মেটেনি। সে বিরক্ত হয়ে এবং প্রায় খেঁকিয়ে উঠেই বলে বসল, 'দুশ্চিন্তায় ফেলেছে তো আমি কি করব। ওর কোন ব্যাপারে আমি আর নেই।'

মেজ জামাই একাই গেল ছোট শালা জামালের খোঁজ করার জন্যে। বড় ছেলে সালামকে ফোন করলেন চৌধুরী সাহেব। সালাম অফিস থেকেই জামালের বন্ধু বান্ধবের কাছে খবর জানার জন্যে গেল। কেউ কোন খবরই দিতে পারল না জামালের। গতকাল থেকে কোন বন্ধুই জামালকে দেখেনি। সালাম ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল সে। রাত তখন আটটা। মেজ জামাই ব্যর্থ হয়ে ফিরল রাত দশটায়। জামালকে তো পাওয়া যায়নি-ই, তার খবরও দিতে পারেনি কেউ।

চৌধুরী সাহেব শুকনো মুখে মেজ জামাই এবং বড় ছেলেকে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। বড় জামাই এল না। বড় মেয়ে একবার এল অবশ্য। তবে সে কোন কথা বলল না কারও সঙ্গে।

রাত এগারোটায় সালাম এবং আবদুর রশিদ এক সঙ্গে আবার বের হল। হাসপাতালগুলোতে খবর নেয়া দরকার। বলা যায় না, কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে হয়ত জামাল।

বড় মেয়ে এল আর একবার। সে ফিরে গিয়ে স্বামীকে কি বলল কে জানে। তবে শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করল সে একবার। তারপর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বলে গেল, থানায় খবর দেয়া দরকার, খবরটা দিয়ে আসি আমি।

রাত সাড়ে এগারোটা। ফোনটা চৌধুরী সাহেবের ঘরেই। সেটা অশুভ সঙ্কেত জানিয়ে অকস্মাৎ বেজে উঠল। ত্রস্ত হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে চৌধুরী সাহেব বললেন, 'হ্যালো!'

অপরপ্রান্ত থেকে উত্তর এল, 'আপনাদের বাড়ির ছোট মেয়ে ফিরোজাকে ডেকে দিন একবার।'

চৌধুরী সাহেব হতবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু আপনার পরিচয় কি বলুন দেখি। ফিরোজার সাথে কি কথা আপনার?'

অপরপ্রান্ত থেকে অজ্ঞাত পরিচিত পুরুষ কণ্ঠ বলে উঠল বিরক্তভরা গলায়, 'আপনি আমাকে চিনবেন না। ফিরোজা চিনবে। যা বলছি, ডেকে দিন ফিরোজাকে। ওকেই বলতে হবে কথাটা।'

রীতিমত খেপে যাবার কথা চৌধুরী সাহেবের। খেপেই গেলেন। কিন্তু কি মনে করে রিসিভারের মাউথপিসটা হাত দিয়ে চেপে জোর গলায় মেয়ের নাম ধরে ডাকলেন দু'বার। ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে ফিরোজা আব্বার ঘরে ঢুকল। চৌধুরী সাহেব মেয়ের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোকে এত রাতে ফোন করে কে রে! বলে আপনাদের বাড়ির ফিরোজা আমাকে চিনবে, আপনি চিনবেন না?'

ফিরোজা রীতিমত আশ্চর্য হয়ে যায়। কে ফোন করবে তাকে? তেমন কারও কথা তো মনে পড়ছে না!

'দেখো কে। দাঁড়িয়ে থেকো না।'

ধমক দিয়েই কথাটা বললেন চৌধুরী সাহেব। রিসিভারটা নিয়ে ফিরোজা বলল, 'হ্যালো!'

তারপর কান পেতে অপরপ্রান্তের লোকটার কথাগুলো শুনতে লাগল ফিরোজা। মুহূর্তের মধ্যে বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। ফ্যাকাসে মুখটা আব্বার দিকে ফেরাল সে। হঠাৎ হাত থেকে খসে পড়ে গেল রিসিভারটা সশব্দে। বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সে, অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ জোড়া। বলে উঠল, 'ছোটদাকে মেরে ফেলেছে! আব্বা, ছোটদাকে মেরে ফেলেছে!'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাটা বলেই অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ল ফিরোজা। কাঁদতে কাঁদতে ছুটল সে নিজের ঘরের দিকে। ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আকুলভাবে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝের উপর।

রুগ্না মা থেকে শুরু করে ভাবী, দুই বোন এবং চৌধুরী সাহেব স্বয়ং ফিরোজার দরজার সামনে এসে অনুরোধ, আদেশ-নির্দেশ জানাতে লাগল, 'ফিরোজা দরজা খোল। কি হয়েছে সব বল আমাদেরকে।'

কিন্তু ফিরোজার কান্না উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। দরজা সে খুলল না কোনমতে। কারও কথার উত্তরও দিল না।

বারোটার সময় ফিরে এল মেজ জামাই। বড় ছেলের সঙ্গে বের হয়ে দুজনে আলাদা আলাদা ভাবে হাসপাতালগুলোতে খবর নিতে গিয়েছিল। বড়ছেলে সালাম ফিরল পাঁচ মিনিট পরই। বড় জামাই রুহুল আমিন থানায় ডায়েরী করে দু'এক জায়গায় খোঁজ করতে গিয়েছিল। সে ফিরল সোয়া বারোটায়।

বাড়ির মেয়েরা অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল এবার। মেজ জামাইয়ের চোখেও জল। বড় ছেলে, বড় জামাইয়ের চোখেও জল। মেজ জামাই ফিরোজার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এবার। দরজা খুলল ফিরোজা। খুলেই মেজ ভগ্নিপতিকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। মেজ জামাই বারবার বলতে লাগল, 'ফিরোজা শোনো, কেঁদো না, শোনো আমার কথা—বলো তো কে ফোন করেছিল তোমাকে?'

ফিরোজা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'জানি না, মেজদা, আমি চিনি না লোকটাকে।'

'কি নাম বলেছিল, বলো তো। আমরা হয়ত চিনতে পারব।'

ফিরোজা এক মুহূর্তের জন্যে কান্না থামিয়ে বলে উঠল, 'নামও বলেনি আমাকে।'

'ঠিক কি কি কথা বলেছিল, বলো দেখি। ঠিক যা শুনেছ তাই বলো।'

ফিরোজা কান্না থামিয়ে কি যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, 'বলল—তোমার নাম ফিরোজা আমি জানি। তোমার ছোট ভাইয়ের নাম জামাল, তাই না?

জামালকে আমি খুন করেছি। তোমার আব্বা বুড়ো বলে খবরটা তাঁকে দিইনি···। এটুকু শুনেছি আমি। তারপর আর কিছুই শুনতে পাইনি।'

মেজ জামাই ফিরোজার একখানা হাত ধরে শান্ত এবং স্নেহপূর্ণ স্বরে বলল, 'কোন কথা আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখো না, ফিরোজা। সত্যি তুমি বুঝতে পারনি কে ফোন করেছিল?'

'পারিনি। বিশ্বাস করুন, মেজদা। লোকটাকে আমি চিনি না। কোনদিন ওর গলার স্বর শুনিনি আমি।'

'তাহলে সে তোমার নাম জানল কিভাবে?'

'জানি না! আমি কিচ্ছু জানি না!'

ফিরোজা আবার নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

থানায় ডায়েরী করে এসেছিল রুহুল আমিন। মেজ জামাই আবার ফোন করল রমনা থানায়। ও. সি.-কে নতুন ব্যাপারটা জানানো হল। পনেরো মিনিটের মধ্যে ও. সি. দুজন কনস্টেবল নিয়ে 'হ্যাপি কটেজ'-এ উপস্থিত হলেন। সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আপনাদের ছোট মেয়েকে ডাকুন। তাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আমি।'

ফিরোজাকে ও. সি. সেই একই প্রশ্ন নানা ভাবে নানা কায়দায়, নানা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন। ফিরোজার সেই একই উত্তর। সে জানে না কে ফোন করেছিল, চেনে না লোকটাকে। ও. সি. একে একে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন জামাল চৌধুরীর কোন শত্রু আছে কিনা। সকলেই উত্তর দিল—না। ও. সি. এবার ওদেরকে বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন, আমরা কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে অনুসন্ধান কাজ শুরু করতে পারি। আপনারা যদি কাউকে সন্দেহ না করেন তাহলে আমরা অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ি। ব্যাপারটা আসলে সত্য কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। যে জামাল চৌধুরীর মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছে সে হয়ত ঠাট্টাও করে থাকতে পারে। জামাল চৌধুরীর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না এটা অবশ্যই দুশ্চিন্তার কারণ। এক্ষেত্রে আমরা তার জন্যে চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিতে পারি আপাতত। প্রকৃতপক্ষে সে কোথায় কেমন অবস্থায় আছে তা না জানা পর্যন্ত তদন্ত কার্য সীমিত না রাখা ছাড়া পথ নেই। নতুন কোন খবব বা দুঃসংবাদ পেলে সাথে সাথে জানাবেন আমাদেরকে। প্রাণপণ চেষ্টা করব আমরা আপনাদের বিপদে সাহায্য করতে।'

ও. সি. সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং তদন্ত কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল। 'হ্যাপি কটেজ'-এর সকলের রাত কাটল মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে।

সকালবেলা বড় এবং মেজ জামাই থানা থেকে খবর আনতে গেল। থানা থেকে জানা গেল জামালের চেহারার বর্ণনা দিয়ে চারদিকের থানায় খবর পাঠানো

হয়েছে। এখনও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। ফিরে এল ওরা মুখ কালো করে। বাড়ির মেয়েরা আবার কান্না জুড়ল। বিকেল অবধি হাঁড়ি চড়ল না চুলোয়। মেজ জামাই দোকানের খাবার কিনে এনে দিল। নিজে অবশ্য মুখে দিল না কিছুই। সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সামান্য খেতে বাধ্য করল।

বিকেল বেলা চরম সর্বনাশের খবর পাওয়া গেল। থানার ও. সি. ফোন করলেন। একটা লাশ পাওয়া গেছে ডেমরা রোডের পার্শ্ববর্তী একটা পানাভর্তি পুকুরে। লাশটা হয়ত জামালের। সনাক্ত করার জন্য লোক দরকার। মেজ জামাই বড় ছেলে সালামকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মর্গের উদ্দেশে। লাশটা সেখানেই নিয়ে এসে রাখা হয়েছে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে।

লাশ দেখে চেনবার কোন উপায় ছিল না। বুকে ছোরা মারা হয়েছে জামালের। মুখেও ছোরার দাগ। বেশ কয়েক ঘন্টা পানিতে পড়েছিল বলে পচে ফুলে উঠেছে মরদেহটা। জামালকে চেনা গেল তার পরনের পরিচিত শার্ট আর প্যান্ট দেখে। কপালের কাটা দাগটা দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল পুরোপুরি।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে এল সালাম এবং আবদুর রশিদ।

দুই

বিকেল পাঁচটা। মি. সিম্পসনের অফিসরুম। শহীদ, কামাল ও মি. সিম্পসন গভীর এক আলোচনা সবেমাত্র শেষ করেছেন। ইদানীং শহীদ সিরিয়াসলি একটা শুদ্ধি ক্যাম্প তৈরি করার কথা চিন্তা করছে। যে শুদ্ধি ক্যাম্পে বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধীরা শাস্তি ভোগ করার পর সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে বাধ্য করা হবে শুদ্ধি ক্যাম্পে ভর্তি হতে। বিদেশে এ ধরনের বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এতে করে অপরাধীরা অপরাধ করা ভবিষ্যতের জন্যে ছেড়ে দেয়। রীতিমত সুনাগরিক, আদর্শবান মানুষ হবার জন্যে উত্তম শিক্ষা দেয়া হবে এই শুদ্ধি ক্যাম্পে। আইনগত জটিলতা এবং পারিপার্শ্বিক অসুবিধে সম্পর্কে আলাপ চলছে কিছুদিন থেকে। আজকের মত আলাপ শেষ হয়েছে। মোট তিন লাখ টাকা নগদ খরচ হবে প্রাথমিক অবস্থায়। সব খরচ শহীদের।

চা পান করছিল ওরা। এমন সময় বেজে উঠল টেবিলের ফোনটা। মি. সিম্পসন বেশ খানিকক্ষণ ধরে কথা বললেন ফোনে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে শহীদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'জ্বালা আর কাকে বলে!'

'কি হল আবার?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তরে মি. সিম্পসন বললেন, 'গতকাল জামাল নামে এক যুবক নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে ডায়েরী করা হয়েছিল, তারপরই থানায় খবর আসে কে যেন জামালের বাড়িতে ফোন করে বলেছে—আমি জামালকে হত্যা করেছি।

ঘন্টাখানেক আগে সেই জামালের লাশ পাওয়া গেছে। কি সব আশ্চর্য—।'

শহীদ মি. সিম্পসনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, 'বাহ্! ইন্টারেস্টিং তো! কে ফোন করেছিল জামালের বাড়িতে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'সে এক জটিল ব্যাপার। রমনা থানার ও. সি.-র ধারণা, যে ফোন করেছিল তাকে নাকি জামালের ছোট বোন চেনে। কিন্তু চেনে বলে স্বীকার করছে না সে। ফোন করনেওয়ালা নাকি জামালের বাবাকে বলেছে আপনি আমাকে চিনবেন না, আপনার ছোট মেয়ে চিনবে।'

শহীদ দ্বিতীয়বার বলল, 'ইন্টারেস্টিং।'

মি. সিম্পসন শহীদের কৌতূহল দেখে বলে চললেন, 'আমাকে একবার যেতে হচ্ছে জামালের বাড়িতে। চলো না, তোমরাও চলো।'

শহীদ বলে উঠল, 'সুযোগ পেয়ে আমাদেরকে জড়াতে চাইছেন, কেমন? কিন্তু আমরা খুব ব্যস্ত ক'দিন ধরে। কেসের ভার নিতে পারছি না।'

মি. সিম্পসন হেসে ফেলে বললেন, 'ঠিক ধরে ফেলেছ আমার মনের ইচ্ছা, তাই না! ঠিক আছে চলো, কেসের ভার নিতে বলব না।'

মিনিট সাতেক পর ওদের তিনজনকে 'হ্যাপি কটেজ'-এর বৈঠকখানায় উপস্থিত দেখা গেল। মি. সিম্পসন সকলের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তারপর শহীদ ও কামালের পরিচয় সকলকে দিলেন।-চৌধুরী সাহেবকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন মি. সিম্পসন, 'ঠিক কখন ফোনটা এসেছিল এবং কি বলা হয়েছিল ফোনে?'

চৌধুরী সাহেব হুবহু বলে গেলেন ঘটনাটা। ঘটনাটা লিখে নিলেন মি. সিম্পসন। চৌধুরী সাহেব মি. সিম্পসনের অনুরোধে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ছোট মেয়ে ফিরোজাকে। থমথমে, অপ্রতিভ মুখে ফিরোজা একা এসে বৈঠকখানায় বসল। মি. সিম্পসন ছোট্ট একটা ভূমিকা করে প্রশ্ন করলেন, 'কে ফোন করেছিল তা তুমি জানো বলেই সকলের বিশ্বাস। মনে রেখো তোমার নিজের ভাইকে খুন করেছে লোকটা। তোমার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাক বা না থাক, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তুমি শুধু নামটা বলো। তারপর যা করার আমরা করব।

ফিরোজা অস্বীকার করল। মি. সিম্পসন নানাভাবে বোঝালেন। কিন্তু ফিরোজার সেই একই উত্তর—আমি লোকটাকে চিনি না।

মি. সিম্পসন এবার অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করার প্রয়াস পেলেন, 'আচ্ছা, জামালের হাবভাবে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছিলে কি দু'একদিন থেকে?'

'না।'

সংক্ষিপ্ত উত্তর ফিরোজার। মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'বাড়ির লোকজনের সাথে জামালের সম্পর্ক কেমন ছিল? তাছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য ঝগড়াঝাটি ছিল

বাড়ির কারও সাথে ওর? তোমার বড় ভাই সালাম চৌধুরী ব্যবসা দেখাশোনা করেন। এ ব্যাপারে কোন ক্ষোভ ছিল না জামালের?'

ফিরোজা একটু চিন্তা করে প্রথমেই বলল, 'আমাদের পরিবারে তেমন গুরুতর ধরনের কোন সমস্যা কোনদিনই ছিল না। প্রতিটি পরিবারে খুঁটিনাটি বিষয়ে যেমন মতবিরোধ সাধারণত থাকে তেমনি কিছু ব্যাপার আমাদের পরিবারেও আছে। তবে সেসব তেমন কিছু নয়।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমার প্রশ্নটা উদ্দেশ্যমূলক নয়, আমি বলতে চাই না যে জামালের সাথে এ বাড়িরই কারও সাথে শত্রুতামূলক সম্পর্ক ছিল বলে সে নিহত হয়েছে। প্রশ্নট্য আমি করেছি এই জন্যে যে সব জানা দরকার আমাদের। সামান্য এতটুকু একটা কথাও যেন অজানা না থাকে। তবেই প্রকৃত খুনীকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।'

ফিরোজা এবার বলল, 'আমার বড়দা কারবার দেখাশোনা করেন বলে ছোটদার কোন রাগ ছিল না। তবে ছোটদা মাঝে মাঝেই দু'চারশো করে টাকা চাইত। বড়দা স্বভাবতই সহজে দিতে রাজি হতেন না। শেষে অবশ্য দিতে হত। এই কারণে ছোটদার সাথে বড়দার কথা কাটাকাটিও হয়েছে দু'একবার। কিন্তু বড়দা মনে কোন রাগ পুষে রাখবার মত মানুষ নন। ছোটদাকে বড়দা খুব বেশি ভালবাসতেন।'

'ইদানীং বড়দার সাথে বা অন্য কারও সাথে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কি জামালের?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। যেদিন শেষবার বাড়ি থেকে বের হয় ছোটদা সেদিন বিকেলে ঝগড়া হয়েছিল আমার বড় ভগ্নিপতির সাথে। বড় ভগ্নিপতি কিছুদিন থেকে টাকা চাইছিলেন আব্বার কাছ থেকে। সেদিনও চাইতে গিয়েছিলেন আব্বার ঘরে। ছোটদা সেখানে ছিল বোধহয়, ও বলে টাকা দেয়া হবে না। এই নিয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে তর্ক হয়। সেদিনই দুপুরের আগে কারখানায় গিয়েছিল ছোটদা বড়দার কাছে কিছু টাকা চাইতে, বড়দা দেয়নি। এ ব্যাপারে আমার কাছে অনুযোগ করেছিল ও।'

'তোমার বড় ভগ্নিপতি রুহুল আমিন কত টাকা চেয়েছিলেন?'

ফিরোজা বলল, 'অত কথা আমি জানি না। আব্বা জানেন।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তোমার আব্বাকে আর একবার ডেকে দাও এখানে।'

ফিরোজা চলে যেতে চৌধুরী সাহেব আবার বৈঠকখানায় এলেন। মি. সিম্পসনের অনুরোধে তিনি বড় জামাই এবং ছোট ছেলের মধ্যে ঝগড়ার বিশদ বিবরণ দিলেন। মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'আপনার বড় জামাই ঘর থেকে বের হয়ে যান শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে। যাবার সময় তেমন কিছু বলেছিলেন কি?'

চৌধুরী সাহেব চুপ করে রইলেন। মি. সিম্পসন সন্দিহান চোখে তাকিয়ে

থেকে বললেন, 'কোন কথা লুকোবেন না, চৌধুরী সাহেব, যদি প্রকৃত খুনীকে শাস্তি দেবার কোন ইচ্ছা আপনাদের সত্যিই থাকে।'

চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমার বড় জামাই জামালকে খুন করেছে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না, মি. সিম্পসন।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হয়ত উঠতে পারে না। কিন্তু কোন্ কথার মধ্যে কি তাৎপর্যের সৃষ্টি হতে পারে তা কথাটা না জেনে বলা যায় না। আপনার বড় জামাই কি বলেছেন তা আমরা জানি না। যদি উনি বলতেন—জামালকে খুন করব, তাহলেও তদন্ত করে নিশ্চিত না হয়ে আমরা বলতাম না যে আপনার বড় জামাই খুনী। আমরা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিই। তারপরও কোর্ট আছে। সেখানে প্রমাণিত হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যি অপরাধী কিনা। সুতরাং আমাদেরকে সব কথা অকপটে জানানো দরকার।'

চৌধুরী সাহেব নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন। বললেন, 'বুঝেছি আমি। হ্যাঁ, বড় জামাই রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সময় বলেছিল—"বেশ! দেখে নেব আমিও।"'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করব, আপনার বড় ছেলের কাছ থেকে সেদিনই জামাল কিছু টাকা চেয়েছিল। আপনার বড় ছেলে এ সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

'না।'

'মাফ করবেন, আর একটি প্রশ্ন। জামালের কোন শত্রু থাকা সম্ভব বলে মনে করেন? কিংবা শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে কারও সাথে এমন কোন ঘটনার কথা আপনার জানা আছে?'

চৌধুরী সাহেব বললেন, 'পাড়ার এক ভদ্রলোক, তিনি আমার বন্ধুও বলতে পারেন, জামালের নিহত হবার সংবাদ পেয়ে এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন জামাল যেদিন শেষবার বাড়ি থেকে বের হয় সেদিন নাকি পাড়ার এক বখাটে ছেলের সাথে কি একটা গোলমাল হয়েছিল। ব্যাপারটা বিশদ জানি না আমি। আমার জামাইরা নাকি জানে ব্যাপারটা। আমি ওদেরকে এখনও কিছু জিজ্ঞেস করিনি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ধন্যবাদ। আপনি আপনার বড় ছেলেকে পাঠিয়ে দিন।'

খানিক পরই সালাম চৌধুরী সালাম জানিয়ে ঘরে ঢুকে বসল একটা চেয়ারে। মি. সিম্পসন জেরা শুরু করলেন, 'আচ্ছা, আপনার ছোট ভাই শেষ কবে টাকা চেয়েছিল আপনার কাছ থেকে? কেন চেয়েছিল? আপনি কি টাকা দিয়েছিলেন?'

'যেদিন শেষবার বের হয় ও বাড়ি থেকে সেদিনই টাকা চায় ও দুপুরে। কেন তা জানি না। প্রায়ই কারণে-অকারণে টাকা নিত ও। বয়সের ব্যাপার, আজে বাজে খরচ করে ফেলত। আমি ওকে টাকা দিইনি। ও একটু রেগেও ছিল।'

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'রাগের মাথায় কিছু বলেছিল কি ও?'

'না। জামাল আমাকে অপমানকর কিছু কোনদিনই বলেনি। আমি ওকে ভালবাসতাম, ও আমাকে শ্রদ্ধা করত। তবে এই টাকা-পয়সা চাওয়া এবং দেয়া নিয়ে মাঝে-মধ্যে গোলযোগ হয়ত হয়েছে, কিন্তু সে কেবল অভিমানের ব্যাপার। ও খুব অভিমানী ছিল।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'জানা গেছে যেদিন জামাল নিখোঁজ হয় সেদিনই রাত এগারোটার সময় নিহত হয় সে। প্রথমে বিষ প্রয়োগে অজ্ঞান করা হয় ওকে। তারপর মাথায় লোহার ডাণ্ডা বা ওই জাতীয় কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে ওকে। রাত এগারোটার সময় সেদিন কোথায় ছিলেন আপনি?'

সালাম চৌধুরী চুপ করে রইল! মি. সিম্পসন তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে উঠলেন, 'কি ভাবছেন? আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। কোথায় ছিলেন সেদিন আপনি রাত এগারোটার সময়?

সালাম চৌধুরী অস্বস্তি বোধ করছে উত্তর দিতে। মি. সিম্পসন তৃতীয়বার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সে বলল, 'ঠিক কোথায় ছিলাম মনে নেই আমার। সেদিন আমি পার্কে গিয়েছিলাম, নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, নৌকোয় চড়েছিলাম, কখন কি করেছি তা আমার স্মরণ নেই।'

'আপনি একা ছিলেন? যেখানে-যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে পরিচিত কারও সাথে দেখা হয়েছিল কি?'

'না।'

'ঘড়ি সম্পর্কে এমন অস্বাভাবিক উদাসীন হওয়াটা কি অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে হয় না আপনার?'

সালাম চৌধুরী মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল, 'সেদিন মনটা কেমন যেন করছিল, ঘড়ির দিকে তাকাইনি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আশ্চর্য! আচ্ছা, জামালের নিহত হবার সংবাদ যখন ফোন করে জানানো হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'হাসপাতালে জামালের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। মেডিকেলে গিয়েছিলাম আমি। আবদুর রশিদ, এ বাড়ির মেজ জামাই, আমার সাথেই বের হয়েছিল। সে মিটফোর্ডে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে। আমি ফিরে এসেছিলাম বারোটা পাঁচে। এসে শুনি কে যেন ফোন করে জানিয়েছে খবরটা।'

'আপনার বাবার মুখে শুনলাম ফোন করা হয়েছিল ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায়। সেই নির্দিষ্ট সময়টিতে কোথায় ছিলেন আপনি?'

সালাম চৌধুরী ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক উত্তর দেয়া কঠিন, বুঝতেই পারছেন। কেননা, ঘড়ির কাঁটা দেখে চলার মত মানসিক অবস্থা তখন নয়।

সম্ভবত হসপিটালেই ছিলাম তখন।'

'হাসপাতাল থেকে কোথাও ফোন করেছিলেন আপনি?'

সালাম চৌধুরী মি. সিম্পসনের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদু স্বরে উত্তর দিল, 'করেছিলাম। শেরে বাঙলা হসপিটালে ফোন করে জামালের খোঁজ নিয়েছিলাম।'

'ক'টা ফোন করেছিলেন আপনি সত্যিসত্যি? কতক্ষণ সময় লেগেছিল?'

'একটা ফোন করেছিলাম। খবর পেতে সময় লেগেছিল মিনিট পাঁচেক বা তার কিছু বেশি।'

মি. সিম্পসন কি যেন ভাবলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'জামালের নিহত হবার সময় আপনি কোথায় ছিলেন এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিতে পেরে আপনি সন্দেহভাজন হচ্ছেন। আপনি বরং চিন্তা করে দেখুন খানিক।'

সালাম চৌধুরী অপ্রতিভ গলায় বলে উঠল, 'চিন্তা করে দেখলেও মনে পড়বে না আমার।'

'শেষ একটা প্রশ্ন। আপনি যা যা বললেন তার মধ্যে সত্যতা কতটুকু?'

'মানে? সব সত্যি কথা বলেছি আমি।'

মি. সিম্পসন গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, 'ধন্যবাদ। আপাতত আপনি আসতে পারেন। আপনাদের বড় ভগ্নিপতিকে পাঠিয়ে দিন এবার।'

রুহুল আমিন পাণ্ডুর মুখে ঘরে ঢুকল। চেয়ারটায় বসল মিনিট দুয়েক পর। মি. সিম্পসনের প্রথম প্রশ্ন, 'আপনি বর্তমানে কি কাজ করেন, মি. আমিন?'

'বর্তমানে কিছু করছি না। ব্যবসাটা নতুন করে দাঁড় করাবার কথা ভাবছি কিছুদিন থেকে। জানালার গ্রিল তৈরি করার কারখানা ছিল আমার। টাকার অভাবে পারছি না।'

মি. সিম্পসন, 'সেজন্যেই সম্ভবত আপনি চৌধুরী সাহেবের কাছে টাকা চাইছেন। তা, কত টাকা?'

'দশ হাজার।'

'টাকার ব্যাপারে জামালের সাথে আপনার কথা কাটাকাটি হয়েছিল সেদিন, তাই না? জামালকে কি বলেছিলেন আপনি?'

'জামালকে বলেছিলাম আমার এবং শ্বশুর সাহেবের কথার মাঝখানে ও যেন কথা না বলে। সম্পর্কে ও আমার ছোট, সুতরাং ওর মাতব্বরি পছন্দ হয়নি আমার।'

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'মাতব্বরি শব্দটা দিয়ে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন? ও কি আপনাকে অপমান করেছিল?'

'তা এক রকম অপমান করেছিল বৈকি। কিন্তু জামাল আমার ছোট শালা, ভালবাসতাম নিঃসন্দেহে। ওর কোন কথা মনে রাখিনি আমি।'

মি. সিম্পসন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু ঘর থেকে রাগ করে বের হয়ে যেতে যেতে কি বলেছিলেন আপনি?'

চুপ করে রইল রুহুল আমিন। মি. সিম্পসন প্রশ্নটা আবার করলেন। একটু পর রুহুল আমিন বলল, 'সে আমি রাগের মাথায় বলে ফেলেছিলাম।'

'কথাটা বলার মধ্যে আপনার কোন উদ্দেশ্য ছিল না?'

'না। বিশ্বাস করতে পারেন আমাকে।'

'মি. সিম্পসন বললেন, 'যেদিন রাত এগারোটায় নিহত হয় জামাল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

রুহুল আমিন ইতস্তত করতে লাগল। দ্বিতীয়বার মি. সিম্পসন প্রশ্ন করতে বলে উঠল, 'আমি একটা হোটেলে ছিলাম। হোটেলটার নাম সালমাবাদ হোটেল অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট। রেকর্ড বাজানো হয় ওখানে। গান শুনতে শুনতে ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলাম আমি।'

মি. সিম্পসন কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কিন্তু আপনি যে হোটেলের কথা বলছেন সেটা তো এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। ওখানে আপনি গিয়েছিলেন কেন? তাছাড়া হোটেলটা তো খুব লো-স্ট্যাণ্ডার্ড!'

'ওদিকে গিয়েছিলাম হাঁটতে হাঁটতে, কোন কারণবশত নয়। তাছাড়া আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব চিন্তিত আমি, তাই হোটেলটা ভাল কি খারাপ লক্ষ করিনি। জামালের সাথে ঝগড়া হবার ফলে মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই অন্যমনস্কভাবে গান শুনছিলাম।'

'হোটেলের বেয়ারারা নিশ্চয় চিনতে পারবে আপনাকে আবার দেখলে?'

হঠাৎ ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হল রুহুল আমিনকে। বলে উঠল বিচলিতভাবে, 'তা কি করে সম্ভব। শ'য়ে শ'য়ে লোকের মাঝখানে আমিও ছিলাম। আমাকে আলাদাভাবে চিনতে পারা কিভাবে সম্ভব?'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'বেয়ারারা ঠিক চিনতে পারে। যা হোক, সেখানে আপনি যে সেদিন রাত এগারোটার সময় ছিলেন তা কি প্রমাণ করতে পারেন?'

'বাহ্, তা আমি কিভাবে প্রমাণ করব?'

'প্রমাণ করতে না পারাটা খুব খারাপ।'

মি. সিম্পসন গম্ভীর স্বরে যোগ করলেন, 'আচ্ছা, জামালের নিহত হবার খবর দিয়ে যখন ফোন করা হয় তখন কোথায় ছিলেন আপনি?'

'আমি থানায় ডায়েরী করতে গিয়েছিলাম।'

'কখন বের হয়েছিলেন আপনি? কখন থানায় পৌছান? কখন ফিরে এসেছিলেন?'

রুহুল আমিন খানিক চিন্তা করে বলল, 'কখন ডায়েরী লিখিয়েছি তা আপনি থানায় খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। কিন্তু কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম এবং

কখন ফিরেছিলাম তা মনে নেই।'

'বাইরে থেকে কোথাও ফোন করেছিলেন কি?'

'না।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি।'

রুহুল আমিন থমথমে গলায় মন্তব্য করল, 'আমি যা জানি বা যা মনে করতে পারছি বা যা সত্য তাই বলেছি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'এবার আসতে পারেন আজকের মত। এ বাড়ির মেজ জামাই আবদুর রশিদ সাহেবকে পাঠিয়ে দিন।'

রুহুল আমিন ঘর থেকে বের হয়ে যেতে মি. সিম্পসন শহীদ ও কামালকে সিগারেট দিয়ে বলে উঠলেন, 'কেমন বুঝছ শহীদ?'

শহীদ এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। মুখ খুলল ও এই প্রথম, 'ইন্টারেস্টিং। বড় ছেলে সালাম চৌধুরী এবং বড় জামাই রুহুল আমিন দু'জনেই মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমার দৃঢ় সন্দেহ। মিথ্যে কথা বলার সময় বেশিরভাগ লোকই ধরা পড়ে যায়। জামাল যখন নিহত হয় ঠিক সেই সময়টা কোথায় ছিলেন ওঁরা খোদা মালুম। ওঁরা যা বলে গেলেন তা সত্য হতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

'তোমার কাকে সন্দেহ হয়?'

শহীদ হেসে বলল, 'সন্দেহ দুনিয়ার সব লোককে করা যায়। প্রমাণ খুঁজতে হবে। উদ্দেশ্য কি আছে দেখতে হবে। সময় এবং সুযোগের কথা ভাবতে হবে। সব জানা থাকলেই কেবল সন্দেহ করা চলে।'

শহীদের কথা শেষ হতেই মেজ জামাই আবদুর রশিদ ঘরে ঢুকল। সুন্দর, সুঠাম চেহারা। ফর্সা। চোখ দুটো রাত্রি জাগরণের ফলে লাল। মৃদু হেসে চেয়ারটায় বসল সে।

মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'কি করেন আপনি?'

'হোটেল মহল অ্যাণ্ড বারের ম্যানেজার এবং অংশীদার আমি,' আবদুর রশিদ ম্রিয়মাণ স্বরে উত্তর দিলেন।

মি. সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আমরা জানতে পেরেছি জামাল প্রায়ই রাতে বাইরে থাকত এবং মদটদও পান করত। কথাটা কতটুকু সত্যি?'

'আমিও শুনেছিলাম। ওর বোন দু'একবার বলেছে বটে আমাকে। আমি একবার কথাটা জিজ্ঞেসও করেছিলাম ওকে। আমার কাছে কোন কথা লুকোবে এমন ছেলে ছিল না জামাল। আমাকে ও বলেছিল যে মদটদ ও জীবনে ছুঁয়েও দেখেনি। আমার বিশ্বাস শখে পড়ে দু'একবার খেলেও খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক নেশা করা বলতে যা বোঝায় তা করত না।'

'আপনাদের বারে যাওয়া-আসা ছিল ওর?'

আবদুর রশিদ বলল, 'না। দু'বার কি একবার কোন খবর-টবর দিতে গিয়েছিল হয়ত, ঠিক মনে নেই, গিয়ে থাকলেও ছ'মাসের মধ্যে আর যায়নি।'

মি. সিম্পসন বেশি সময় নষ্ট না করে জানতে চাইলেন, 'জামাল নিহত হয়েছে যে-সময় সে-সময় কোথায় ছিলেন আপনি?'

আবদুর রশিদ বলল, 'সেদিন সিনেমা দেখাবার জন্যে রাত আটটায় বাড়ির সব মেয়েদের জন্যে রক্সি সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে এসেছিলাম আমি। কিন্তু ওরা কেউ যেতে রাজি হল না। অগত্যা টিকিটগুলো নষ্ট হয় দেখে আমাকে যেতে হয়েছিল একাই। একটা টিকিট নিজের জন্যে রেখে বাকিগুলো বিক্রি করে দিই। সিনেমা দেখে ফিরেছিলাম আমি সাড়ে বারোটায়।'

মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'সিনেমার টিকিটের অর্ধেকটা কি দেখাতে পারবেন আমাদেরকে?'

আবদুর রশিদ মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। তারপর বলে উঠল, 'আপনি কি প্রমাণ দেখাতে বলছেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'টিকিটটা থাকলে দেখাতে আপত্তি করবেন না নিশ্চয়। না থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। প্রতিটি জিনিসের পিছনে প্রমাণ থাকাটা কি সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য নয়?'

আবদুর রশিদের মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না টিকিটের অর্ধেকটা ফেলে দিয়েছি কিনা। মানিব্যাগে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

ঘর থেকে বের হয়ে গেল আবদুর রশিদ। ফিরে এল পাঁচ মিনিট পরে। হাতে একটা কাগজ। সেটা মি. সিম্পসন পরীক্ষা করে দেখলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। আর কয়েকটা প্রশ্ন করব আপনাকে। দুঃসংবাদটা জানিয়ে যখন ফোন করা হয়েছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'হসপিটালে খবর নিতে গিয়েছিলাম।'

'ঠিক ক'টার সময়?'

আবদুর রশিদ একটু অসহায়ভাবে হেসে ফেলল। বলল, 'দেখুন, ঘড়ি দেখার মত এবং মনে রাখার মত অবস্থা তখন ছিল না।'

মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'জামালকে হত্যা করতে পারে এমন কোন শত্রু তার ছিল কিনা জানেন?'

'না না। জামাল তেমন ছেলে ছিল না। ওর কোন শত্রু আছে বলে বিশ্বাস হয় না আমার।'

'জামালের সাথে ওর বড় ভগ্নিপতির ঝগড়া হয়েছিল। হুমকি দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন মি. রুহুল আমিন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?'

'ছিঃ ছিঃ। জামালকে আমিন ভালবাসত, মি. সিম্পসন। ওরকম সন্দেহ ভুলেও

করবেন না।'

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'এমন কোন ঘটনার কথা আপনার জানা আছে যাতে করে জামালের শত্রু সৃষ্টি হতে পারে?'

পাড়ার শফিককে জামাল মেরেছিল একথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আবদুর রশিদের। সে ঘটনাটা উল্লেখ করল। মি. সিম্পসন শফিকদের বাড়ির ঠিকানা লিখে নিলেন। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর।

এরপর মি. সিম্পসন শহীদ ও কামালকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নিলেন 'হ্যাপি কটেজ' থেকে।

শফিকদের বাড়িতে একবার ঢুঁ মেরে নিলেন মি. সিম্পসন। শফিককে পাওয়া গেল না। কোথায় গেছে বলতে পারল না শফিকের বুড়ো বাপ।

গাড়িতে চড়ে মি. সিম্পসন বললেন, 'শফিক সম্ভবত পালিয়ে গেছে বলে সন্দেহ হয়। ছোকরাকে সত্যি সন্দেহ করা যেতে পারে।'

শহীদ কোন মন্তব্য করল না। মি. সিম্পসন আবার বললেন, 'অফিসে গিয়েই দু'জন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাড়িতে ফিরলেই পাকড়াও করে নিয়ে যাবে থানায়। জেরা করলে ফল পাওয়া যেতেও পারে। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে জামালকে খুন করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।'

কামাল বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। চৌধুরী সাহেবের মেয়েকে হয়ত এই শফিকই ফোন করেছিল।'

শীহদ বলল, 'কিন্তু একটা কথা বেশ ইন্টারেস্টিং। জামাল যখন নিহত হয়েছে এবং যখন তার নিহত হবার খবর ফোন করে জানানো হয়েছে—দুটো ক্ষেত্রেই বাড়ির তিনজন পুরুষের কেউই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না।'

মি. সিম্পসন শহীদের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে না পেরে প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রইলেন। শহীদ বলে উঠল, 'এবার নিশ্চয়ই মি. সিম্পসন আমাকে কেসটার ভার নিতে অনুরোধ জানাবেন।'

শহীদের কথা শেষ হতে কামাল এবং মি. সিম্পসন দু'জনেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। শহীদও যোগ দিল সে হাসিতে।

তিন

মি. সিম্পসন, শহীদ, কামাল বিদায় নিতে 'হ্যাপি কটেজ' ঝিমিয়ে পড়ল। জেরা করার ফলে প্রত্যেকের মনে অস্বস্তি দানা বেঁধেছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের কথা ভাবছে। একে এতবড় একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেল, তার উপর পুলিসী সন্দেহের পাল্লায় পড়ে নাকানি চোবানি খেতে হবে। যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। কিন্তু কারও চোখেই ঘুমের লেশমাত্র নেই।

মিসেস চৌধুরী রোগিনী। তাঁর দরজা দুটো মেলা। মি. চৌধুরী আলাদা ঘরে থাকেন। ডাক্তারের নির্দেশ মিসেস চৌধুরীকে নিরিবিলিতে রাখতে হবে। ঘুম হয় না, সেজন্যেই তাঁর অসুখ এবং ভয়। শব্দ-টব্দ হলে ঘুম হবার কথা নয়। তাই তাঁর ঘরে কেউ ঢোকে না।

বাড়ির চাকরাণী ফিরোজার ঘরে এবং মিসেস চৌধুরীর ঘরে দুধের গ্লাস রেখে রান্নাঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

মিসেস চৌধুরী চোখ বন্ধ করে কাঁদছিলেন। ধীরে ধীরে সময় বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ কান্না বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। চমকে উঠে একটা স্বচক্ষে দেখা ঘটনার কথা ভাবছিলেন। যেদিন জামাল নিহত হয়েছে সেদিনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছেন তিনি। বাথরূমে একজনকে রাত দুপুরে একটা কাপড় ধুতে দেখেছেন। এর অর্থ কি? হাজার রকম করে ভেবেও কোন কূল-কিনারা পাননি তিনি। কথাটা কাউকে বলবেন না ভেবেছিলেন। কিন্তু না বলেও পারেননি। কিন্তু এ বাড়ির প্রতিটি লোকই তাঁর আপনার। তাঁরই ছেলে, তাঁরই মেয়ে, তাঁরই জামাই, তাঁরই স্বামী, তাঁরই ছেলের বউ। কার কথা কাকে বলবেন তিনি? তবু না বলেও পারেননি। যাকে বিশ্বাস করতে পারেন, যার প্রতি সবচেয়ে বেশি আস্থা তাকেই একটু আভাস দিয়েছেন ব্যাপারটা সম্পর্কে।

হঠাৎ কান পাতেন মিসেস চৌধুরী। কিসের যেন শব্দ হল একটা। নাকি কানের ভুল? ওই যে, আবার। কেউ কি হাঁটছে ঘরের ভিতর? খুট্ করে আরও একটা শব্দ হল যেন। চোখ মেলে তাকালেন মিসেস চৌধুরী। জিরো পাওয়ারের বাল্ব্ জ্বলছে ঘরে। মশারি খাটানো। দরজা এখনও খোলাই রয়েছে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন মিসেস চৌধুরী। কেউ কি পালিয়ে গেল ঘর থেকে? যেন একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল দরজার কাছ থেকে। ভাল ভাবে দেখতে পাননি তিনি। কিন্তু শব্দ তিনি শুনেছেন। ও কিসের শব্দ হতে পারে? কে এসেছিল তাঁর ঘরে সাড়া না দিয়ে? বিড়াল টিড়াল নয়ত? মিসেস চৌধুরী খাট থেকে নেমে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। হাঁটতে কষ্ট হয় তাঁর। দাঁড়ালে থরথর করে কাঁপতে থাকেন। দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। কেউ নেই বাইরে। বড় ছেলের ঘরে, ছোট মেয়ের ঘরে, স্বামীর ঘরে এবং দু'জামাইয়ের ঘরেও আলো জ্বলছে। সবাই জেগে আছে। মিসেস চৌধুরী ছোট ছেলে জামালের ঘরের দিকে তাকালেন। ঘরটা বন্ধ এবং অন্ধকার। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল আবার। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। ধীর পায়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। চৌধুরী সাহেব একটা বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবছিলেন। স্ত্রীকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'ঘুম আসছে না, গো। একা থাকতেও ভাল লাগছে না।'

'তবে বসো। আমার কাছে একটু বসো।'

চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে ধরে বসালেন।

এদিকে ফিরোজা তার ঘরে চরম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছোটদাকে কে হত্যা করেছে তা সে জানে। ফোনে যে খবরটা দিয়েছিল, তাকে না চেনবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শফিক নিজের নাম প্রকাশ করেই বলেছিল,'তোমার ছোট ভাই জামালকে খুন করেছি আমি। আমাকে অপমান করার প্রতিশোধ নিয়েছি।' ফিরোজা নিজেকেই অপরাধী ভাবছে। যথেষ্ট কারণ আছে তার নিজেকে অপরাধী ভাবার। এমন নিষ্ঠুর ছেলের সঙ্গে সে প্রেম করতে গিয়েছিল কেন? ফিরোজার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলে অকারণে তার দিকে তাকিয়ে হাসত না শফিক। ছোটদাও রেগে গিয়ে মারধর করত না, এবং নিহত হতেও হত না ওকে। ছোটদার নিহত হবার জন্যে তো সেই দায়ী।

একটু আগে ফিরোজা মায়ের ঘরে ঢুকেছিল। মা টের পাননি। মায়ের টেবিলে ওষুধের শিশিগুলোর মধ্যে থেকে স্লিপিং ট্যাবলেটের শিশিটা চুরি করে নিয়ে এসেছে। আটটা ট্যাবলেট ছিল। আটটাই গুঁড়ো করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে ফিরোজা। হ্যাঁ, আত্মহত্যাই করবে সে। এই অপরাধ বোধে জর্জরিত হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

দুধে ওভালটিন মেশানো আছে বলে খয়েরী রঙের ঘুমের ট্যাবলেট গুঁড়ো করে মেশাবার পরও রঙ বদলায়নি। গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে গিয়েও গলায় ঢালতে পারল না ফিরোজা। মরতে ভয় নেই তার। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে মরার আগে তার একটা কাজ করা দরকার। কি কাজ সেটা? কাজটা হল শফিকের মুখের সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ানো। শফিককে সে প্রাণমন দিয়েই ভালবেসেছিল। সেই ভালবাসার প্রতিদানে কেন সে তাদের পরিবারের এমন চরম সর্বনাশ করল? অপমানটাই বড় হল তার কাছে, ভালবাসাটা কিছু না? ফিরোজা যাবে। ফিরোজা শফিককে বলবে তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম, শফিকদা। কিন্তু তুমি আমার ভালবাসার যে প্রতিদান দিয়েছ তার ফলে আত্মহত্যা না করে আমার আর কোন উপায় নেই।

সকলের অজান্তে দরজা খুলল ফিরোজা। বের হয়ে গেল ও বাড়ি থেকে। শফিকদের বাড়ি বস্তির যেখানে শুরু ঠিক সেখানটাতেই। দু'তিন মিনিটের রাস্তা। যাবে আর আসবে ও। তারপর ফিরে এসে দুধটুকু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে চিরতরে।

পরদিন ফিরোজার ঘুম ভাঙল রোজকার মতই সকাল সাতটায়। কিন্তু 'হ্যাপি কটেজ'-এরই অন্য একজন চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

মিসেস চৌধুরীর দরজা ভাঙা হল বেলা দশটায়। ডেকে ডেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁর। দরজা ভাঙার পর দেখা গেল মিসেস চৌধুরীর সর্বশরীর ঠাণ্ডা হিম। ডাক্তার আনানো হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল, 'মিসেস চৌধুরী মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ ধরতে হলে আরও পরীক্ষা করা দরকার। তবে

সম্ভবত, ঘুমের মধ্যে হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

চার

সেদিন সকালেও মি. সিম্পসনের অফিসে বৈঠক বসেছে শহীদ ও কামালের। আলোচনা তখন শুরু হয়নি। গল্পগুজব করছিল ওরা। এমন সময় বেজে উঠল টেবিলের উপর রাখা ফোনটা। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকালেন মি. সিম্পসন। দেখতে দেখতে ভারি হয়ে উঠল তাঁর মুখাকৃতি। খানিক পর রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে মি. সিম্পসন ত্যক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বড় মুশকিল দেখা যাচ্ছে! শহীদ, চৌধুরী সাহেবের "হ্যাপি কটেজ"-এ আবার যেতে হচ্ছে আমাকে একবার। এবার বাড়িতেই আর একজন নিহত হয়েছেন। মিসেস চৌধুরীকে মৃতা অবস্থায় পাওয়া গেছে তাঁর ঘরে। ছোট মেয়েটা, ফিরোজা ফোন করেছিল। তার বিশ্বাস তার মায়ের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। হত্যা করা হয়েছে! অনেক অপ্রকাশিত কথা নাকি আমাদেরকে শোনাবে সে। এখুনি একবার যেতে বলল।'

কামাল বলল, 'রহস্যটা দেখছি ক্রমশই জটিলতর হয়ে উঠছে। তা আমরা এখন এখানে করবটা কি বসে বসে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'চলো না তোমরাও। কি বলে শোনা যাবে।'

শহীদ বলে উঠল, 'সেই ভাল। চলুন, ঘুরেই আশা যাক।'

মি. সিম্পসন, শহীদ ও কামালকে দেখে 'হ্যাপি কটেজ'-এর প্রায় সকলেই বিস্মিত হল। মি. সিম্পসন বললেন ফিরোজা ফোন করেছিল।

বোঝা গেল ফিরোজা ফোন করেছিল একথা কেউ জানে না। মি. সিম্পসন বৈঠকখানা থেকে সকলকে চলে যাবার অনুরোধ জানিয়ে ফিরোজাকে একা পাঠিয়ে দিতে বললেন। সকলে ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল ফিরোজা। দরজাটা সে নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে ওদের তিনজনের মুখোমুখি বসল। উত্তেজনায় মিনিট তিনেক কোন কথাই বলতে পারল না ফিরোজা। তারপর নিচু স্বরে কথা বলতে শুরু করল। প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে নিতে লাগলেন মি. সিম্পসন। ফিরোজা প্রথমেই স্বীকার করল যে ছোটদার নিহত হবার সংবাদ যে দিয়েছিল সে নিজের নাম বলেছিল। শফিককে সে ভাল করেই চিনত। ফিরোজা ওদের প্রেমমূলক সম্পর্কের কথাও লুকোল না। সেজন্যেই প্রথমে নাম বলতে রাজি হয়নি সে। কিন্তু কাল রাতে মায়ের ঘর থেকে ঘুমের ট্যাবলেট চুরি করার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে শফিকের খোঁজে গিয়ে যখন সে দেখল শফিকের বাড়িতে পুলিস মোতায়েন এবং তারা বলাবলি করছে শফিক যে জামাল চৌধুরীকে হত্যা করে পালিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই তখন তার মনেও কোন সন্দেহ রইল না আর।

ঘুমের ট্যাবলেট মেশানো দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে সে। ঘুম আর ভাঙবে না, এই ভেবেছিল ও। কিন্তু ঘুম তার যথারীতি ভেঙেছে। ঘুম ভাঙতে যখন দেখল যে সে মরেনি তখন কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। একটু আনন্দবোধও করেছিল। কিন্তু বেলা দশটায় যখন মায়ের দরজা ভেঙে দেখা গেল মা মৃতা তখন কেমন যেন রহস্যময় মনে হয় ওর কাছে ব্যাপারটা। সকলের অজ্ঞাতে মায়ের দুধের গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে দেখে সে। শিউরে ওঠে ও। গ্লাসের নিচে দু'তিন ফোঁটা দুধের সঙ্গে ঘুমের গুঁড়ানো ট্যাবলেট পরিষ্কার দেখতে পায় ও।

মি. সিম্পসন চমকে উঠে জানতে চাইলেন, 'তার মানে তুমি যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও তখন কেউ তোমার দুধের গ্লাসের সঙ্গে তোমার আম্মার দুধের গ্লাস বদলাবদলি করে রেখে গিয়েছিল?'

ফিরোজা আঁতকে উঠে বলে উঠল, 'কিন্তু কে এমন কাজ করবে? কে এমন শত্রু আছে আমাদের? তাছাড়া সে জানলই বা কিভাবে আমি ঘুমের ট্যাবলেট চুরি করেছি, তারপর দুধের গ্লাসে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিয়েছি?'

'তুমি যখন গ্লাসে ট্যাবলেট মেশাচ্ছিলে তখন তোমার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ছিল?'

'না। দরজা বন্ধ ছিল শুধু।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'জানালা দিয়ে কেউ তোমাকে দেখে থাকতে পারে। তুমি বাড়ি থেকে বাইরে বের হয়ে যেতেই ষড়যন্ত্রটা মাথায় ঢোকে তার। বাড়িতে তখন কে কোথায় ছিল বলো তো?'

'আম্মা ছিলেন আব্বার ঘরে। আম্মার ঘরে কেউ ছিল না। বড়দার ঘরে বাতি জ্বলছিল, মেজ দুলাভাইয়ের ঘরেও বাতি জ্বলছিল, বড় দুলাভাইয়ের ঘরেও জ্বলছিল সম্ভবত। সকলেই জেগেছিল, কিন্তু দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে-বসে ছিল বোধহয়।'

'এ বাড়ির চাকরাণী?'

ফিরোজা বলল, 'সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় নাক ডাকার শব্দ শুনেছিলাম আমি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'গ্লাস দুটো কি সরিয়ে ফেলা হয়েছে?'

'না। আপনাদের কাজে লাগবে মনে করে দুটো গ্লাসই, আমারটা এবং আম্মারটাও লুকিয়ে রেখে দিয়েছি আমি। সকালবেলা আম্মার গ্লাসটা ধরার সময় রুমাল ব্যবহার করেছিলাম আমি।'

'খুব ভাল করেছ। খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ তুমি। গ্লাসে হয়ত হাতের ছাপ পাওয়া যেতে পারে। গ্লাস দুটো এনে দাও দেখি এখুনি।'

ফিরোজা উঠে চলে গেল গ্লাস দুটো আনতে। কামাল মন্তব্য করল, 'বড় রহস্যময় ব্যাপার, তুই যা-ই বলিস শহীদ। শফিকই যদি হত্যা করে থাকে জামালকে তাহলে কেন সে স্বীকার করতে যাবে যেচে পড়ে? হত্যা করে কেউ

ফোন করে এভাবে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'উত্তেজনার মুহূর্তে কি করছে মানুষ তা ভাবে না। কথাটা সত্যি নয়?'

কামাল প্রশ্ন করল, 'জামালকে হত্যা করার কারণ না হয় বোঝা গেল। কিন্তু মিসেস চৌধুরীকে কে হত্যা করল? এক্ষেত্রে শফিকের স্বার্থ কি? তার পক্ষে সম্ভবই বা কেমন করে দুধের গ্লাস বদলানো?'

মি. সিম্পসন চিন্তা করে বললেন, 'এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারও থাকতে পারে। হয়ত মিসেস চৌধুরী স্বয়ং মেয়ের দুধের গ্লাস বদলে নিয়ে গিয়েছিলেন। হয়ত তার গ্লাসে বেশি দুধ ছিল। বেশি দুধটুকু মেয়েকে খাওয়াবার সাধ জাগাটা মায়েদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।'

কামাল হেসে উঠল। বলল, 'সেক্ষেত্রে ফিরোজাকে ঘরে না দেখে তিনি কিছু ভাবেননি কেন? ভাবলে কেন জিজ্ঞেস করেননি কাউকে ফিরোজার কথা?'

মি. সিম্পসন চুপ করে রইলেন। এমন সময় দুটো গ্লাস একটা রুমালে জড়িয়ে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকল ফিরোজা। গ্লাস দুটো টেবিলে রাখতে শহীদ জোরে একবার নিঃশ্বাস নিল। মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে রইল ও গ্লাস দুটোর দিকে তারপর অন্যমনস্কভাবে দুটো গ্লাসই হাতে তুলে নিল ও। রেখে দিল একটু পরই।

গ্লাস দুটো হস্তগত করে মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা ফিরোজা, শফিকই যে তোমাকে ফোন করেছিল সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?'

ফিরোজা সন্ধানী চোখে মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'শফিকদা নিজের নাম বলেছিল।'

'গলার স্বর ঠিক শফিকের বলে চিনতে পেরেছিলে তুমি?'

ফিরোজা বলল, 'তখন গলার স্বরের দিকে মনোযোগ ছিল না আমার। ওর নাম শুনে বুঝতে পেরেছিলাম যে কে কথা বলছে।'

'কিন্তু, ধরো, নাম যদি না বলত—তাহলেও বুঝতে পারতে কি কে ফোন করেছিল?'

ফিরোজা একটু চিন্তা করে বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না। হয়ত শফিককে সন্দেহ করতাম না। কেননা ও এমন কাজ করতে পারে তা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হত।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে আসলে শফিক ফোন করেনি, শফিকের নাম ব্যবহার করে ফোন করেছিল অন্য কেউ, শফিকের ঘাড়ে সব দোষ চাপাবার জন্যে।'

ফিরোজা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মি. সিম্পসনের দিকে। বলল, 'তা হতে হতে পারে। কিন্তু শফিকদা যদি ছোটদাকে খুন না করে থাকে তাহলে সে পালিয়ে যাবে কেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'সে কথা সত্য বটে।'

শহীদ এই প্রথম একটা মন্তব্য করল, 'পালিয়ে যাবার অসংখ্য কারণ থাকতে পারে। খুন করেছে। সুতরাং পালিয়ে গেছে এমন না-ও হতে পারে।'

ফিরোজা জিজ্ঞেস করল, 'শফিকদাই সত্যি সত্যি খুন করেছে বলে আপনাদের ধারণা?'

'এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। পালিয়ে যাবার অনেক কারণ থাকতে পারে বটে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়াটা প্রকৃত পক্ষে রহস্যময়। ওর সন্ধানে প্রতিটি শহরে লোক ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ওকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।'

ফিরোজা বলল, 'কিন্তু আমার আম্মার ব্যাপারটা কি? শফিকদা কেন আম্মাকে হত্যা করবে? বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার সময় আমি দরজা খুলে গিয়েছিলাম, তখন অবশ্য বাড়িতে ঢুকলেও ঢুকতে পারে সে। কিন্তু আমার দুধের গ্লাসে যে ঘুমের ট্যাবলেট মেশানো আছে তা সে জানবে কেমন করে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর এখন দেয়া সম্ভব নয় কোনমতেই। তবে অনুমানের উপর নির্ভর করে এ কথা বলা চলে যে, শফিক তো আগে থেকেও বাড়ির ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে। সে হয়ত লুকিয়ে লুকিয়ে সব লক্ষ করেছে।'

ফিরোজা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠল, 'কিন্তু আম্মার ব্যাপারটা ঘটার পর আমি আর শফিককে সন্দেহ করতে পারছি না। আমার যেন মনে হচ্ছে দুটো হত্যার পিছনেই অন্য কোন রহস্য আছে।'

'বিশেষ ভাবে তুমি কাউকে সন্দেহ করো এ ব্যাপারে?'

ফিরোজা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। একটু পর কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু বলল, 'না। কাউকে সন্দেহ করি না আমি।'

ফিরোজা এরপর চলে গেল। জেরা শুরু করার আগে শহীদ কানে কানে মি. সিম্পসনকে কি যেন বলল। মি. সিম্পসন চৌধুরী সাহেবকে ডেকে বললেন যে বৈঠকখানায় আর কাউকে আসতে হবে না। ওরাই প্রত্যেকের ঘরে যাবে। তারপর একে একে বাড়ির সকলকে জেরা করা হল। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না মি. সিম্পসনের। মিসেস চৌধুরী ঘর থেকে বের হয়ে কখন স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন এবং কখন আবার নিজের ঘরে এসে দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন তা কেউই বলতে পারল না। শুধু চৌধুরী সাহেব বললেন, 'আমার স্ত্রীকে আমিই বারবার বলেকয়ে দুধ খাইয়ে বিছানায় উঠিয়ে দিয়েছিলাম। কে জানত…!'

প্রত্যেকের নিজস্ব শোবার ঘরে গেল ওরা তিনজন। সকলের জবানবন্দী লিখে নেয়া হল। শহীদ আলাদা আলাদা ভাবে সকলকে একই প্রশ্ন করল—ফিরোজার ঘরে কাল রাত থেকে এখন অবধি কেউ ঢুকেছিল কিনা। চাকরাণীটা ছাড়া আর

সকলেই বলল ঢোকেনি। ফিরোজার ঘরের টেবিলের নিচ থেকে একটা সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে পেল শহীদ। কাউকে কিছু না জানিয়ে সেটা পকেটে চালান করে দিল ও।

এরপর বিদায় নিয়ে চলে এল ওরা তিনজন।

বিকেলবেলা গ্লাসের পরীক্ষা শেষে রিপোর্ট এল মি. সিম্পসনের অফিসে। দুটো গ্লাসেই ফিরোজার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। দুটোর একটিতে পাওয়া গেছে মিসেস চৌধুরীরও। অন্য কেউ গ্লাস দুটো বদলা-বদলি করার সময় ধরে থাকলেও রুমাল ব্যবহার করছিল নিশ্চয়। তাই ছাপ ওঠেনি।

বেলা সাড়ে চারটার সময় হঠাৎ অফিসে এসে হাজির হলেন মিসেস সালাম। কথাবার্তা শুরু হল। মিসেস সালাম বললেন, 'মি. সিম্পসন, জামাল যখন নিহত হয় তখন আমার স্বামী কোথায় ছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর আমার স্বামী সঠিক দিতে পারেননি। একথা আমার স্বামীই আমাকে বলেছেন। জামাল যখন নিহত হয় তখন তিনি ছিলেন আমার মায়ের বাড়ি। আমার মা-বাবা বড় গরীব এবং তাঁদের সাথে আমার শ্বশুর বাড়ির সম্পর্ক ভাল নয়। আমার স্বামী কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন ওঁদেরকে। সেদিনও গিয়েছিলেন আমার মায়ের হাতে কিছু টাকা দেবার জন্যে। কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি অসন্তুষ্ট হবেন মনে করে আপনার কাছে প্রকাশ করেননি। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম কাজটা উচিত হচ্ছে না। আপনারা আমার স্বামীকে সন্দেহ করবেন, এদিকে আসল খুনী নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে হয়ত। তাই কথাটা বলতে এলাম। কিন্তু আমার শ্বশুর-শাশুড়ি যেন একথাটা না জানেন, আমার অনুরোধ।'

মি. সিম্পসন আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কেউ জানবে না। আচ্ছা, দুটো খুনের ব্যাপারে আপনার সন্দেহ হয় কাউকে?'

মিসেস সালাম বললেন, 'আপনাকে এ প্রশ্নের উত্তর আগেও দিয়েছি। কাউকে সন্দেহ করবার মত দেখছি না আমি। তবে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার কাল থেকে লক্ষ করছি আমি। গতকাল আমার শাশুড়ি আমার স্বামীকে একা ডেকে কি যেন বলেছিলেন। শাশুড়ির ঘর থেকে আসার পর ওকে কেমন যেন গম্ভীর, চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বলেছে, "ও কিছু না। সব কথা তোমার শোনার দরকার নেই।" '

'ব্যাপারটা কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, মি. সিম্পসন।'

এরপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মিসেস সালাম।

মি. সিম্পসন রিপোর্ট লিখতে বসলেন।

পাঁচ

একদিন পরের ঘটনা।

রাত একটা। ডেমরা রোড। বৃষ্টি ভেজা পিচ্ছিল কংক্রিটের নির্জন রাস্তা। নারায়ণগঞ্জের দিক থেকে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে একটা ভাড়াটে মোটর গাড়ি। গাড়িতে কোন প্যাসেঞ্জার নেই। ড্রাইভার কাসেম আলী প্যাসেঞ্জার নামিয়ে ফিরে আসছে গ্যারেজের উদ্দেশে ঢাকায়।

গাড়ি চালাতে চালাতে কাসেম আলীর চোখ জোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল হঠাৎ। এতক্ষণ রাস্তায় কোন জনমানবের চিহ্ন দেখেনি সে। গাড়ি-ঘোড়াও বড় একটা নজরে পড়েনি। বৃষ্টির রাত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হয় না কেউ। ঢাকার প্যাসেঞ্জার পাবে এই আশায় নারায়ণগঞ্জ ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল সে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে খালি গাড়ি নিয়েই ফিরতি পথে রওনা দিয়েছে সে। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে, ওই দূরে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মানুষ। কি ব্যাপার? কে ও?

আরও সামনে এসে একজন মানুষকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পরিষ্কার দেখতে পেল ড্রাইভার কাসেম। সাবধান হয়ে গেল সে। ডেমরা রোডে প্রায়ই ডাকাতি হয় আজকাল। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল ও। গাড়িটা আরও সামনে বাড়তে কাসেম আলী অবাক হয়ে দেখল রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ানো লোকটার বেশবাস ভদ্রলোকের মত। এবং তার পায়ের কাছে একজন মানুষ পড়ে রয়েছে। রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে নিঃসাড় লোকটার শার্টে। দাঁড়ানো লোকটা গাড়ি থামাবার জন্যে কাসেম আলীর উদ্দেশে হাত নাড়ছে উত্তেজিত ভাবে।

দ্রুত চিন্তা করতে লাগল কাসেম আলী। দাঁড়ানো লোকটাকে জরিপ করার চেষ্টা করল সে। সন্দেহজনক মনে হল না ভদ্রলোককে। হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কি মনে করে গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিল কাসেম আলী। একটু পরই গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার পাশে।

পাদানি থেকে সাবধানতার জন্যে একটা ছোট হাতুড়ি তুলে নিল কাসেম আলী। বলা যায় না কার মনে কি আছে। সাবধান থাকা ভাল। হাতুড়িটা পকেটে চালান করে দিয়ে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ না করেই নেমে পড়ল সে। ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে সুবেশী লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সুবেশী লোকটা উত্তেজিতভাবে বলল, 'তুমি গাড়ি নিয়ে কোন দিকে যাবে, ভাই?'

কাসেম আলী লোকটার গলার স্বরে ব্যাকুলতার রেশ দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হল। নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েছে বুঝতে পারল সে। বলল, 'নবাবগঞ্জের দিকে যাব।'

সুবেশী বলল, 'ভয়ানক একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে, ড্রাইভার! এই লোকটা আমার বন্ধু। এর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম আমি। হঠাৎ ওর দাদীর শরীর খারাপ হয়ে যায় বলে ডাক্তার ডাকার জন্যে বেরিয়েছিলাম আমরা। রাস্তা পেরোবার সময় হঠাৎ একটা ট্রাক ওকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে মিনিট পাঁচেক আগে। একে এখন হাসপাতালে না পাঠাতে পারলে হয়ত বাঁচানই যাবে না! অজ্ঞান হয়ে গেছে, ভীষণ জোরে ধাক্কা খেয়েছে তো!'

ড্রাইভার ইতস্তত করতে লাগল। সুবেশী লোকটা বলল, 'একটু কষ্ট হলেও ভাই, মেডিকেল কলেজে পৌঁছে দিতে হবে একে। একটু উপকার তোমাকে করতেই হবে।'

ড্রাইভারের সহানুভূতি জাগল। বলল, 'ঠিক আছে, গাড়িতে তুলুন আপনার বন্ধুকে।'

সুবেশী লোকটা তার বন্ধুর জ্ঞানহীন দেহটা গাড়িতে তুলে দিল। অবশ্য লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে না একেবারে মরে গেছে তা ড্রাইভার কাসেম আলী সঠিক বুঝতে পারল না। সুবেশী লোকটা বলল, 'তুমি আমার ঠিকানা নিয়ে রাখো। আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে খবরটা জানিয়ে আসি আগে। তারপর মেডিকেলে যাব। মেডিকেলে হয়ত তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কার কাছ থেকে তুমি দুর্ঘটনার কথা জেনেছ। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি তোমাকে।'

একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিল সুবেশী লোকটা। ড্রাইভার সেটা পকেটে রেখে গাড়ি ছেড়ে দিল। সুবেশী লোকটা রাস্তার পাশে সরু মেঠো পথ দিয়ে নেমে গেল গ্রামের দিকে।

ছুটে চলল কাসেম আলীর গাড়ি মেডিকেল হাসপাতালের দিকে।

রাত একটা কুড়ি মিনিটে মেডিকেলে ভর্তি করা হল ড্রাইভার কাসেম আলী কর্তৃক আনীত লোকটাকে। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ডাক্তার লোকটাকে দেখেই চমকে উঠলেন। একটা হাত তুলে নিয়ে পাল্‌স দেখেই দারোয়ানকে ডেকে পাঠালেন তিনি। বললেন, 'কে এনেছে লাশ?'

দারোয়ান উত্তর দিল, 'একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, স্যার।'

ডাক্তার বললেন, 'কি বলেছে সে?'

ট্রাক নাকি ধাক্কা মেরে পালিয়েছে। একটা লোক ওর গাড়ি করে পাঠিয়েছে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যে।'

ডাক্তার বললেন, 'ইনভেস্টিগেশন অফিসার আবদুল হককে পুলিসে ফোন করতে বলে দাও এখুনি। ড্রাইভারটাকে আটকাও। মিথ্যে কথা বলছে সে অথবা কেউ তাকে বোকা বানিয়েছে। লোকটা ট্রাক দুর্ঘটনায় মারা যায়নি। মারা গেছে মাথায় ডাণ্ডা জাতীয় কোন অস্ত্রের আঘাতে। কমপক্ষে তিনঘন্টা আগে মারা গেছে লোকটা।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে পুলিস এলো হাসপাতালে। ড্রাইভার কাসেম আলীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করল বড় দারোগা। কাসেম আলী সত্য ঘটনা বিবৃত করল। ঠিকানাটা নিল ড্রাইভারের কাছ থেকে। ড্রাইভারকে নিয়ে গেল জেল হাজতে। সকাল না হওয়া অবধি বিবেচনা করা যাবে না তার মুক্তির ব্যাপারটা।

রাত তিনটেয় থানা থেকে ফোন এল চৌধুরী সাহেবের 'হ্যাপি কটেজ'-এ। চৌধুরী সাহেবের বড় এবং মেজ জামাই রাত দুটোর সময় থানায় ডায়েরী করে গেছে সালাম চৌধুরীর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। থানা থেকে ফোন করল বড় দারোগা। ফোন ধরল বড় জামাই। বাড়ির সকলে আতঙ্কিত মনে অপেক্ষা করছিল। বড় জামাই বড় দারোগার বক্তব্য শুনল ফোনে। রিসিভারটা পড়ে গেল তার হাত থেকে।

'কি হয়েছে!'

কান্না মিশ্রিত আতঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করে উঠল সকলে। বড় জামাই ঢোক গিলে অশুভ সংবাদটা উচ্চারণ করল অতি কষ্টে, 'সালামের লাশ পাওয়া গেছে। মেডিকেলে আছে লাশ।'

শোকের উপর শোক। পাথরের মত বড় জামাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সকলে। কেঁদে ওঠার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে ওদের।

মি. সিম্পসন সকাল ন'টায় একা উপস্থিত হলেন 'হ্যাপি কটেজ'-এ। তাঁকে দেখে কোনরকম প্রতিক্রিয়া হল না চৌধুরী বাড়ির কারোর মধ্যে। পুলিস শুধু জেরা আর যাতায়াতই করতে পারে। খুনীকে খুঁজে বের করতে পারে না। এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে সকলের মনে। একে একে খুন হল বাড়ির ছোট ছেলে, বাড়ির কর্ত্রী এবং বাড়ির বড় ছেলে। অথচ পুলিস এখনও পরিষ্কার ভাবে সন্দেহও করতে পারল না কাউকে তিন-তিনটে খুনের দায়ী হিসেবে। মি. সিম্পসন মেজ জামাইকে জেরা করলেন সর্বপ্রথম। মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় ছিলেন আপনি গতকাল রাতে, মি. রশিদ?'

আবদুর রশিদ বিষণ্নস্বরে উত্তর দিল, 'সন্ধে সাড়ে সাতটায় বাড়ি থেকে বের হই আমি। আমার হোটেল মহল অ্যাণ্ড বারে পৌঁছুই সাতটা পঁয়ত্রিশে।'

'পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গেলেন মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ায়?'

মেজ জামাই বলল, 'পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। ওঃ, আপনি বুঝি জানেন না আমার গাড়ি আছে?'

'গাড়ি করে অবশ্য পাঁচ মিনিটই লাগার কথা। বলে যান।'

'রাত বারোটায় বের হই আমি আমার হোটেল অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট থেকে।'

'রাত বারোটার আগে আপনি আর বের হননি? প্রমাণ করতে পারবেন?'

মেজ জামাই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। মি. সিম্পসন অবশ্য বুঝতে পারছিলেন কারণটা। একটা বাড়িতে পরপর তিনটে

খুন হয়ে গেলে মানুষ তো দিশেহারা হয়ে পড়বেই। আবদুর রশিদ উত্তরে বলল, 'প্রমাণ আর কেমন করে করব? হোটেলের সব কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। যারা দেখেছে আমাকে তারাই বলতে পারবে বারোটার আগে বের হয়েছিলাম কিনা।'

'দয়া করে আপনার ফোন নম্বরটা দেবেন?'

ফোন নম্বরটা দিল আবদুর রশিদ। মি. সিম্পসন তখুনি ফোন করলেন হোটেল মহল অ্যাণ্ড বারে। কথাটা জিজ্ঞেস করে অপেক্ষা করতে হল না মি. সিম্পসনকে। ক্লার্ক উত্তর দিল, 'জ্বি, স্যার, মি. রশিদ গতকাল রাত বারোটায় গেছেন হোটেল থেকে। না, তার আগে কেউ দেখেনি তাঁকে বের হতে।'

ফোন রেখে দিয়ে মি. সিম্পসন বললেন, 'কর্তব্যের খাতিরে অপ্রীতিকর কাজ করতে হয়। কিছু মনে করবেন না।'

আবদুর রশিদ বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে রইল মি. সিম্পসনের দিকে। কথা বলল না। মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'বারোটার পর?'

'বারোটা পাঁচে বাড়ি ফিরি আমি। এসে শুনি সালাম বাড়ি ফেরেনি। আমার বাড়ি থেকে বের হবার পরই বেরিয়েছে, অথচ তখনও দেখা নেই। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর গাড়ি নিয়ে বের হলাম। ওর শ্বশুর বাড়ি গেলাম, সেখানেও নেই। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম আমি। রাত তখন হবে একটা দশ।'

মি. সিম্পসন ভেবে দেখলেন ব্যাপারটা। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট অনুযায়ী সালাম চৌধুরীকে হত্যা করা হয়েছে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে। তারপর মাথায় লোহার রড বা ওই জাতীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টের গল্পটা তৈরি করার জন্যেই মাথায় ঘা মারা হয়েছে বলে মি. সিম্পসনের বিশ্বাস। মৃত্যুর সঠিক সময় সম্পর্কে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। মৃত্যু সন্ধ্যা সাতটা থেকে দশটার মধ্যে যে-কোন সময় হতে পারে। এদিক দিয়ে আবদুর রশিদকে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু রাত একটার সময় ট্যাক্সি ড্রাইভার কাসেম আলীকে যে সুবেশী লোক লাশটা মেডিকেল হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ভার দেয় সে যদি 'হ্যাপি কটেজ'-এর কেউ হয় তাহলে রাত একটার সময় এরা কে কোথায় ছিল তা জানা দরকার।

'রাত ঠিক একটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

মি. সিম্পসনের প্রশ্নের উত্তরে আবদুর রশিদ বলল, 'রাত একটার সময় আমি সালামের ছোট মামার বাড়ি থেকে ওর বড় মামার বাড়ি যাচ্ছিলাম। যাবার পথে ঘড়ি দেখেছিলাম। তখন একটা বাজে। ওর বড় মামাকে সালামের কথা জিজ্ঞেস করে বাড়ি ফিরে আসি আমি। রাত তখন একটা দশ।'

সালাম চৌধুরীর দুই মামার বাড়িতেই ফোন আছে। ফোন করে জেনে নিলেন ব্যাপারটা মি. সিম্পসন। দুই মামাই বললেন তাঁরা ঘড়ি দেখেননি বটে, কিন্তু মি.

সিম্পসন যে সময়ের কথা জিজ্ঞেস করছেন সামান্য কমবেশি সেই সময়েই আবদুর রশিদ তাঁদের বাড়ি গিয়েছিল।

আবদুর রশিদকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। মি. সিম্পসন বড় জামাই রুহুল আমিনকে ডেকে দিতে বললেন। রুহুল আমিনকে বেশি প্রশ্ন করার দরকার পড়ল না। কেননা কাল সন্ধ্যার পর থেকে বাইরেই বের হয়নি রুহুল আমিন।

সুতরাং আবার দোষী সন্দেহ করতে হয় সেই ফিরোজার প্রেমিক শফিককে। মি. সিম্পসন এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তিনটে হত্যার জন্যে শফিকই দায়ী। যে সুবেশী লোকটা ড্রাইভার কাসেম আলীকে সালামের লাশটা মেডিকেলে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিয়ে কেটে পড়ে সে নিজের ঠিকানা লিখে দিয়েছিল কাসেম আলীকে। পুলিস ভোর রাতে সেই ঠিকানায় পৌঁছে দেখে ঠিকানাটা শফিকের ছাড়া আর কারও নয়। বেচারা ড্রাইভার কাসেম আলীকে কয়েদ করে রাখার কোন মানে খুঁজে পাননি মি. সিম্পসন। তাকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে এসেছেন তিনি।

মি. সিম্পসন আর কাউকে জেরা করবেন কিনা ভাবছিলেন। এমন সময় বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন সালাম চৌধুরীর স্ত্রী মিসেস সালাম।

আসন গ্রহণ করে মিসেস সালাম বলল, 'মি. সিম্পসন আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে সেদিন আপনার অফিসে গিয়ে আমি বলেছিলাম আমার শাশুড়ি আমার স্বামীকে কিছু বলেছিলেন এবং তারপর থেকে আমার স্বামী অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। আমার এখন সন্দেহ ব্যাপারটা একটা শার্ট সম্পর্কে। আমার শাশুড়ি সম্ভবত একটা শার্ট সম্পর্কে কোন কথা আমার স্বামীকে বলেছিলেন।'

'আপনার সন্দেহের কারণ কি?'

'গতকাল আমার স্বামী আমাকে লুকিয়ে একটা লণ্ড্রির প্যাকেট ঘরে নিয়ে এসে রাখেন। তোশকের তলায় সেটা রেখেছিলেন তিনি। রাখার সময় আমি ঘরে ছিলাম না, কিন্তু জানালা দিয়ে ব্যাপারটা আমি দেখে ফেলি। আমার স্বামী বাথরুমে গেলে তোশক উল্টে আমি দেখি প্যাকেটটায় একটা ইস্ত্রি করা শার্ট রয়েছে। শার্টটা লণ্ড্রি থেকে সদ্য আনানো হয়েছে তা আমি বুঝতে পারি। এবং বুঝতে পারি শার্টটা আমার স্বামীই এনেছেন। বাইরে থেকে এসেই তোশকের নিচে ওটা রাখেন তিনি। শার্টটা যে কার তা আমি চিনতে পারিনি। বাড়িতে কার ক'টা, কি রকম শার্ট আছে তা সঠিক ভাবে জানি না। বাড়ির যে কারও হতে পারে ওটা। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, শার্টটা লণ্ড্রি থেকে ধোলাই হয়ে আসেনি। ঘরে ধুয়ে লণ্ড্রি থেকে ইস্ত্রি করে আনানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের বাড়ির পুরুষদের কোন শার্ট-প্যান্টই বাড়িতে ধোয়া হয় না। লণ্ড্রিতে কাপড় ধোয়া হলে লণ্ড্রি থেকে মোটা এবং ছোট্ট এক ইঞ্চি একটা কাপড়ের টুকরোয় নম্বর লাগানো থাকে। সুতো দিয়ে সেলাই করা থাকে সেটা। কিন্তু এটাতে সেরকম কিছু ছিল না। খবরের কাগজ দিয়ে শার্টটা জড়ানো

ছিল। এবং নম্বর লাগানো ছিল সাদা এক টুকরো কাগজে। নম্বরটা আমি দেখতে পাই এবং লুকিয়ে ফেলি। তারপর রান্নাঘরে যাই আমি। আমার স্বামী বাথরুম থেকে বের হয়ে চায়ের জন্যে রান্না ঘরে আমার কাছে যান। তারপর ঘরে ফিরে আসি আমরা দু'জন। এর ঘন্টা দুয়েক পর আমি আমার শ্বশুরের ঘরে যাই। পনেরো মিনিট পর আমার স্বামী আমাকে ডেকে পাঠান। আমি নিজের ঘরে ফিরে আসতে দেখি তোশকটা মেঝেতে পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করি আমি—এমন করল কে? আমার স্বামী উত্তেজিত ভাবে বলে উঠেন, 'তোশক সরিয়েছি আমি। একটা জিনিস রেখেছিলাম, সেটা পাচ্ছি না। তুমি দেখেছ নাকি?'

আমি বলি—দেখিনি। কিন্তু মনে মনে অবাক হয়ে ভাবি শার্টটা গেল কোথায়! যাই হোক, আমার স্বামীকে এরপর বারবার জিজ্ঞেস করি জিনিসটা আসলে কি? কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যান উনি। নম্বর লেখা কাগজটা আমি ওঁকে দিইনি। আপনাকে দেখাবার সুযোগ গতকাল পাইনি। তারপর রাতে খবর পেলাম আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি এসেছেন বলে, তা না হলে নম্বরটা দেখাবার জন্যে আপনার কাছে যেতাম। বড় ভয়ানক ভুল করেছি আমি। আমার ধারণা এই শার্টের পিছনে কোন না কোন রহস্য আছে। এবং সেই জন্যেই আমার স্বামী খুন হয়েছেন। গতকাল দিনে যদি এটা আপনাকে দিতে পারতাম তাহলে হয়ত এতবড় সর্বনাশ আমার ঘটত না।

মিসেস সালামের কাছ থেকে নম্বর লেখা কাগজটা নিয়ে পকেটে ফেললেন মি. সিম্পসন।

এরপর দু'একটা প্রশ্ন করে বিদায় নিলেন মি. সিম্পসন।

অফিসে ফিরে লণ্ড্রির নম্বরটা লিখে দিয়ে দু'জন কনস্টেবলকে চৌধুরীদের পাড়ায় এবং পাড়ার আশেপাশে সবক'টা লণ্ড্রিতে খোঁজ নেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন মি. সিম্পসন। ঘন্টা দুয়েক পর কনস্টেবল দু'জন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। প্রায় পনেরোটা লণ্ড্রিতে গিয়ে খোঁজ করেছে ওরা। নম্বরটা গত মাসখানেকের মধ্যে কোন লণ্ড্রি থেকেই ব্যবহার করা হয়নি।

সারাদিন 'হ্যাপি কটেজ'-এর হত্যা রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েও কোন কূল কিনারা করতে পারলেন না মি. সিম্পসন।

তারপর সন্ধ্যার সময় হঠাৎ বেজে উঠল ফোনটা।

খবর এসেছে, শফিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘোড়াশাল রেল স্টেশনে পুলিস ওকে গ্রেফতার করে। এই মুহূর্তে সে রমনা থানার জেল-হাজতে বন্দী। খবরটা পেয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটলেন মি. সিম্পসন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমনা থানায় পৌঁছে গেলেন মি. সিম্পসন। পৌঁছেই সাব ইন্সপেক্টরকে হুকুম করলেন, 'শফিককে অফিস রূমে আনাও।'

শফিককে দুজন কনস্টেবল পাহারা দিয়ে নিয়ে এল। ধীর পায়ে অফিস রূমে

এসে দাঁড়াল শফিক। হাত দুটোয় হ্যাণ্ডকাফ। দারুণ স্বাস্থ্য দেখে কনস্টেবল দু'জন দড়ি বেঁধে নিয়ে এসেছে শফিককে, যাতে পালাবার চেষ্টা করতে না পারে। অফিস রুমে ঢুকে যথাক্রমে সাব ইন্সপেক্টর এবং মি. সিম্পসনের দিকে তাকাল শফিক। শুকিয়ে গেছে মুখটা। রাতে সম্ভবত ঘুম হয়নি ভাল। চোখের নিচে কালির দাগ। কাপড় জামা ময়লা। মি. সিম্পসন শফিকের আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন তীব্র দৃষ্টিতে। হঠাৎ ভারি গলায় শফিক বলে উঠল, 'আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সত্যি কোন ফল পাবেন না আপনারা। আমার কথা আমি যা বলব তা যদি বিশ্বাস করেন সময় অপচয় হবে না আপনাদের।'

মি. সিম্পসন কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'উপদেশ দেবার মত উপযুক্ত এখনও হওনি তুমি, ছোকরা! বেশি কথা বলার চেষ্টা করো না। আমি যা প্রশ্ন করব তার উত্তর দিয়ে যাবে একের পর এক। তোমাকে বিশ্বাস করব কি করব না, সেটা আমাদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দাও।'

শফিক নিরুত্তর হয়ে গেল। মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাবার নাম মোহাম্মদ শফিক? তুমি নয়াপল্টনের বস্তি এলাকার একটা একতলা পাকা বাড়িতে থাকো?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'তোমার সাথে "হ্যাপি কটেজ"-এর ছোট মেয়ে ফিরোজার সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং জামাল যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিন তার সাথে মারামারি করেছিলে তুমি?'

'ফিরোজার সাথে সম্পর্কের কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু জামালের সাথে মারামারি করিনি আমি, জামাল একতরফাভাবে আমাকে মেরেছিল।'

মি. সিম্পসন সঙ্গে সঙ্গে কঠোর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'একতরফাভাবে মার খেয়ে তোমার মধ্যে প্রতিহিংসাবোধ জন্মেছিল এবং তার ফলে তুমি জামালকে খুন করেছ। তাই না?'

'না। জামালকে আমি খুন করিনি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই ফোন করে কথাটা ফিরোজাকে জানিয়েছ। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।'

শফিক চমকে উঠল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে মি. সিম্পসনের দিকে। তারপর বলে উঠল, 'এ কথাও অস্বীকার করছি আমি। ফিরোজাকে কেন, গত মাসখানেকের মধ্যে কাউকেই ফোন করিনি আমি।'

'কিন্তু তোমার প্রেমিকা নিজে যে কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছে!'

শফিক বলল, 'সে ভুল করেছে। এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।'

মি. সিম্পসন একটার পর একটা প্রশ্ন করে গেলেন। শফিক প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিল। কিন্তু তার কোন উত্তরই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না মি. সিম্পসনের। তিনটে খুনের অভিযোগই অস্বীকার করল সে। তবে সে পালিয়েছিল

কেন? উত্তরে বলল, ওর বন্ধুরা জানতে পারে পুলিস ওকে গ্রেফতার করার জন্যে ওর বাড়িতে অপেক্ষা করছে। তারা ওকে খবর দেয় এবং পালিয়ে যেতে বলে। মাথা ঠিক রাখতে না পেরে সে পালিয়ে যায় ঘোড়াশালে। ঘোড়াশালে কারও বাড়ি যায়নি সে। হোটেলে খেয়েছে এবং যেখানে সেখানে রাত কাটিয়েছে। সুতরাং সে যে ঘোড়াশালে ছিল তা প্রমাণ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। ওর দাবি হল মিসেস চৌধুরী এবং সালাম চৌধুরীর হত্যার সময় সে ঢাকাতে ছিল না। মোট কথা সব ক'টা অভিযোগই অস্বীকার করল শফিক। পুরো তিন ঘন্টা ধরে জেরা করেও তাঁকে দিয়ে কোন কথা স্বীকার করাতে পারলেন না মি. সিম্পসন। হুমকি দিলেন, ভয় দেখালেন, আশ্বাস দিলেন—কিন্তু শফিক অটল রইল তার বক্তব্যে।

ছয়

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যাবেলার কথা।

নয়া পল্টন। বস্তি এলাকা। সবেমাত্র সন্ধ্যার কালো ছায়া পৃথিবীর গায়ে কালো রঙ মাখিয়ে দিয়েছে।

বস্তি এলাকায় মুটে-মজুর, কুলি-কামিনরাই বাস করে। সন্ধে হতে না হতে এক মুঠো খেয়ে বা একেবারে না খেয়েই ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে বস্তিবাসীরা শুয়ে সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর জোরে জোরে হাঁপ ছাড়ছে। শুয়েছে বটে, কিন্তু কেউ ঘুমিয়ে পড়েনি। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে সহজে ঘুম আসার কথা নয়। তার উপর আগামীকাল কিভাবে কি কাজ করলে সারাদিন পর দু'মুঠো খাবার জুটবে সে দুশ্চিন্তায় চোখের পাতা এক হতে চায় না।

বস্তিবাসীরা কেউ ঘুমোয়নি। তাদের সকলের কানেই ঢুকছিল বুড়ো রফিক মিয়ার কান্নার করুণ সুর। রফিক মিয়ার কপাল মন্দ। একশো তিন বছরের বুড়ো রফিক মিয়া। দুনিয়ায় এক যুবক ছেলে ভিন্ন আর কেউ নেই তার। বস্তিবাসীরা জানে রফিক মিয়ার ছেলের মত ছেলে হয় না। হীরের টুকরো ছেলে শফিক। বস্তির একধারে একটা একতলায় বাপ-বেটাতে বাস করে ওরা। কিন্তু বস্তির ভাল-মন্দতে শফিক সকলের আগে সামনে এসে দাঁড়াত। বস্তির বাসিন্দাদেরকে শফিক বয়স অনুযায়ী ভাই, বোন, মা, বাপ বলে মনে করত। বস্তিবাসীরা প্রায় সকলেই শফিকের কাছে ঋণী। কত লোকের কত রকম উপকার যে শফিক করেছে তার কোন হিসেব দেয়া সম্ভব নয়। সেই হীরের টুকরো ছেলেকে পুলিস গ্রেফতার করেছে চৌধুরী সাহেবের দুই ছেলে এবং স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগে। বস্তিবাসীরা মনে মনে জানে শফিক এ কাজ করেনি। কিন্তু বস্তিবাসীদের মনে ভয়ও আছে, এবং তারা সবাই অশিক্ষিত। তাই কেউ কেউ ভাবে শফিক হয়ত সত্যিই খুন করেছে। তা না হলে কেন শফিককে পুলিস গ্রেফতার করবে? শফিক পালিয়ে

ছিলই বা কেন?

বুড়ো রফিক মিয়া ক'দিন থেকেই কান্নাকাটি করছে। একমাত্র ছেলে তার শফিক। বয়স হয়েছে নিজের। খেটে খাবার বয়স পার হয়ে গেছে সে বহুকাল আগে। শফিক একটা কারখানার কুলীর সর্দার হিসেবে কাজ করত। একশো কুলি খাটত তার অধীনে। বেশি মাইনে নয়। তবে যা পেত তাতেই বাপ-বেটার চলে যেত। শফিককে পুলিস ধরে নিয়ে যাবার পর বুড়োর হয়েছে মরণদশা। রোজ পয়সা আনত শফিক। শফিক নেই, পয়সাও নেই, বস্তিবাসীরা নিজেরাই গরীব। তারা কতদিন বুড়োকে খেতে দেবে?

নোংরা বস্তির সরু রাস্তা দিয়ে দীর্ঘাকৃতি, স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ ধীর পায়ে হাঁটছিল। তার কানেও প্রবেশ করেছে বুড়োর করুণ কান্নার সুর। ধীর পায়ে বস্তির করুণ দৃশ্য দেখতে দেখতে এগোচ্ছে অস্বাভাবিক লম্বা-চওড়া মানুষটা। পরনে তার কালো রঙের প্যান্ট এবং হালকা নীলচে রঙের শার্ট। মানুষটার বিশাল বুক মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠছে। দীর্ঘশ্বাস নেবার ফলে এমনটি হচ্ছে। মানুষ পৃথিবীতে কত কষ্ট করে বেঁচে থাকে সে দৃশ্য স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করতে করতে দুঃখে এবং দুশ্চিন্তায় চোখ দুটো চকচক করছে তার। এগিয়ে চলেছে সে রফিক মিয়ার কান্নার সুর লক্ষ করে।

বস্তিবাসীরা হঠাৎ আর শুনতে পেল না বুড়ো রফিক মিয়ার কান্নার শব্দ। কেন না বিশাল বুকওয়ালা সেই দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি বুড়ো রফিক মিয়ার বাড়ির ভিতর ঢুকে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বাবা; আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার কি দুঃখ?'

অকস্মাৎ ভারি অপরিচিত কণ্ঠে 'বাবা' সম্বোধন শুনে চমকে উঠে জল ভরা চোখ দুটো ফিরিয়ে তাকাল রফিক মিয়া। রফিক মিয়ার শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে বয়সের ছাপ পরিস্ফুট। বিস্মিত চোখে একরাশ অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘাকৃতি অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল সে। দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি মোলায়েম কণ্ঠে আবার বলল, 'আপনি আপনার দুঃখের কথা সব আমাকে শোনান, বাবা। আমি চেষ্টা করব আপনার দুঃখ দূর করার।'

'তুমি···তুমি কে, বাবা! এত মায়াদয়া তোমার মনে? এমন ভাল মানুষ দুনিয়ায় এখনও আছে, একথা যে বিশ্বাস করতে পারিনি এতদিন, বাবা!'

দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি হাসিমুখে বলল, 'আমি ভাল মানুষ নই, বাবা। আমার পরিচয় জেনে কোন উপকার হবে না আপনার। আমি মানুষ, এটাই আমার সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র পরিচয়। মানুষই মানুষের দুঃখ দূর করতে চায় এবং পারে। আপনি আমাকে বলুন বাবা সব কথা।'

বুড়ো রফিক মিয়া দম নিতে নিতে তার দুর্ভাগ্যের কথা ব্যক্ত করল। সব শুনল দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি। তারপর সেই মহান আশ্বাসের হাসি হেসে বলল, 'আপনার

উপকার বিশেষ কিছু করতে পারব না আমি, বাবা। তবে আমার দ্বারা যতটা করা সম্ভব আমি তার সবই করব। আপনি বললেন, আপনার ছেলেকে এক নজর দেখতে চান আপনি। আমি কথা দিচ্ছি আগামী কাল সকাল দশটায় আপনার ছেলে এখানে এসে আপনার সাথে দেখা করে যাবে। তা সে দোষীই হোক বা নির্দোষই হোক। কথা দিলাম আমি।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব?' রফিক মিয়া আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

কথাটা বলে দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বুড়ো রফিক মিয়ার সামনে রেখে ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি কে, বাবা!' ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে উঠল রফিক মিয়া।

কোন উত্তর মিলল না। অদৃশ্য হয়েছে সেই দয়ামায়ার বিশাল শরীর।

পরদিন সকাল বেলার ঘটনা। বেলা ন'টা। রমনা থানার সামনে একটা প্রিজন ভ্যান এসে দাঁড়াতেই গার্ডবক্স থেকে দু'জন কনস্টেবল লাফিয়ে নেমে পড়ল থানা কম্পাউণ্ডের ভিতর। দ্রুত পায়ে সিধে অফিস রূমে গিয়ে ঢুকল ওরা। একজন পকেট থেকে একটা বড় কাগজ বের করে বড় দারোগার সামনের টেবিলে রাখল। তার আগে নিখুঁত ভঙ্গিতে দু'জনেই স্যালুট ঠুকে সম্মান প্রদর্শন করে নিয়েছে।

বড় দারোগা গম্ভীরভাবে ওদের দু'জনকে দেখে নিয়ে টেবিল থেকে টাইপ করা কাগজটা তুলে পড়তে শুরু করল। চিঠিটা পড়ে আবার ওদের দু'জনের দিকে তাকাল সে। তারপর মি. সিম্পসনের সইটা দেখল টাইপ করা চিঠিটার নিম্নাংশে দৃষ্টি রেখে। পরক্ষণেই চোখ তুলে বেল টিপল। একজন কনস্টেবল ঢুকল অফিসে। বড় দারোগা গম্ভীর স্বরে হুকুম করল, 'কয়েদী শফিককে হাজির করো।'

শফিককে নিয়ে আসা হল দু'মিনিটের মধ্যেই। বড় দারোগা আগন্তুক দুই কনস্টেবলকে একটা খাতা দেখিয়ে বলল, 'সই করো এখানে।'

কনস্টেবলদ্বয় একে একে সই করল। বড় দারোগা সই দুটো পরীক্ষা করে বলল, 'নিয়ে যাও। দেখো, সাবধানে যেয়ো। তিনটে খুনের দায় ওর ঘাড়ে। পালালে রক্ষা নেই।'

স্যালুট করল আবার কনস্টেবলদ্বয়। দু'জনের একজন এক গাল হেসে বলে ফেলল, 'পালাবে, কি বলেন, স্যার! পালানো কি অতই সহজ!'

'যাও।'

গম্ভীর ভাবটা আরও বেশি ফুটিয়ে বড় দারোগা নিজের কাজে মনোনিবেশ করল। কনস্টেবলদ্বয় শফিকের দু'দিক থেকে দুই হাত ধরে বের হয়ে এল থানা থেকে।

থানা থেকে বের হতেই এক দীর্ঘাকৃতি, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ওদের তিনজনের সামনে আবির্ভূত হল। শফিকের চোখের উপর চোখ স্থাপন করে সে ব্যক্তি বলে

উঠল, 'তুমি দোষী, না নির্দোষ?'

'কিন্তু আপনি কে…?'

'দোষী, না, নির্দোষ।'

রহস্যময় ব্যক্তিটি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল নিচু অথচ মোটা কণ্ঠে। শফিক বিশাল একটা শরীর এবং ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র এবং অপ্রতিভ অনুভব করল। কে এই বিশালদেহী?

নিজের অজান্তেই শফিকের গলা থেকে বের হল, 'আমি নির্দোষ।'

'বেশ। বেলা দশটায় দেখা করবে তুমি তোমার বুড়ো বাপের সাথে। যদি সত্যি তুমি নির্দোষ হও তাহলে পুলিস কেন, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি তুমি দোষী হও, তাহলে পৃথিবীর এমন কোন ক্ষমতা নেই যে তোমাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারে বা রক্ষা করতে পারে। আমি তোমাকে খুঁজে পাবই। তখন মিথ্যে কথা বলার শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।'

শফিকের কি যে হল কে জানে। তার ইচ্ছা হতে লাগল বিশালদেহী মানুষটার পায়ের উপর আছড়ে পড়তে পারলে তার জীবন সার্থক হয়ে যাবে। অস্ফুটে আবার বলে উঠল সে, 'আমি নির্দোষ।'

শফিকের কথা শেষ হতেই কনস্টেবল দু'জন হাত দুটো ধরে মৃদু টান দিল। এগিয়ে চলল শফিক। প্রিজন ভ্যানে চড়বার আগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে রহস্যময় মহান ব্যক্তিটিকে আর একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে। কিন্তু শফিক তাকে আর দেখতে পেল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশালদেহী মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গাড়িতে চড়ল শফিক। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। শফিক ভাবছিল বেলা দশটায় বাবার সঙ্গে দেখা করতে বলে গেল আশ্চর্য মানুষটা। কিন্তু কি করে দেখা করবে সে? পুলিসরা তাকে ছাড়বে কেন?

শফিক বিমূঢ় হয়ে গেল কথাটা ভাবতে ভাবতে। এমন সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল প্রিজন ভ্যানটা। গাড়ির দরজা খুলে দেয়া হল। কনস্টেবল দু'জন কোন কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাথে উঠে পড়ল। ফুটপাথ ধরে সিধে হেঁটে চলল তারা। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। শফিক বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখ দু'টোকে। তাকে পাহারা দেবার কথা ভুলে গিয়ে ওরা দু'জন এমন আশ্চর্যভাবে চলে গেল কেন!

শফিকের বিস্ময়ের ভার আরও বাড়িয়ে দিল এবার স্বয়ং ড্রাইভার। প্রিজন ভ্যানের ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে শফিকের কাছে গার্ড বক্সের ভিতর চলে এল সে। শফিক বড়বড় চোখে তাকিয়ে রইল ড্রাইভারের দিকে। ড্রাইভার পিটপিট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'একটা বিড়ি-টিড়ি হোবে নাকি, মিস্টার?'

'বিড়ি!'

হাঁ হয়ে গেল শফিকের মুখ। লোকটা বলে কি!

'ডুশ্চিন্টা কোরো না, ডোস্টো। টোমার হাট দুটো বণ্ডী আছে টো কি হয়েছে, আমি টোমার পকেট থেকে নিকাল লেগা। আছে বিড়ি-টিড়ি?'

'নেই।'

ঢোক গিলে উত্তর দিল শফিক। ড্রাইভারের মুখটা বাঙলার পাঁচ সংখ্যার মত বেঁকে গেল নিরাশায়। পকেট থেকে একটা চাবি বের করে শফিকের হাতের হাতকড়া খুলতে খুলতে বলে উঠল, 'টাটে কিচ্ছু এসে যায় না, নেই টো কি হল—ডোন্ট মাইণ্ড! টা, পার্সোনাল কোশ্চেন টোমাকে করটে পারি কি?'

শফিক কিছু বলার আগেই ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে বসল, 'বউ-টউ আছে বাড়িটে? হামার সাটে পরিচয় করিয়ে ডেবে টুমি টোমার ওয়াইফের সাটে! অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড?'

'আমি বিয়ে করিনি এখনও।'

ড্রাইভার দ্বিতীয় শক্‌টাও হজম করল বাংলার পাঁচ সংখ্যার মত মুখ করে। শফিকের হাতকড়া খুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। ড্রাইভার চলে যাচ্ছে দেখে শফিক বিস্ময় চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করে উঠল, 'তোমরা সব চলে যাচ্ছ যে একে একে? আর আমি?'

ড্রাইভার বাঁকা মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'আমি কি?'

'আমি কি করব এখন?'

ড্রাইভার বলল, 'টুমি যাও।'

'কিন্তু কোথায় যাব? তোমরা আমাকে এখানে…।'

ড্রাইভার শফিককে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, 'কার কাছে এখন টুমি যাবে টা হামি বলে ডিটে পারি, কিন্তু টার সাথে হামার পরিচয় করিয়ে ডিটে হোবে। টবে বলব।'

'দেব। বলো।'

ড্রাইভার শফিকের কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'সিডে টুমি টোমার লাভারের কাছে চলে যাও।'

শফিকের মুখ হাঁ হয়ে গেল। বলল, 'অমন কেউ নেই যে আমার।'

তৃতীয় আঘাতটাও হজম করল ড্রাইভার আগের মতই। তারপর বলল, 'টাহলে টোমার বুড়ো ফাদারের কাছেই যাও আগে।'

শফিক জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তুমি সেই মহান ব্যক্তিটির তরফের লোক বুঝি?'

ড্রাইভার বলে উঠল, 'কার কঠা বলছ টুমি? কুয়াশা? সে আমার ফ্রেণ্ড—বন্ডু।'

কথাটা বলে ড্রাইভার রূপী ডি-কস্টা আর দাঁড়াল না। হন হন করে হাঁটতে

শুরু করল সে ফুটপাথের উপর উঠে গিয়ে।

সাত

সেদিন বেলা সাড়ে দশটার ঘটনা। মি. সিম্পসন নিজের অফিস রুমের বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একমনে কি যেন লিখে চলেছেন। এমন সময় হৈ-হৈ করে চিৎকার করে উঠল দরজার দারোয়ান। ভুরু কুঁচকে চোখ তুললেন মি. সিম্পসন। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন একজন গাট্টাগোট্টা লোক দুটো কাপড়ের পুটুলি দু'হাতে টানতে টানতে তাঁর অফিসে ঢুকে পড়ল। তাঁর দিকে এবং দারোয়ানের দিকে একবারও না তাকিয়ে বের হয়ে গেল অফিস রুম থেকে। দারোয়ান কি করবে ভেবে না পেয়ে ছুটল লোকটার পিছন পিছন। মিনিট দু'য়েক কেটে গেল। দেখা গেল অপরিচিত লুঙ্গি পরা লোকটা একহাতে দারোয়ানের ঘাড়টা বজ্র কঠিনভাবে ধরে অন্য হাতে আর একটা কাপড়ের বোঝা নিয়ে অফিস রুমে ঢুকল। দারোয়ানকে জোর করে মেঝেতে বসিয়ে দিয়ে বোঝাটাও মেঝেতে রাখল সে। তারপর আবার বের হয়ে গেল। এভাবে লোকটা একটার পর একটা মোট অফিসে এনে রাখতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অফিস রুমের ভিতর জায়গা অবশিষ্ট রইল না আর। বিভিন্ন সাইজের বস্তা, গাঁটরি ইত্যাদিতে গুদোম ঘর হয়ে উঠল অফিস রুমটা। মি. সিম্পসন নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিলেন লোকটার সব কাণ্ড। লোকটা আবার চলে গেল শেষ বস্তাটি নামিয়ে রেখে। দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন মি. সিম্পসন আরও কিছু দেখার জন্যে। বস্তাগুলোর মাঝখানে দেখা যাচ্ছে দারোয়ানের মাথাটা। ঘাড়ে হাত বুলোচ্ছে সে।

দরজার সামনে একটু পরই দীর্ঘাকৃতি, স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তির মূর্তি দেখা গেল। তার হাতে একটা অ্যাটাচিকেস শোভা পাচ্ছে। চমকে উঠলেন মি. সিম্পসন। মুহূর্তের জন্যে দম বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করল। বিশালদেহী ব্যক্তি হাসিমুখে রুমের ভিতর ঢুকে আসন গ্রহণ করতে করতে বলে উঠল, 'অনেকদিন পর দেখা হল, খবর ভাল তো, মি. সিম্পসন?'

'ভাল, ভাল বৈকি। তা এসবের মানে কি বুঝলাম না তো, কুয়াশা!'

মি. সিম্পসন নিজের উত্তেজিত ভাবটা গোপন রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কুয়াশা বলল, 'জানেনই তো কাজ ছাড়া কুয়াশার আগমন ঘটে না। নয়াপল্টনের পিছনে একটা বস্তি আছে। বস্তিবাসীরা বড় গরীব। বস্তাগুলোয় শাড়ি, লুঙ্গি, গেঞ্জি, জুতো আছে। আপনার অফিসের বাইরে একটা ট্রাকে আছে কিছু যন্ত্রপাতি। যন্ত্রপাতিগুলো আমার আবিষ্কার। অল্প সামান্য কয়েক টাকার কাঁচা মাল কিনে নানা রকম জিনিস উৎপাদন করা যাবে মেশিনগুলো দিয়ে। ব্যবহার বিধি আর কাঁচা মাল কেনার জন্যে পঞ্চাশ হাজার

টাকা দিয়ে যাচ্ছি আমি আপনাকে। আপনি বিবেচনা মত বস্তিবাসীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেবেন। কাজটা দয়া করে আমার হয়ে করবেন আপনি, আমার অনুরোধ। আমাকে তো স্বহস্তে করতে দেবেন না আপনারা, পিছনে লেগে থাকবেন।'

মি. সিম্পসন টেবিলের উপর একটা ইলেকট্রিক বোতামের মাথায় আঙুল বসিয়ে গোপনে সেটা টেপার উপক্রম করতে করতে প্রশ্ন করলেন, 'তা এত টাকা যে খরচ করছ, টাকাগুলো এসেছে কোথা থেকে তা জানতে পারি কি?'

কুয়াশা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ও কি করছেন, মি. সিম্পসন! ছিঃ ছিঃ, শেষে নিজেই লজ্জায় পড়ে যাবেন যে! বোতাম টিপে পুলিস ফোর্স ডাকছেন কেন? আমাকে গ্রেফতার করবেন? কিন্তু তারপর? আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারবেন কি? পারবেন না। কুয়াশা যা করে, যা করেছে এবং যা করবে সে সবের কোন প্রমাণ থাকে না, নেই, থাকবে না। গ্রেফতার করে স্রেফ প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হবে আমাকে। মানহানির কেস করব আমি তখন। আপনার মত নামী অফিসারের এমন কাঁচা কাজ দেখে লোকে কি বলবে ভাবুন একবার।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মি. সিম্পসনের মুখ। বোতামের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন তিনি। কুয়াশা বলে উঠল, 'আমার আর একটা কাজ আছে। আমি "হ্যাপি কটেজ" হত্যা রহস্য সম্পর্কে কৌতূহলী। এ পর্যন্ত তৈরি করা রিপোর্টগুলো দয়া করে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে দিন আমাকে। ওঃ, একটা কথা। আপনারা নিরপরাধী শফিককে গ্রেফতার করে রেখেছিলেন কেন বলুন তো! আমার বিশ্বাস ও একটা খুনও করেনি। তাই জেল-হাজত থেকে বের করে নিয়েছি ওকে।'

ছানাবড়া হয়ে গেল মি. সিম্পসনের চোখ জোড়া। দ্রুত হাতে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন তিনি রমনা থানায়। খবর জিজ্ঞেস করলেন এবং সত্য খবরও পেলেন। রিসিভারটা ক্রেডলে সশব্দে রেখে দিয়ে মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'তুমি যে একটা ভয়ানক অপরাধ করেছ তা এখুনি স্বীকার করলে। এই অপরাধের জন্যে তো গ্রেফতার করতে পারি তোমাকে, পারি না?'

'না, পারবেন না। প্রমাণ কই? আমি অস্বীকার করলে কিভাবে প্রমাণ করবেন আপনি আমার অপরাধ? যাক, রিপোর্টগুলো কি দেখতে পারি?'

মি. সিম্পসন কোন কথা না বলে 'হ্যাপি কটেজ' কেসের ফাইলটা শেলফ থেকে পেড়ে কুয়াশার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কুয়াশা ফাইলটা উল্টে মনোনিবেশ করল তাতে।

পনেরো মিনিট পর একজন কনস্টেবল অফিসরূমে ঢুকে মি. সিম্পসনকে স্যালুট ঠুকে সসম্মানে নিচু গলায় বলল, 'লালবাগ থানা থেকে "হ্যাপি কটেজ" মার্ডার কেস সম্পর্কে একটা নতুন রিপোর্ট স্যার। দারোগা সাহেব পাঠিয়ে দিলেন।'

দ্রুত একবার কুয়াশার দিকে তাকালেন মি. সিম্পসন। কুয়াশা নিবিষ্ট মনে

ফাইলের দিকে মাথা নিচু করে পড়ে যাচ্ছে রিপোর্টগুলো। কনস্টেবলের হাত থেকে নতুন রিপোর্টটা হস্তগত করে কাগজের নিচে চাপা দিয়ে রাখলেন মি. সিম্পসন। কুয়াশাকে নতুন রিপোর্টটা দেখাবার ইচ্ছা নেই তাঁর।

কনস্টেবলটা চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর মাথা তুলল কুয়াশা। মি. সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'চা না কফি?'

'কফি। ধন্যবাদ।'

বয়কে বলতে বয় কফি দিয়ে গেল দু'কাপ। কফি পান করতে করতে আলাপ চলল। এক সময় কুয়াশা বলল, 'তিনটে হত্যা পর পর হয়ে গেল অথচ কোন কিনারা করতে পারলেন না যে? জামালের হত্যার সময় "হ্যাপি কটেজ"-এর পুরুষ মানুষরা কে কোথায় ছিল এ কথার উত্তরে ওঁদের মধ্যে একজন বড় ভয়ানক একটা মিথ্যে কথা বলেছে। ওই লোকটাই সম্ভবত খুনী।'

'কে? কে খুনী? কে মিথ্যে কথা বলেছে?'

কুয়াশা হাসল মি. সিম্পসনের ব্যগ্রতা দেখে। বলল, 'উত্তেজিত হবেন না। আমাকে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। নিশ্চিতভাবে যখন জানব সেই হত্যাকারী, তখন নামটা জানাব আপনাকে। প্রস্তুত হয়ে থাকবেন, আজকেই কোন সময় হয়ত জানিয়ে দেব কে হত্যাকারী। আচ্ছা, এবার আমাকে উঠতে হচ্ছে।'

অ্যাটাচী কেস থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল এবং ছাপা কতকগুলো কাগজ টেবিলের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা।

মি. সিম্পসন তাকিয়ে রইলেন। অফিসরুম থেকে ধীর ভাবে বের হয়ে গেল কুয়াশার বিশাল দেহটা।

কুয়াশা বিদায় নেবার একটু পরই মি. সিম্পসন পরাজয়ে রাগে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। 'হ্যাপি কটেজ' মার্ডার কেস সম্পর্কে লালবাগ থানা থেকে খানিক আগে যে রিপোর্টটা এসেছিল সেটা লুকিয়ে রেখেছিলেন মি. সিম্পসন। কুয়াশা চলে যাবার পর সেটা তন্নতন্ন করেও খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। রিপোর্টে কি ছিল সেকথা এখনও জানা হয়নি তাঁর। অথচ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে কুয়াশা সেটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে পড়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে এতক্ষণে, একথা বুঝতে পেরে রাগে দিশেহারা না হয়ে উপায় ছিল না মি. সিম্পসনের।

আধঘন্টা গুম মেরে বসে রইলেন তিনি। তারপর লালবাগ থানায় ফোন করলেন। সেখান থেকে জানানো হল শর্ট হ্যাণ্ড রাইটিং থেকে রিপোর্টটা আবার নতুন করে তৈরি করতে কম পক্ষে দু'ঘন্টা সময় লাগবে। স্টেনোটাইপিস্ট হঠাৎ চলে গেছে ছুটি নিয়ে। রিসিভার রেখে দিতেই ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার আবার কানে লাগালেন মি. সিম্পসন, 'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে শহীদের কণ্ঠ শোনা গেল, 'শহীদ স্পিকিং। ব্যস্ত ছিলাম বলে আপনার খবর নিতে পারিনি, মি. সিম্পসন। আপনার সেই "হ্যাপি কটেজ"

মার্ডারের কতদূর?'

মি. সিম্পসন উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন, 'আরে, কেসটার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ওকথা বাদ দাও, কুয়াশার কীর্তি শোনো।'

মি. সিম্পসন কুয়াশার আজকের প্রতিটি অপকর্মের বিশদ বর্ণনা দশ মিনিট ধরে শহীদকে শোনালেন। শহীদ অপর প্রান্ত থেকে বলল, 'কুয়াশার চরিত্রের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। নতুন কিছু বলে তো মনে হচ্ছে না। নিজের কাজ সে এভাবেই সেরে কেটে পড়ে।

'আমি এখন কি করব?'

উত্তেজনায় প্রশ্ন করে উঠলেন মি. সিম্পসন। শহীদ বলল, 'কুয়াশা যখন বলেছে খুনী কে তা সে জানাবে আপনাকে, তখন সে জানাবেই। ধৈর্য ধরে দেখুন আজকের দিনটা। অবশ্য খুনী কে তা না জানলেও আমি অন্তত প্রমাণ করে দিতে পারি যে "হ্যাপি কটেজ"-এর অন্তত দুটো খুন "হ্যাপি কটেজ"-এরই একজনের পক্ষে করা সম্ভব।'

'কিভাবে?' হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন।

শহীদ বলল, 'আমার প্রমাণগুলো এখন প্রকাশ করব না। কুয়াশার সঙ্গে আমারগুলো মিলে যায় কিনা দেখতে চাই আমি। কুয়াশা অবশ্য তার নিজস্ব পদ্ধতিতে খুনীর পরিচয় জানার চেষ্টা করবে। আমি দেখতে চাই, আমি যাকে খুনী বলে বিশ্বাস করি কুয়াশাও তাকে খুনী বলে চিহ্নিত করে কিনা।'

'তোমার বিশ্বাস কুয়াশা খুনীকে চিনতে পারবে?'

শহীদ বলল, 'নিশ্চয় পারবে।'

'তাহলে কুয়াশার খবরের জন্যে অপেক্ষা করব বলতে চাও?'

শহীদ বলল, 'নিশ্চয়। কুয়াশা খবর দিলেই আমাকে জানাবেন। আমিও সঙ্গী হতে চাই আপনার।'

'বেশ। দেখা যাক খবর আসে কিনা।'

শহীদ বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল।

মি. সিম্পসন যখন শহীদের সঙ্গে আলাপে মশগুল তখন ডি-কস্টা ড্রাইভার কাসেম আলীর ঠিকানায় হাজির হয়ে তাকে বিশেষ এক ব্যাপারে রাজি করাবার চেষ্টা করছে। কাসেম আলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগল না ওর। কাসেম আলী স্যানন ডি-কস্টার ধোপ্-দুরস্ত পোশাক এবং ইংরেজি-বাংলা-উর্দু বোলচাল শুনে একেবারে গলে গেল। ডি-কস্টা কাসেম আলীকে নিয়ে 'হ্যাপি কটেজ'-এ এল একটা প্রাইভেট গাড়িতে। দরজায় কড়া নাড়তেই চাকরাণী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ডি-কস্টা তাকে বলল, 'এ বাড়ির বড় জামাই মি. রুহুল আমিনের সাথে বিশেষ আলাপ আছে আমার। আমরা বসতে চাই।' ডি-কস্টাকে

বৈঠকখানায় বসানো হল। ড্রাইভার কাসেম আলী ঢুকল না বাড়িতে। সে দাঁড়িয়ে রইল দরজার বাইরে। একটু পরই বড় জামাই রুহুল আমিন বৈঠকখানায় ঢুকল। ডি-কস্টাকে তার চেনবার কথা নয়। ডি-কস্টা নিজেই পরিচয় দিল নিজের। বলল, 'মি. রুহুল, হাপনি হামাকে চিনটে পারবেন না। হামি একজন বিজনেস ম্যান আছে। নানারকম জিনিস-পট্টর কেনা হামার বিজনেস। সাটারণট ডুস্প্রাপ্য জিনিস-পট্টর কিনে ঠাকি হামি।'

রুহুল আমিন আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু আমার কাছে আসার কারণটা ঠিক...'

'বলটেছি। হামি বিস্বস্ট সূট্রে খবর পেয়েছি যে হাপনার কাছে বহুট পুরাতন ডিনের একটা গুপ্টঢনের নকসা আছে। নকচাটা আফ্রিকার কোন এক ডেশের। সেটা হামি কিনতে চাই, মি. রুহুল। আশা করি হাপনি হামাকে নিরাশ করবেন না।'

রুহুল আমিন বলল, 'তা একটা নকশা আছে বটে। আমার বাবা আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ওটা এনেছিলেন। কিন্তু নকশার খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে?'

ডি-কস্টা বলল, 'অটোকঠা জানটে চাইবেন না। কটো ডামে বেচবেন ওটা, টাই বলুন।'

রুহুল আমিন একটু চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু সেটা তো এখন আমার কাছে নেই। দশ হাজার টাকায় একজনের কাছে বন্ধক দিয়েছি। ওটা বেচে দেবারই ইচ্ছা। কিন্তু...।'

ডি-কস্টা বলল, 'মোট কটো টাকা হলে হাপনি বেচটে পারবেন বলে ঢারণা?'

'এক লাখ টাকার কমে নিশ্চয় নয়। ওর দাম আরও...।'

ডি-কস্টা জিজ্ঞেস করল, 'নকসাটা কোঠায় আছে? কাহার কাছে?'

'সে কথা বলা যাবে না।'

ডি-কস্টা ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করল। কাসেম আলী বের হয়ে গেল। ডি-কস্টা বলল, 'হামি হাপনাকে এক লাখ টাকাই ডেব। ডশ হাজার অ্যাডভান্স করে যাচ্ছি। ওটা ছাড়াইয়া আনবেন। বাকি টাকা পাইবেন নকসা ডেবার সময়। কখন ডিবেন ওটা?'

রুহুল আমিন দ্রুত ভাবছিল। ডি-কস্টা যে বড়লোক তাতে সন্দেহ নেই। এত বড় একটা সুযোগ সে ছাড়বে কিনা ভাবছিল। আফ্রিকায় গিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করা তার ভাগ্যে নেই। নগদ যা আসে তাই লাভ। ডি-কস্টাকে সে বলল, 'রাত দশটার সময় আমি নকশাটা বাড়িতে আনব। আপনি সাড়ে দশটায় আসুন।'

'টাই কঠা রহিল।'

ডি-কস্টা কথা শেষ করেই অ্যাটাচী কেস থেকে দশ হাজার টাকা বের করে

রুহুল আমিনকে দিয়ে বলল, 'রসিদ নেবে না এখন হামি। সব টাকা ডিয়ে নেবে।'

রুহুল আমিন বলল, 'তাই হবে। চা না কফি?'

ডি-কস্টা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মেনি থ্যাঙ্কস। এখন কিছু পান করটেছি না। কাজ হলে সব হোবে। আচ্ছা বিডায়।'

ডি-কস্টা বের হয়ে এল বাড়ি থেকে। সদর দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল ড্রাইভার কাসেম আলী। কাসেম আলী উত্তেজিতভাবে বাড়ির ভিতরে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই যে, ওই লোকটাই ডেমরা রোডে লাশের ভার চাপিয়ে দিয়েছিল আমার ঘাড়ে। খোদার কসম বলছি সাহেব।'

ডি-কস্টা ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ির ভিতর তাকাল। তারপর বলল, 'ঠিক হ্যায়। চলো।'

গাড়িতে উঠে বসল ওরা। ডি-কস্টা পেন্সিল আর কাগজ বের করে একজন মানুষের মুখ এঁকে ফেলল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। কাসেম আলীকে সেটা দেখাতে সে বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'ঠিক ওই লোকটার মতো হয়েছে। ওই লোকটাই সাহেব। খোদার কসম! এখুনি পুলিসে খবর···।'

ডি-কস্টা হেসে ফেলে বলল, 'গাড়ি ছাড়ো, ডোস্টো। হামার বস্‌কে রিপোর্ট ডিটে হবে। পুলিসকে মারো গুলি।'

বকশিশ দিয়ে কাসেম আলীকে নামিয়ে দিল ডি-কস্টা অন্য এক রাস্তায়। তার বস্ লণ্ড্রির এক বিশেষ নম্বর দিয়ে এক ডজন লোককে চারিদিকে পাঠিয়েছে। নম্বরটা যে লণ্ড্রির সেই লণ্ড্রিটা খুঁজে বের করতে হবে। যে খুঁজে পাবে তাকে নগদ একশো টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। নম্বরটা সেও লিখে নিয়েছে।

ডি-কস্টা শহরের লণ্ড্রিগুলোয় খোঁজ নিতে শুরু করল। কপাল ভাল ওর। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই পরিশ্রম সার্থক হল। লণ্ড্রিটা পাওয়া গেল। লণ্ড্রির মালিক জানাল ওই বিশেষ নম্বরে একটা শার্ট ছিল। শার্টটা যে দিয়ে গিয়েছিল সে নিয়ে যায়নি। দু'জনেরই নাম লেখা আছে। নিয়ে গিয়েছিল অন্য একজন। নাম দুটো লিখে নিল ডি-কস্টা। শার্টটা যে দিয়ে গিয়েছিল তার নাম লিখতে ইংরেজির এগারোটা অক্ষর লাগে।

এদিকে মি. সিম্পসন লালবাগ থানা থেকে দুপুরবেলা নতুন রিপোর্টটা নতুন করে আবার পেলেন। পাবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা পড়ে ফেললেন তিনি। রিপোর্টের সার অংশ নিম্নরূপ।

'হ্যাপি কটেজ'-এর ছোট ছেলে জামাল চৌধুরীর বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে থানায় বিশেষ একটি তথ্য জানাবার জন্যে আসে। তথ্যটার যথেষ্ট মূল্য আছে বলে ধারণা তার। তার নাম ইয়াকুব আহমেদ। ইয়াকুব জানায় যে যেদিন জামাল নিহত হয় তার পরদিন ওদের দুই বন্ধুর আফ্রিকায় অভিযান উপলক্ষে রওনা হবার কথা ছিল।

আফ্রিকায় যাবার কথা সে এবং জামাল ছাড়া তৃতীয় কেউ জানত না। পাসপোর্ট ইত্যাদি সব ঠিকঠাক করে রেখেছিল ওরা। টাকা পয়সাও তৈরি ছিল। সব খরচ জামালেরই দেবার কথা। টাকাগুলো জামাল ইয়াকুবের কাছে জমা রাখে। সেই টাকা থানায় জমা দিয়েছে সে। ওদের আফ্রিকায় যাবার একটা বিরাট উদ্দেশ্য ছিল। আফ্রিকার কোন এক দেশের গুপ্তধন উদ্ধারই ছিল ওদের লক্ষ্য। গুপ্তধনের নকশা নাকি জামালের বড় দুলাভাই রুহুল আমিনের কাছে ছিল। জামাল তাই জানায় ইয়াকুবকে। নকশাটা সে কোনদিন দেখেনি। জামালের বিশ্বাস ছিল ওর বড় দুলাভাইয়ের কাছ থেকে যাবার একদিন আগে নকশাটা আদায় করে নিতে পারবে ও। কিন্তু যাবার আগের দিনই নিহত হয় সে। ইয়াকুব এতদিন এই তথ্য কেন জানায়নি এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে—আমাদের আফ্রিকায় যাবার ব্যাপারটা বাধা পাবে বলে কাউকে বলিনি। সেই কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে লোকে সন্দেহ করবে জামালকে বোধহয় আমিই খুন করেছি। তাই এতদিন চুপ করে ছিলাম। কিন্তু জামালের পর একই বাড়ি থেকে আরও দু'জন নিহত হবার পর আমার যুক্তিহীন চিন্তাধারার বদল ঘটে। তাই সব কথা প্রকাশ করতে চাই।

রিপোর্ট পড়ে মি. সিম্পসনের মাথাটা যেন খুলে গেল। কেসটা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বসলেন তিনি। জামাল রুহুল আমিনের কাছ থেকে গুপ্তধনের নকশাটা চেয়েছিল এবং রুহুল আমিন সেটা দিতে চায়নি। জামাল হয়ত ভয় দেখায়। ফলে রুহুল আমিন জামালকে খুন করে। এটুকু কল্পনা করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মি. সিম্পসন। শহীদকে ফোন করে জানালেন তিনি। শহীদ রহস্যময় হাসি হেসে জানাল, 'অপেক্ষা করুন। কুয়াশা খবর দিক আগে।'

আট

সাভারের রোডের পাশে একটা মাঠ। মাঠের মাঝখানে একটা পুরানো বাড়ি। বাড়িটার সামনে সাত-আটটা প্রাইভেট কার দাঁড় করানো। বাড়িটার সামনে বিরাট একটা সিমেন্ট করা চত্বর। গেটে কোন দারোয়ান নেই। চত্বরটা পেরিয়ে গেলে বাড়ির অভ্যন্তরে ঢোকার রাস্তা। সরু একটা গলি চলে গেছে ভিতরে। গলির শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে একটা দরজা। দরজার কাছে গুণ্ডা প্রকৃতির দু'জন লোক প্যান্ট শার্ট পরে সিগারেট টানছে।

রাত ন'টা বেজে দশ।

সাত-আটটা গাড়ির মধ্যে একটি গাড়িতে কলিম বসে আছে। ঘড়ি দেখল সে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল, তারপর স্টার্ট দিল গাড়িটায়। চারতলা বিরাট বাড়িটার চত্বর থেকে ছুটে বের হয়ে গেল কালো মরিসটা।

গাড়ি মাইল খানেক চালাবার পর একটা ডাক্তারখানা দেখতে পেল কলিম।

গাড়ি থেকে নেমে জরুরী ফোন করতে চাইল সে। পয়সা দিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করল। কানেকশন হতেই অপর প্রান্ত থেকে মি. সিম্পসনের অধীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হ্যালো। কুয়াশা বলছ নাকি?'

কলিম বলল, 'আমি কুয়াশার সহচর কলিম বলছি। আপনি আপনাদের দলবল নিয়ে সাভার রোডের "সুন্দর নীড়ে" চলে আসুন। বাড়িটা হাকিম দাওয়াখানার মাইলখানেক আগে। "হ্যাপি কটেজ"-এর প্রকৃত খুনীকে ধরার ইচ্ছে থাকলে আপনি আসবেনই। দাদা আমাকে তাই বলে দিয়েছে। সাদা পোশাক পরিয়ে লোকজন আনবেন।'

কলিম মি. সিম্পসনের জবাবের অপেক্ষা না করেই রিসিভার নামিয়ে রাখল। ডাক্তারখানা থেকে দ্রুত বের হয়ে গাড়িতে চেপে বসল সে। তারপর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিল সেটাকে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকেই—'সুন্দর নীড়'-এর উদ্দেশে।

বিরাট এবং পুরানো বাড়ি 'সুন্দর নীড়'-এর চত্বরে অপেক্ষারত গাড়িগুলোর পাশে আবার ফিরে এল কলিমের কালো মরিসটা। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে বসে রইল সে একইভাবে। পনেরো মিনিটও কাটল না। দেখা গেল একটা ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগেন এবং দুটো জীপ এসে দাঁড়াল অপেক্ষারত গাড়িগুলোর সামনে। ফোক্সওয়াগেনটা শহীদের। শহীদ, মি. সিম্পসন ও কামাল রয়েছে তাতে। বাকি দুটো জীপে মোট বারোজন সাদা পোশাক পরা সশস্ত্র পুলিস। অস্ত্রগুলো ওরা লুকিয়ে রেখেছে।

গাড়ি থেকে কেউ নামল না। মি. সিম্পসন বললেন, 'এবার আমাদের কর্তব্য কি হবে? এখানে আসার পর কি করতে হবে, কাকে গ্রেফতার করতে হবে তা তো কুয়াশার লোক কলিম জানায়নি।'

শহীদ কি যেন চিন্তা করছিল। ও বলে উঠল, 'অপেক্ষা করুন। কুয়াশা বাকিটুকুও বলবে।'

তাই ঠিক হল। অপেক্ষা করতে লাগল ওরা নিঃশব্দে। দেখতে দেখতে কেটে গেল পনেরোটা মিনিট। এমন সময় একটা বেবিট্যাক্সির শব্দ পাওয়া গেল। ট্যাক্সিটা এগিয়ে আসছে এদিকেই। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল ওরা তিনজন। ট্যাক্সিটা ওদের গাড়ির কাছ থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে এসে থামল। ট্যাক্সি থেকে যে নামল তাকে দেখে চমকে উঠলেন মি. সিম্পসন। ফিসফিস করে শহীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'এ যে দেখছি "হ্যাপি কটেজ"-এর মি. রুহুল আমিন। তাহলে এই আসল খুনী, কি বলো!'

শহীদকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ও কোন উত্তর দিল না।

রুহুল আমিন ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সরু গলি পথটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মি. সিম্পসন উত্তেজনায় ছটফট করছেন। এমন সময় আর একটা গাড়ির

শব্দ শোনা গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। গাড়িটা একটা টয়োটা করোনা। এসে থামল অপেক্ষারত গাড়ির অপর প্রান্তে। ঝটপট গাড়ি থেকে নামল দু'জন লোক। মি. সিম্পসন ডি-কস্টা এবং ভাড়াটে ট্যাক্সির ড্রাইভার কাসেম আলীকে চিনতে পারলেন।

কাসেম আলী গাড়ি থেকে নেমেই দ্রুত এগিয়ে চলল সরু গলি পথটা দিয়ে, যে পথে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে রুহুল আমিন গেছে। ডি-কস্টা আবার উঠে বসল গাড়ির ভিতর। চুপচাপ বসে রইল সে ড্রাইভিং সীটে।

সরু গলি পথটার শেষ মাথায় একটা দরজা। এবং দরজাটার কাছে দু'জন পাহারাদার। রুহুল আমিন সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই সসম্মানে লোক দু'জন পথ করে দিয়ে সালাম জানাল। রুহুল আমিন ভিতরে ঢুকতেই দারোয়ান দুটোর সামনে এসে দাঁড়াল কাসেম আলী। সন্দিহান চোখে তাকাল লোক দু'জন কাসেম আলীর দিকে। কাসেম আলী বলল, 'ভিতরে যেতে চাই।'

'পাস আছে?'

ব্যঙ্গাত্মক স্বরে প্রশ্ন করল দারোয়ানদ্বয়ের একজন। কাসেম বলল, 'নেই। তবু যেতে হবে। ভালয় ভালয় যেতে না দিলে তোমাদের দু'জনের কপালেই খারাবি আছে।'

'আজব চিড়িয়া দেখছি হে!'

দু'জন দারোয়ানই তেড়ে এল কাসেম আলীকে মারতে। কাসেম আলী হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে ঝাড়া দিয়ে নিল নিজের শরীরটা। তারপর একজন দারোয়ানের উদ্যত হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলে মোচড় দিতে দিতেই অন্যজনের পেটে একটা লাথি বসিয়ে দিল কায়দা মত। লাথির চোটে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। তার আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না। এদিকে দ্বিতীয় লোকটাও 'মা-বাপ' বলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে হাতের ব্যথায়। কাসেম আলী তার ঘাড়ে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল। কাবু হয়ে গেল সে। এমন সময় দেখা গেল রুহুল আমিন হিংস্রভাবে ঘুসি বাগিয়ে ছুটে আসছে দরজার ওদিক থেকে কাসেম আলীর দিকে। সব লক্ষ্য করেছে সে আড়াল থেকে।

কাসেম আলী রুহুল আমিনের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

এদিকে সরু গলিপথটার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে শহীদ, কামাল এবং মি. সিম্পসন। ওরা দেখল কাসেম আলী রুহুল আমিনের দিকে এক পা এগিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড় দাঁড়িয়ে রইল কাসেম আলী এবং রুহুল আমিন। ওদের দু'জনের কথাও শোনা যাচ্ছে না, মুখও দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ কাসেম আলী রুহুল আমিনকে কাঁধে তুলে নিল। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হল সে দরজার ওপারে।

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'আর দেরি করা যায় না। রহস্যময় ব্যাপারটা জানতেই হচ্ছে এবার। চলো, শহীদ।'

ওরা তিনজন ছুটল সরু গলিপথটা দিয়ে। আহত দারোয়ানের একজন মাথা তুলে ওদের তিনজনকে ছুটে আসতে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তারস্বরে চিৎকার করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে দরজা অতিক্রম করে।

ওরা তিনজন দরজাটা অতিক্রম করতেই বাধার সম্মুখীন হল। আহত দারোয়ানটা চিৎকার করে দলের লোকজন জড়ো করে ফেলেছে। চারজন পেশীবহুল লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। মি. সিম্পসন একমুহূর্তের সময় পেলেন, সেই অল্প সময়েই সজোরে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন।

শহীদ আক্রান্ত হল সবচেয়ে আগে। অতর্কিতে একটা ঘুসি এসে লাগল ওর চোয়ালে। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল ওর। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল ব্যথায়। কিন্তু আন্দাজের উপর নির্ভর করেই প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালিয়ে দিল ও। আক্রমণকারীর নাকে গিয়ে লাগল ঘুসিটা। ধরাশায়ী হল একজন। কামালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দু'জন। শহীদ চোখ মেলে দেখে কামাল একা পারছে না দু'জনের সঙ্গে। এগিয়ে গেল ও লাফ মেরে।

মি. সিম্পসন হাত মুচড়ে ধরে কাবু করে ফেলেছেন বাকি একজনকে। শহীদ পিছন থেকে দু'জন আক্রমণকারীর গর্দানে দুটো কারাতের কোপ বসিয়ে দিল। বিনা বাক্য ব্যয়ে ভূপাতিত হল দু'জনই। কামাল মুক্ত হল। এমন সময় এসে পড়ল সাদা পোশাক পরিহিত বারোজন কনস্টেবল। মি. সিম্পসন, শহীদ, কামাল যে-যার রিভলভার বের করে ফেলেছে। মি. সিম্পসন হাঁপাতে হাঁপাতে আদেশ দিলেন, 'এদের সবাইকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো।'

বেঁধে ফেলার কাজ শুরু হয়ে গেল। ওরা তিনজন এগিয়ে চলল অভ্যন্তরে। সঙ্গে চলল দু'জন কনস্টেবল।

তিনটে পাশাপাশি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখা গেল। মি. সিম্পসন নক্ করলেন সজোরে। একটা দরজা খুলল। চারজন সুবেশী ভদ্রলোক কাঁচু-মাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের ভিতর। দেখা গেল শুকিয়ে গেছে প্রত্যেকের মুখ। ঘরের এক ধারে একটা টেবিল। টেবিলের উপর টাকার তোড়া এবং তাস। ওদের হাতে রিভলভার দেখে চারজন ভদ্রলোকই একপা করে পিছিয়ে গেলেন। মি. সিম্পসন ধমক দিয়ে জানতে চাইলেন, 'কারা আপনারা? জুয়া খেলার আড্ডা নাকি বাড়িটা?'

চারজনই চুপচাপ রইলেন। আবার ধমক লাগালেন মি. সিম্পসন। এবার এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'দেখুন, আমরা অন্যায় করেছি এখানে জুয়া খেলতে এসে। কিন্তু এই বাড়িতে যে আড্ডা বসায় তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

মি. সিম্পসন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনাদের সবাইকে থানায় যেতে হবে। পরে বিবেচনা করা যাবে আপনাদের ব্যাপারে।' কনস্টেবল দু'জন চারজনকে পাহারা দিয়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। বাকি দুটো ঘর থেকেও

মোট ছয়জন ভদ্র জুয়াড়ী আবিষ্কৃত হল। কয়েকজন কনস্টেবল সবাইকে একটা জীপে করে থানার উদ্দেশে নিয়ে চলল।

আরও কয়েকটা ঘর দেখা হল। কিন্তু ড্রাইভার কাসেম আলী এবং রুহুল আমিনের হদিস পাওয়া গেল না কোথাও। দোতলায় উঠে এল ওরা এবার। সবক'টা ঘর দেখা হল। দোতলায় আটজন জুয়াড়ী পাওয়া গেল আরও। তাদেরকে একটা ঘরে অপেক্ষা করতে বললেন মি. সিম্পসন। তিনতলায়ও জুয়াড়ী পাওয়া গেল বারোজন। কিন্তু কাসেম আলী এবং রুহুল আমিনের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ওরা তিনজন উঠে গেল চারতলায়।

চারতলায় একটি মাত্র ঘর। করাঘাত করলেন মি. সিম্পসন। তাতেই খুলে গেল দরজা। বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল। ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল তিনজন উদ্যত রিভলভার হাতে। ঘরের ভিতর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে রুহুল আমিন। তার সামনে একশত টাকার নোটের কয়েকটা তোড়া। ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে আর একজন লোক। লোকটা মারা গেছে কিনা কে জানে। চেনা যাচ্ছে না তাকে। ড্রাইভার কাসেম আলীকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

রুহুল আমিন ওদের দিকে ভাবলেশহীন চোখ তুলে তাকাল। এমন সময় গোলমালের শব্দ শোনা গেল। কে যেন চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে। কামাল বের হয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরই দু'জন কনস্টেবলের হাত থেকে ছাড়িয়ে কলিমকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভিতর ফিরে এল কামাল। মি. সিম্পসন রুহুল আমিনের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে উঠলেন এমন সময়, 'আপনিই তাহলে তিন তিনটে খুন করেছেন?'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল রুহুল আমিন। কোন কথা ফুটল না তার মুখে! কলিম কামালের পাশ থেকে বলে উঠল, 'না, মি. রুহুল আমিন খুনী নন। যে লোকটা উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে সেই-ই আসল খুনী। "হ্যাপি কটেজ"-এর তিনজনকেই নিজের হাতে খুন করেছে ও।'

মি. সিম্পসন কঠিন কণ্ঠে কলিমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তা কি করে জানলে?'

কলিম বলল, 'আমাকে কুয়াশাদা সব বলেছেন।'

'খুনের মোটিভ কি তা জানো?'

কলিম বলল, 'জানি। ওই অজ্ঞান লোকটা এই বাড়িতে অনেকদিন ধরে জুয়ার আড্ডা বসিয়ে ভাল কামাই করে আসছে। কথাটা জানত জামাল চৌধুরী। জামাল চৌধুরীও ওকে ব্ল্যাকমেল করে আসছিল গত দু'বছর ধরে। ওই জ্ঞানহীন লোকটা জামালকে প্রতি সপ্তায় একশো টাকা করে দিতে বাধ্য হত। এই জুয়া খেলার কথা জানতেন মি. রুহুল আমিনও। তিনিও খেলা ধরেন। সব টাকা হেরে গিয়ে কারবার নষ্ট করে ফেলেন তিনি। কিন্তু জুয়া খেলার নেশা ত্যাগ করতে পারেন না। তাই

তাঁর কাছে গুপ্তধনের যে নকশাটি ছিল সেটা বন্ধক রাখেন ওই জ্ঞানহীন লোকটার কাছে দশহাজার টাকায়। জামাল এই কথাটাও জানত। জামালের ইচ্ছা ছিল গুপ্তধন উদ্ধার করবে সে আফ্রিকায় গিয়ে। ওই অজ্ঞান লোকটার কাছে জামাল নকশাটা বিনা পয়সায় দাবি করে। ফলে ওই লোকটা জামালকে খুন করে।'

কলিম দম নিয়ে বলতে থাকে, 'মিসেস চৌধুরীকেও খুন করে ওই অচেতন লোকটা। তবে এই খুনের মোটিভটা ভিন্ন। মিসেস চৌধুরী ওকে সন্দেহ করেছিলেন। তাই খুন হতে হয় তাঁকে। কিন্তু তিনি নিহত হবার আগেই তাঁর বড় ছেলে সালাম চৌধুরীকে সন্দেহের কথাটা বলে যান। মিসেস চৌধুরী ওই অচেতন লোকটাকে একটা রক্ত মাখা শার্ট নিজের হাতে ধুতে দেখেছিলেন যেদিন জামাল নিখোঁজ হয়েছিল সেদিন গভীর রাতে। বড় ছেলে সালাম মায়ের মৃত্যুর পর ওই লোকটার ঘর থেকে একটা লণ্ড্রির রশিদ চুরি করে সেই ধোয়া শার্টটা বাসায় নিয়ে আসে। খুনী তা টের পায়। শার্টটা সে চুরি করে সরিয়ে ফেলে বাড়ি থেকে। সালাম কিন্তু খুনীকে অনুসরণ করতে করতে একদিন এখানে চলে আসে। সেই সুযোগে ওই অচেতন খুনী লোকটা সালাম চৌধুরীকেও হত্যা করে। খুনের সময় সে কোথায় ছিল এ প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যে কথা বলেছে সে। যে ড্রাইভারকে সালাম চৌধুরীর লাশ হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ভার দেয় ও, সেই ড্রাইভার ওকে আজ সকালে চিনতে পারে।'

'কিন্তু খুনীর পরিচয় কি? কে ও?'

মি. সিম্পসনের প্রশ্নের উত্তরে শহীদ মুখ খোলে এবার। ও বলে, 'যে লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে সেই খুনী, মি. সিম্পসন। ও হচ্ছে "হ্যাপি কটেজ"-এর মেজ জামাই। আবদুর রশিদ।'

চমকে উঠলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'কিন্তু জামালের নিহত হবার সময় ও তো সিনেমায় ছিল। টিকিট পর্যন্ত দেখেছি আমরা।'

শহীদ বলল, 'এর রহস্য আছে। সিনেমার টিকিট ঠিকই অ্যাডভান্স কিনেছিল ও। কিন্তু সিনেমা দেখতে যায়নি। তাই ও জানে না সেদিন সেই হলে শো শুরু হয়েও শেষ হতে পারেনি। আধঘন্টার মতো শো দেখাবার পর প্রোজেকশন মেশিন খারাপ হয়ে যায়। অথচ শো দেখে ও বাড়ি ফিরেছিল রাত সাড়ে বারোটায়, এই কথা বলেছিল। ব্যাপারটা আমিও জানতাম না। আজ সকালে খবরের কাগজে সেই সিনেমা হলের তরফ থেকে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। সেদিনের টিকিট কিনেও যাঁরা শো দেখতে পারেননি তাঁদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে পয়সা ফেরত নিয়ে যাবার জন্যে। কয়েকদিন শো দেখানো সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে।'

শহীদ দম নিয়ে আবার শুরু করল, 'ফিরোজার ঘর থেকে ঘুমের ট্যাবলেট মেশানো দুধের গ্লাস মিসেস চৌধুরীর ঘরে কিভাবে গেল তা আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। আবদুর রশিদ শ্যানেল ফাইভ সেন্ট ব্যবহার করত, একথা বুঝতে

বাকি ছিল না। দুটো দুধের গ্লাসেই শ্যানেল ফাইভের গন্ধ পাই আমি। আবদুর রশিদ দুধের গ্লাস বদলাবার সময় রুমাল ব্যবহার করেছিল। রুমালের সেন্ট গ্লাসেও লাগে। দ্বিতীয়ত একটা সিগারেটের টুকরো খুঁজে পাই আমি ফিরোজার ঘর থেকে। সেটা ক্যাপস্টানের টুকরো। ও বাড়িতে ওই সিগারেট একমাত্র আবদুর রশিদই ব্যবহার করত। গ্লাস বদলাবার সময় ফিরোজার ঘরে ভুল করে ফেলে দিয়েছিল সে পোড়া টুকরোটা।'

শহীদ ওর বক্তব্য শেষ করল। মি. সিম্পসন রুহুল আমিনকে প্রশ্ন করলেন, 'আবদুর রশিদ জ্ঞান হারাল কিভাবে?'

রুহুল আমিন বলল, 'আমাকে যে লোকটা এখানে নিয়ে আসে সেই লোকই ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে ওকে।'

'আপনাকে কাসেম আলী এখানে কাঁধে করে নিয়ে আসে কেন?'

রুহুল আমিন বলল, 'আমি ওর সামনে দাঁড়াতেই ও বলল, ' "হ্যাপি কটেজ"-এর সব কটা খুনের খুনীকে ধরে দিতে পারব আমি। তুমি আমার কাঁধে চড়ো।' আমি কিছু বলার আগেই লোকটা কাঁধে তুলে ফেলল আমাকে। কাঁধে করে রশিদের ঘরে নিয়ে আসে আমাকে। রশিদ লোকটাকে দেখে কেন জানি না ভীষণ ভাবে ভয় পেয়ে যায়। লোকটা রশিদকে বলে, 'আমি তোমার সব কথা পুলিসকে জানিয়ে দেব, তবে তোমার সব টাকা আর রুহুল আমিনের গুপ্তধনের নকশাটা আমাকে দিয়ে দিলে কিছু বলব না। রুহুল আমিনকে ধরে এনেছি আমি। নকশাটা ওর, ওর কাছ থেকেই সেটা আদায় করব আমি।'

রশিদ ভয়ে ভয়ে সব টাকা আর নকশাটা দিয়ে দেয় লোকটাকে। লোকটা তখন বলে, 'তোমার অপরাধের কথা সব লিখে দাও আমাকে। আমি মাসে মাসে তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আসব। যতদিন টাকা দেবে ততদিন পুলিস কিছু জানবে না। রশিদ ভয়ে ভয়ে একটা কাগজে সব লেখে। লেখাটা নিয়েই লোকটা হঠাৎ ঘুসি মারে রশিদকে। রশিদ অজ্ঞান হয়ে যায়। লোকটা তখন আমাকে নব্বুই হাজার টাকা দিয়ে নকশাটা নিয়ে জানালা দিয়ে পানির পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যায়। তার পনেরো মিনিট পর আপনারা আসেন।'

রুহুল আমিন তার বক্তব্য শেষ করতেই কলিম বলে, 'এই যে সেই কাগজটা, আবদুর রশিদের স্বীকারোক্তি। লেখাটা লিখিয়ে নেবার জন্যেই কাসেম আলী ব্ল্যাকমেইলিং করার কথা বলেছিল ওকে।'

একটা কাগজ বের করে দিল কলিম। মি. সিম্পসন পড়ে দেখলেন আবদুর রশিদের নাম সই করা চিরকুটটায়। তাতে লেখা, 'আমি জামাল চৌধুরী, মিসেস চৌধুরী এবং সালাম চৌধুরীকে খুন করেছি।'

মি. সিম্পসন কলিমের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে রিভলভার উঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এ কাগজ তুমি পেলে কোথায়?'

'ড্রাইভার কাসেম আলী আপনাকে পৌঁছে দিতে বলেছিল আমাকে এটা। এটা নিয়েই তো আসছিলাম আমি, পুলিস আমাকে ধরে ফেলে...।'

'মাথার উপর হাত তোলো, কুয়াশা! ছদ্মবেশ দারুণ হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু তুমিই তো কুয়াশা তাতে কোন ভুল নেই।'

ভয়ে ভয়ে কলিম মাথার উপর হাত তুলল। তারপর বলল, 'ড্রাইভার কাসেম আরও একটা কাগজ আপনাকে দেবার জন্যে দিয়েছে আমাকে। সেটা আমার বুক পকেটে। কিন্তু আপনি ভুল করছেন, আমি কুয়াশাদার অনুচর কলিম।'

মি. সিম্পসন কিছু বলার আগে শহীদ বলে উঠল, 'আপনার ভুল হচ্ছে, মি. সিম্পসন। কুয়াশা নয়, ও কলিম। কুয়াশা পালিয়েছে। যাকে আমরা ড্রাইভার কাসেম আলী বলে মনে করেছিলাম সে আসলে কাসেম আলীর ছদ্মবেশে কুয়াশা স্বয়ং। আবদুর রশিদকে ভয় দেখাবার জন্যে কাসেমের ছদ্মবেশে এসে নিজের কাজ গুছিয়ে পালিয়ে গেছে কুয়াশা।'

কলিমের পকেট থেকে দ্বিতীয় চিরকুটটা বের করা হল। তাতে লেখা, 'আপনি আমার হয়ে বস্তি এলাকায় সামান্য জিনিস-পত্র বিলি করার ভার নিয়েছেন, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং সে কাজের বদলে আমিও আপনার কাজ করে দিয়ে গেলাম। আবদুর রশিদকে গ্রেফতার করুন। তিনটে খুনের জন্যে ও-ই দায়ী। বিদায়। আবার দেখা হবে অচিরেই। ইতি। কুয়াশা।'

কুয়াশা ৩২

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৭১

এক

বিরাট রুমটায় পা রাখল প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। পিছনে পুলিস ইন্সপেক্টর বোরহান উদ্দিন। পিছন ফিরে তাকাল শহীদ। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ইন্সপেক্টর। দাঁড়িয়ে পড়ল সে খোলা দরজার উপর। ডেস্কের উপর ঝুঁকে একজন ভদ্রলোক তাকালেন শহীদের দিকে। ভদ্রলোকের মুখ পাণ্ডুরবর্ণ। ডেস্কটা ঘরের এক কোণে। মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত রুমটা। ঝকঝক তকতক করছে। কিন্তু শান্তি যে উধাও হয়েছে তা প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। ভদ্রলোকের সঙ্গে, ডেস্কের পাশে ফ্যাকাসে চেহারার একজন মহিলা। ভদ্রলোকের স্ত্রী ইনি। দামী পোশাক পরনে, কিন্তু নিরানন্দ চেহারা।

শহীদ ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অকস্মাৎ ভদ্রমহিলা চিৎকার করে উচ্চারণ করলেন, 'না!'

শহীদ প্রশ্ন করল ভদ্রলোকের দিকে সরাসরি তাকিয়ে, 'আপনিই মি. জামিল হায়দার?'

'হ্যাঁ।'

শহীদ একমুহূর্ত ইতস্তত করে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনার বিরুদ্ধে গোলাম হায়দারকে হত্যা করার চার্জ আছে। এ সম্পর্কে যা বলবেন তা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তাই সতর্ক হবার পরামর্শ দিচ্ছি আমি আপনাকে। কিন্তু, আপাতত আমার প্রথম কাজ হল আপনাকে থানায় নিয়ে যাওয়া।'

মি. জামিল হায়দার নড়াচড়া করলেন না এতটুকু।

মিসেস জামিল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলেন ব্যাকুল স্বরে, 'মিথ্যে কথা! এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা…! পাগল হয়েছেন আপনি! ওকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে দেব না…!'

'আমি দুঃখিত, মিসেস জামিল।'

ফর্মালিটির জন্যে নয়, সত্যিকার অর্থে দুঃখ প্রকাশ করল শহীদ। মিসেস জামিল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কিন্তু ও তো গোলামকে খুন করেনি…!'

মি. জামিল হায়দার অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা দিয়ে স্ত্রীকে প্রায় ধমক মারলেন, 'তুমি চুপ করো, সালমা! ওঁর কর্তব্য পালন করতে এসেছেন উনি। তুমি সবার

কাজে গোলমাল সৃষ্টি করছ শুধু শুধু।'

মিসেস জামিল বলে উঠলেন, 'কিন্তু তুমি অমন ঠাণ্ডা ভাবে কথা বলছ কিভাবে, জামিল! তুমি কি বুঝতে পারছ না খুনের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছেন ওঁরা। তোমাকে···তোমাকে ওঁরা হয়ত ফাঁসিতে চড়াবেন···।'

কেঁদে ফেললেন মিসেস জামিল, থরথর করে কেঁপে উঠলেন। জামিল হায়দার স্ত্রীর মাথায় একটা হাত রেখে বলে উঠলেন, 'আমি গোলামকে খুন করিনি, সুতরাং এ অভিযোগ ওঁরা প্রমাণ করতে পারবেন না। সালমা, তুমি এবার ভিতরে যাও, কেমন? আমরা বেরিয়ে যাবার আগে ওঁর সাথে এখানেই দুটো কথা বলতে চাই।'

শহীদ নিজের পরিচয় দিল এতক্ষণে। মিসেস জামিলকে নিয়ে যাবার জন্যে দুজন চাকরানী ঢুকল। তারা ক্রন্দনরতা ভদ্রমহিলাকে ঘর থেকে নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় মি. জামিল হায়দার বলে উঠলেন, 'রোশনা আজ রাতেই পৌঁছে যাবে এখানে। ও দেখাশোনা করবে তোমার। দুর্ভাবনা করে কষ্ট দিয়ো না নিজেকে।'

মিসেস জামিল রূম ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে মি. জামিল হায়দার শহীদকে বললেন, 'আমার স্ত্রী এ ঘর থেকে চলে যাক তাই চাইছিলাম শুধু। আপনাকে ধন্যবাদ, ফোনে একা থাকতে বলেছিলেন বলে। কিন্তু আমার স্ত্রী কোনমতে একা ছাড়ছিল না আমাকে। সারা জীবন ধরে ওর বিশ্বাস আমাদের জীবনে কোনদিন কোন বিপদ আসবে না। ওর সারা জীবন কেটেছে স্বস্তি, শান্তি আর নির্ভাবনার মধ্যে···।'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন তিনি। শহীদ ডেস্কের উপর তিনটে ছবির দিকে চোখ রেখে বলে উঠল, 'সবরকম উপায়ে আমরা মিসেস জামিলকে সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

মি. জামিল হায়দার বলে উঠলেন, 'সে ব্যাপারে চিন্তিত নই আমি।'

ডেস্কে ছবিগুলোর দিকে শহীদ তাকিয়ে রয়েছে দেখে তিনি বললেন, 'এটা আমার স্ত্রীর আত্মপ্রতিকৃতি, বাকিগুলো···।' হঠাৎ থেমে গেলেন মি. জামিল। বাকি দুটো ছবির মধ্যে একটা একজন যুবকের, অন্যটা একজন যুবতীর। কিন্তু এ সম্পর্কে মি. জামিল আর কিছু বললেন না। একমুহূর্ত পর শুধু বললেন, 'এবার তাহলে আমরা যাব, কেমন?'

রূম ছেড়ে বের হয়ে এল ওরা। কামাল এবং আর একজন পুলিস ইন্সপেক্টর অপেক্ষা করছিল বাইরে। কামাল এবং দ্বিতীয় ইন্সপেক্টর মি. জামিল হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। শহীদ ইন্সপেক্টর বোরহানকে নিয়ে বাড়িটা সার্চ করার জন্যে রয়ে গেল। মি. জামিলকে নিয়ে ওরা চলে যেতে মার্চ মাসের শীতটা যেন ঝাপটে ধরল শহীদকে। সারা বাড়িটায় মিসেস জামিলের দূরাগত ক্রন্দন ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

বাড়িটা বিরাট। প্রতিটি রূম সুরুচি এবং অর্থ সম্পদের সম্যক পরিচয় দেয়।

মি. জামিল রিটায়ার্ড সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট, এবং ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়ী। একের পর এক কামরাগুলো দেখে যেতে লাগল শহীদ। কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে সার্চ করার সময় নেই। দরকারও নেই। মি. জামিলের বিরুদ্ধে প্রমাণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সংগ্রহ করা গেছে। সিঁড়ির মধ্যবর্তী স্থানে একটা ঘর, সেটা খুলে ভিতরে ঢুকল শহীদ। আলো জ্বেলে দেখল এটা একটা বক্সরুম, কিন্তু ডার্করুমের কাজ সারা হয় এটায়, বুঝতে পারল শহীদ। দুটো ক্যামেরা, স্লাইড, ফিল্ম ইত্যাদি যা যা দরকার একজন ভাল ফটোগ্রাফারের, সবই রয়েছে। ইন্সপেক্টর বোরহান উদ্দিনকে দিয়ে বাড়ির এক চাকরানীকে ডেকে আনাল শহীদ। প্রশ্ন করল তাকে, 'তোমাদের কর্ত্রী কেমন আছেন এখন?'

'বড্ড কাঁদছেন বিবি সাহেব। কেমন যেন করছেন, তাই ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি একজনকে।'

শহীদ বলল, 'খুব ভাল করেছ। আচ্ছা, এই ডার্করুমটা কে ব্যবহার করে ফটো তোলার জন্যে?'

'বিবি সাহেব, হুজুর। ওনার খুব শখ কিনা ফটো ওঠাবার। বিবি সাহেব নিজেই ফটো ওঠান, নিজেই কেমন করে জানি না এই ঘরে এসে ছবি হাতে করে বের হন।'

নেগেটিভ থেকে ফটোতে রূপান্তর হবার কায়দা বোধগম্য নয় আধবুড়ী চাকরানীর। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'আর কেউ এই ঘর ব্যবহার করে না?'

'না, হুজুর। বিবি সাহেবের মেয়ে এক-আধবার করত অবশ্যি, বড় সাহেবও...।' হঠাৎ থেমে গিয়ে সে আবার বলে উঠল, 'ওরা কেউ বিশেষ ফটো ওঠায় না। ফটো তোলার পর দেখে শুধু। বড় সাহেব বলে ক্যামেরা নড়ে যায় ওনার হাতে।'

শহীদ বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার বিবি সাহেবের দিকে খেয়াল রেখো। যাও এবার তুমি।'

দু ঘন্টা পর শহীদকে দেখা গেল মি. সিম্পসনের অফিস রুমে একা বসে থাকতে। মি. সিম্পসন কোন কাজে বাইরে গেছেন। শহীদ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যেই। মি. সিম্পসনের টেবিলের উপর একটা ফাইল। ফাইলটার উপর লেখা—'গোলাম হায়দার হত্যা রহস্য।' লেখাটা শহীদের নিজের হাতের। ফাইলটা ও-ই নিজে দিয়ে গেছে আজ বিকেলে মি. সিম্পসনকে। গোলাম হায়দারের খুন সম্পর্কে সকল তথ্য আছে এই ফাইলে। গোলাম হায়দারের লাশ দশদিন আগে কবর থেকে তোলা হয়েছে এবং তার পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে আর্সেনিক বিষ। এসবই শহীদের তথ্যানুসন্ধানের ফল। মি. জামিল হায়দার দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বিধায় পুলিস বিভাগ সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্যে ইনভেস্টিগেশন চালাতে ইতস্ততবোধ করছিল। তাই শহীদকে অনুরোধ করা হয় মি. জামিল

হায়দার সত্যি সত্যি অপরাধী কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। শহীদ যা তথ্য সংগ্রহ করেছে তাতে মি. জামিল হায়দার নিঃসন্দেহে অপরাধী, গোলাম হায়দারকে তিনিই খুন করেছেন বলে প্রমাণিত হয়। গোলাম হায়দার তাঁর ভাইপো। মি. সিম্পসনের পরিচিত এবং বন্ধু বিধায় গ্রেফতার করার সময় তিনি উপস্থিত থাকাটা এড়িয়ে গেছেন।

শহীদ ফাইলটা কাছে টেনে নিয়ে ফিতে খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে। প্রথম প্রমাণ হচ্ছে একটা চিরকুট। গোটা গোটা অক্ষরে চিরকুটটায় লেখাঃ 'গোলাম হায়দারকে খুন করা হয়েছে।'

লালবাগ থানায় একটা পোস্ট অফিসের খামের ভিতর ভরে পাঠানো হয়েছিল চিরকুটটা, তারিখ আছে বটে, তেরোই ফেব্রুয়ারি, কিন্তু সই নেই প্রেরকের। ঢাকা পোস্ট অফিসের ছাপ ছিল, কোন ঠিকানা ছিল না, এবং কোন হাতের ছাপও পাওয়া যায়নি। চিরকুটটা কে পাঠিয়েছে তা এখনও অজ্ঞাত এবং রহস্যময়। এরপর অন্যান্য নামহীন একই ধরনের কয়েকটা চিঠি এবং যে ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিল তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ। এ ছাড়া পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টও রয়েছে।

শহীদকে এসব তথ্যের প্রায় সবগুলোই সরবরাহ করা হয়েছিল পুলিস বিভাগের তরফ থেকে। প্রকৃতপক্ষে শহীদের উপর ভার ছিল পুলিসের সন্দেহের উপর ভিত্তি করে মি. জামিল হায়দারকে গ্রেফতার করা যায় কিনা তা দেখার জন্যে। শহীদ পুলিস বিভাগের প্রদত্ত তথ্যগুলো যাচাই করেছে একবার করে স্বয়ং। তারপর সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, পুলিসের সঙ্গে সে একমত। মি. জামিল হায়দারই তাঁর ভাইপো গোলাম হায়দারকে হত্যা করেছেন। তাঁর ভাইপো গোলাম হায়দার বাজে প্রকৃতির লোক ছিল। গোলাম হায়দার যে তার চাচাকে ব্ল্যাকমেল করছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। ব্ল্যাকমেলের কারণটা বড় নোংরা। মি. জামিল হায়দারের যুবক বয়সের অপরিণামদর্শিতার ফলস্বরূপ একটি অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ব্যাপারটা ঘটে ত্রিশ বছর আগে। কিন্তু সেই অবৈধ জারজ সন্তানের কোন সন্ধান নেই। কেউ তার সন্ধান দিতে পারেনি। এমনকি মি. জামিল চৌধুরীও কিছু জানেন না বলেছেন। ওঁর এই অপরাধের কথা জানতে পারে গোলাম হায়দার। কিভাবে, কোথা থেকে জানে সে তা কেউ বলতে পারেনি। তবে সে তার চাচাকে এ ব্যাপারে ব্ল্যাকমেল করে আসছিল গত পাঁচ বছর ধরে। কিছুদিন আগে থেকে মি. জামিল হায়দার টাকা দিতে অস্বীকার করেন ভাইপোকে। কিন্তু ভাইপো ভয় দেখিয়ে চিঠি পাঠায় যে টাকা না দিলে তার ত্রিশ বছর অতীতের কলঙ্ক খবরের কাগজে ছাপাবার ব্যবস্থা করবে সে। চিঠিপত্র সব দেখেছে শহীদ। মি. জামাল হায়দার কয়েক সপ্তাহ আগে আর্সেনিক বিষ কিনেছেন, এটাও প্রমাণিত। এবং দূরবর্তী একটা হোটেলে দেখা করেছেন ভাইপো গোলাম হায়দারের সঙ্গে। সেখানে তিনি গোলাম

হায়দারের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন একথা প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন শুধুমাত্র জটিলতা বাড়াবার জন্যে। যাই হোক, সেই হোটেলে গোলাম হায়দার ডিনার খাবার পরপরই তার মৃত্যু হয়। উদ্দেশ্য, নিজের দ্বারা তৈরি পরিবেশ এবং আর্সেনিক বিষ সবই মি. জামিলের বিপক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে, এর মধ্যে শহীদ কোথাও কোন ভুল দেখতে পাচ্ছে না। তবু...।

এমন সময় মি. সিম্পসনকে তাঁর অফিস রুমে ঢুকতে দেখা গেল। শহীদকে দেখেই মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'তোমার কাজ শেষ করেছ, মাই বয়?'

'হ্যাঁ, মি. সিম্পসন।'

শহীদ মি. জামিল হায়দারের গ্রেফতারের সকল ঘটনা খুলে বলল। মিসেস জামিলের অসুস্থতার কথাও বাদ দিল না ও। সবশেষে যোগ করল, 'মানুষের দ্বারা যতরকম ভাবে প্রমাণগুলো চেক করা সম্ভব, আমি তা করেছি বলে মনে করি। আর কিছু করার নেই আমার। একটা কথা, মি. জামিলের সেই জারজ সন্তানের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। বিয়ের পর ওঁর তো মাত্র দুটো সন্তান হয়। একজনের নাম শামিম হায়দার, অন্যজন মেয়ে, মিস্ রোশনা হায়দার। শামিমের বয়স সাতাশ, বাপ-মার সাথে ঝগড়া করে আলাদা বাস করে একটা বাড়ি ভাড়া করে। শামিমের সাথে এই খুনের সম্পর্ক নেই। গত দু'বছর ধরে দেখা হয়নি গোলাম হায়দারের সাথে তার। খুনের রাতে সে ছিল তার নিজের বাড়িতে, একথা জানিয়েছে। এবং তার জবানবন্দী মিথ্যে প্রমাণিত করা যায়নি। আর মিস্ রোশনা হায়দার গত তিন মাস ধরে ইরানে আছে। ইরানে যাবার আগে সে-ও আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত, বাপ-মার সাথে বনিবনা হয় না বলে হয়ত। অবশ্য এখনও বিয়ে করেনি। সে আজ পৌঁছুবে ঢাকায়। ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়ও কেউ নেই। এদিকে গোলাম হায়দারের টাকাও ছিল না যে টাকার লোভে কেউ তাকে খুন করবে। হত্যার মোটিভ একমাত্র মি. জামিলেরই পাওয়া যায়। একটি মাত্র ব্যাপারে আমি বড়বেশি অস্বস্তিবোধ করছি, মি. সিম্পসন। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি কর্তৃক পাঠানো ওই চিরকুটগুলোর কথা বলছি। সতর্কভাবে হাতের বা আঙুলের ছাপ মুছে ফেলে পাঠানো হয়েছে ওগুলো। যাই হোক, চিরকুটগুলো প্রমাণ করে অন্য কেউ জানত হত্যাকাণ্ডের রাতে মি. জামিল কোথায় ছিলেন। এবং এটা এও প্রমাণ করে যে মি. জামিলের বিরুদ্ধে এমন কেউ আছে, যে তাঁকে ঘৃণা করে, তাঁর মন্দ চায়। অথচ আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তিই মি. জামিলের মন্দ চায় না।'

মি. সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. জামিলের তরফ থেকে কোর্টে কে যাচ্ছে?'

'মি. কামরুজ্জামান চৌধুরী।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক আছে। তোমাকে ধন্যবাদ, শহীদ। যা করেছ যথার্থ করেছ।'

শহীদ এরপর কফি খেয়ে বিদায় নিল মি. সিম্পসনের অফিস থেকে।

বাড়িতে ফিরে নিচের তলার ড্রয়িংরুমে বসল শহীদ। মনটা খুঁত খুঁত করছে ভীষণভাবে। মি. জামিল হায়দারের বিরুদ্ধে এতগুলো অখণ্ডনীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ও ঠিক মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটিকে। অথচ প্রমাণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। তাই গ্রেফতার না করে উপায় ছিল না।

গফুর গেছে চা তৈরি করতে। মহুয়াকে শহীদ ঘুম থেকে জাগায়নি। রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

একটা শব্দ হল। শহীদ আনমনেই কান পাতল। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যেতে যেতে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শব্দটা সে-জন্যেই হয়েছে। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ। বাইরে গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। অমনি বেজে উঠল কলিং বেলটা। এক মুহূর্ত দেরি করে দরজা খুলল শহীদ। বাতির সুইচ অন করেই এসেছে ও। উজ্জ্বল আলোয় শহীদ দেখল সুন্দরী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে।

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান কি আপনিই?' সুন্দরী যুবতীটি প্রশ্ন করল।

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ।'

যুবতী বলে উঠল, 'আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিলে বাধিত হব। আমার নাম রোশনা, রোশনা হায়দার।'

দুই

ড্রয়িংরুমে নিয়ে এসে বসাল শহীদ মি. জামাল হায়দারের মেয়ে মিস রোশনা হায়দারকে। মিস রোশনাকে নার্ভাস এবং আতঙ্কিত দেখে একটুও অবাক হল না শহীদ। কোন আলাপ শুরু করার আগে শহীদ বলে উঠল, 'আপনি কিছু মনে না করলে আমার স্ত্রীকে একটা কথা বলে আসি?'

'নিশ্চয়।'

শহীদ সোজা উপরতলায় উঠে এল। বেডরুমের দিকে না গিয়ে কিচেনরুমের দিকে এগোল ও। ওর পায়ের শব্দ শুনে গফুর বের হয়ে এল কিচেনরুম থেকে। শহীদকে জিজ্ঞেস করল গফুর, 'দু'কাপ দেব তো, দাদামণি?'

শহীদ গফুরের ব্যায়ামপুষ্ট অস্বাভাবিক চওড়া শরীরটা প্রশংসার চোখে দেখল। সত্যি, আগের চেয়েও ভীষণ হয়ে উঠেছে গফুর দেহগত দিক দিয়ে। ব্যায়াম এবং প্রচুর খাওয়াদাওয়া—এই দুটো ব্যাপার ছাড়া বর্তমানে গফুর আর কিছু করছে না। শহীদ আড়চোখে কিচেনরুমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাজারজাত এত রাতে তোর কাছে এসেছে কেন রে? এলই বা কোন পথে?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নাচের ভঙ্গিতে ছুটে এল একজন রোগা লোক কিচেনরুমের ভিতর থেকে। লোকটা প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তার আগে সশব্দে

স্যালুট করল শহীদকে, 'ঢন্যবাড, ঢন্যবাড, মি. শহীদ খান। রাজার জাটের লোক বলেছেন—ঢন্যবাড।'

শহীদ ধমকে উঠল, 'হয়েছে হয়েছে। এত রাতে এখানে কেন তুমি তাই বলো।'

ডি. কস্টার মুখ শুকিয়ে গেল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে লজ্জিতভাবে। গফুর এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙল, 'দাদামণি, ডি. কস্টা আমার সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে এসেছে, কদিন ধরেই তো রাত করে আসে ও। কেন জানো, দাদামণি? ও নাকি ডিটেকটিভ হবেই, তাই তোমার সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব খবর যোগাড় করতে চায়, তোমাকে ও খুব বড় ডিটেকটিভ বলে মনে করে কিনা…।'

ডি. কস্টা হঠাৎ ঝট করে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল দরজার দিকে। শহীদ বুঝল লজ্জায় পড়ে ডি. কস্টা কেটে পড়ছে। ডাকল ও ডি. কস্টাকে। ডি. কস্টা দাঁড়িয়ে পড়ল সিঁড়ির মুখে। শহীদ বলল, 'একটা জরুরী কাজ করতে পারবে তোমরা দুজন? গোয়েন্দামূলক কাজ।'

জাদুর মত কাজ দিল শহীদের কথাগুলো। তিন লাফে সিঁড়ির কাছ থেকে শহীদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে ডি-কস্টা মাথা-ঘাড় নত করে আনন্দের প্রাবল্যে বলে উঠল রাজ-কর্মচারীদের পুরানো ঢঙে, 'বান্দা হাজির হ্যায়! ফরমাইয়ে জাঁহাপনা!'

গফুর সন্দেহপূর্ণ এবং বিরক্ত দৃষ্টিতে দেখছিল ডি. কস্টাকে। শহীদ ওদের দুজনের উদ্দেশ্যেই বলল, 'বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ওটাকে অনুসরণ করতে হবে। বাড়ির পিছনের গ্যারেজ থেকে ভেসপাটা বের করে গাড়িটাকে অনুসরণ করে যাবে তোমরা। গাড়ির ড্রাইভারকে চেনবার চেষ্টা করবে, এবং যেখানেই যায় গাড়িটা পিছনে পিছনে সেখানেই যেতে হবে. কিন্তু ওরা যেন কিছুই বুঝতে না পারে। এবং গাড়িটাকে চোখের আড়াল না করে আমাকে খবর দিতে হবে ফোনে। গাড়িটা নিশ্চয় কোথাও না কোথাও দাঁড়াবে, খবর দিতে হবে তখনই। পারবে তোমরা?'

ডি. কস্টা বলল, 'নিশ্চয় পারে গা, একশবার, হাজার বার পারিটে হইবে আমাকে। এটা টো হইটেছে হামার লাইফের পেরঠম অ্যাসাইনমেন্ট, লাইফ বরবাদ হইলেও যাইবে, মাগার আনসাকসেস…।'

শহীদ চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'কথা নয় আর। গফুর, দু'কাপ চা নিয়ে ড্রয়িংরুমে আয়। চা দিয়েই পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবি তোরা।'

শহীদ ফিরে এল ড্রয়িংরুমে। গফুর চা দিয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। শহীদ মিস রোশনাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জন্যে কিছু করতে পারি আমি বলুন?'

মিস রোশনা ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার আব্বা গোলামকে খুন করেননি, মি. শহীদ!'

'কিন্তু প্রমাণ সবই তাঁর বিরুদ্ধে। প্রমাণের উপর নির্ভর করে চলতে হয় আমাদেরকে এবং…।'

শহীদের কথা শেষ করতে না দিয়ে মিস রোশনা বলে উঠল, 'সে প্রমাণ অবশ্যই ভুল হতে বাধ্য!'

শহীদ বলল, 'মি. কামরুজ্জামান চৌধুরী দেশের একজন অন্যতম সলিসিটর, আমার কোন সন্দেহ নেই যে তিনি পুলিসের প্রমাণ মিথ্যে প্রতিপন্ন করার জন্যে সব রকম প্রয়াস নেবেন। যদি সত্যি সত্যি মি. জামিল নিরপরাধ হন তাহলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু এ পর্যন্ত যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তা সবই তাঁর বিরুদ্ধে। সত্যি কথা বলতে কি, পুলিস যাকেই সন্দেহ করুক না কেন, আমরা সব সময় চাই, নিরপরাধ কোন মানুষ যেন সাজা না পায়। আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হলেও, এ কেসে পুলিসের তরফ থেকেই কেসটা যাচাই করে দেখেছি।'

মিস রোশনা খানিকক্ষণ শুকনো মুখে বসে থেকে প্রশ্ন করল, 'হিয়ারিং কালকের বদলে অন্য কোন দিনের জন্যে পিছিয়ে দেয়া যায় না?'

শহীদ বলল, 'কোর্টের ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারি না। কোর্টও আমাদের প্রদত্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে। নতুন কোন প্রমাণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। কাল সকাল এগারোটায় হিয়ারিং।'

মিস রোশনা হঠাৎ একটু চড়া গলায় বলে উঠল, 'কিন্তু ভয়ানক একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে আমাদের বাড়িতে, মি. শহীদ। আমার আম্মা অস্বাভাবিক রকম ঘাবড়ে গেছেন। কাল সকালেই যদি প্রথম শুনানী হয় তাহলে কি যে প্রতিক্রিয়া হবে তাঁর, কে জানে। আম্মা বড় নার্ভাস টাইপের, আমি যেন পরিষ্কার অনুভব করছি যে কোন মুহূর্তে আত্মহত্যা করবেন আম্মা।'

শহীদ বলল, 'ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখলে বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মিস রোশনা বলে উঠল, 'আমার ভরসা হয় না। কিন্তু, আমার প্রশ্ন হল আমার আম্মা আত্মহত্যা করলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? আমার বিশ্বাস আম্মা চেষ্টা করবেন।'

শহীদ তীক্ষ্ণ চোখে মিস রোশনার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'সন্দেহ যখন হয়েছে তখন প্রতিক্ষণ চোখে চোখে রাখুন আপনার আম্মাকে। তাহলেই ভয়ের কিছু থাকবে না।'

'আমি সারা রাতের জন্যে একজন নার্সের ব্যবস্থা অবশ্য করেছি। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে আম্মার ভার তার ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। আমি নিজে অবশ্য থাকতে পারতাম আম্মার সাথে। কিন্তু ইরানে যাবার আগে পারিবারিক ব্যাপারে আমার সাথে আম্মার একটা ঝগড়া হয়। সে ঝগড়া এখনও মেটেনি। তাই আম্মার এরকম মানসিক অবস্থায় আমি যদি কাছে থাকি তাহলে সেটা হিতে-বিপরীত হয়ে দেখা দিতে পারে। সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হত আপনি যদি একজন পুলিস বিভাগের

নার্সের ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। মি. শহীদ, আমি নিশ্চিত হতে চাই যে আমাদের বাড়িতে আর কোন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে না। সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত একজন নার্স আম্মাকে রাত দিন চোখের সামনে রাখবে, এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনি?'

আকুল আবেদন ঝরে পড়ল মিস রোশনার শেষ কথাটায়। শহীদ কোন উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'আগামীকাল সকালে হলে চলে কি?'

'না না! আজ রাতেই দরকার—অবশ্যই!'

শহীদ বলল, 'আই সি!'

থানা হেডকোয়ার্টারে ফোন করল শহীদ। কথাবার্তা বলল কয়েক মিনিট। ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে মিস রোশনার দিকে তাকাল সে। মিস রোশনার দু চোখের কোণে পানি দৃষ্টি এড়াল না শহীদের। শহীদ ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই মিস রোশনা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আচ্ছা, ধন্যরাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মি. শহীদ। এবার আমি আসি।'

শহীদ মিস রোশনাকে দরজা অবধি এগিয়ে দেবার জন্যে পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে ও বলল, 'নার্স পৌঁছে যাবে খানিক পরই। একটা কথা মনে রাখবেন, মিস রোশনা। আমি সর্বদা চাই সত্য, সত্য এবং সত্য।'

মিস রোশনা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল। শহীদের কথা যেন ও শুনতে পায়নি। গেটের কাছে এসে একবার ঘুরে তাকাল সে শহীদের দিকে। শহীদ সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল তার চোখে চোখ রেখে, 'সত্যি করে বলুন তো,আপনার আম্মাকে কে হত্যা করবে বলে সন্দেহ করেন আপনি?'

শহীদ দেখল অকস্মাৎ আতঙ্কের রেখায় ভরে উঠল মিস রোশনার মুখ। শহীদের কথার উত্তর না দিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল সে গাড়িটার দিকে। শহীদ তাকাল দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে। গাড়ি থেকে নামছে একজন যুবক। লাইটপোস্টের আলোয় চিনতে পারল শহীদ যুবকটিকে। শামিম হায়দার, মি. জামিলের চরিত্রহীন কুসন্তান।

ভাই-বোন কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। চড়ে বসল গাড়িতে।

রাত একটা। চেস্টারফিল্ড সিগারেটগুলো একটার পর একটা শেষ করছিল শহীদ। টেলিফোনটা বেজে উঠতে একরকম ছোঁ মেরেই রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল ও। বলল, 'শহীদ খান স্পিকিং।'

'মিস্টার স্যানন ডি.কস্টা বলিটেছি হামি। গাড়িটাকে ফলো করিয়া হামরা ইলেভেন নম্বর চাঁন এভিনিউয়ের কাছে ঘাপটি মারিয়া ঠাকি। গাড়িটা এখন ইলেভেন নম্বরের সামনে ডারাইয়া আছে। প্যাসেঞ্জার ডুজন ভিটরে অডৃশ্য হইয়া গেছে। আমার অ্যাসিসট্যান্ট গরিলা গফুর এখন সেখানে প্রেজেন্ট, হামি একটা

ডাক্তারখানা হইটে ডিউটি পালন করিটেছি!'

শহীদ বলল, 'গাড়ি যখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তখন নিশ্চয়ই আবার-বের হবে ওরা। অন্য কোথাও যাবে হয়ত। তোমরা অপেক্ষা করো। আবার অনুসরণ করতে হবে গাড়িটাকে।'

'জো হুকুম, মাই বস্—ঠ্যক্কু, মাই ফ্রেণ্ড!'

মৃদু হেসে শহীদ রিসিভার রেখে দিল। তারপর কি মনে করে থানা হেডকোয়ার্টারে ফোন করল ও। খবর পাওয়া গেল যে নার্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পৌঁছে যাবে মি. জামিল হায়দারের বাড়িতে।

এগারো নম্বর চাঁন এভিনিউয়ে মি. জামিল হায়দারের বাড়ি। শহীদ মনে মনে ধারণা করল শামিম বা মিস রোশনা হায়দার বাপ-মার বাড়িতে রাত কাটাবে বলে মনে হয় না। দেখা যাক।

ফোন এল কুড়ি মিনিট পরই। অপরপ্রান্ত থেকে ডি.কস্টার কণ্ঠস্বর ভেসে এল শহীদ রিসিভার তুলে কানে ঠেকাতেইঃ মি. স্যানন ডি.কস্টা বলিটেছি। ইলেভেন নম্বর চাঁন এভিনিউ হইটে হামরা গাড়িটাকে ফলো করিয়া উপস্থিট হইয়াছি সেভেনটি-ওয়ান নম্বর মিয়া রোডে। সেভেনটি-ওয়ান নম্বরে গাড়িটা ঢুকিয়া গ্যারেজের ভিটর রেস্ট লইটেছে। হামরা, আই মীন, হামার অ্যাসিসট্যান্ট গরিলা গফুর ঘাপটি মারিয়া বাড়িটার উপর চোখ রাখিয়া চলিয়াছে, হামি হামার ডিউটি পালন করিটেছি, একটা···।

শহীদ বাধা দিয়ে বলল, 'আমি এখুনি মিয়া রোডে আসছি। তোমরা অপেক্ষা করো সাবধানে।'

কথাটা বলে ফোন ছেড়ে দিল শহীদ। পরমুহূর্তে আবার বেজে উঠল ফোনটা। রিসিভার কানে তুলল শহীদ। থানা হেডকোয়ার্টার থেকে জানানো হল মিসেস জামিলকে দেখাশোনার জন্যে পুলিস বিভাগীয় নার্স পাঠানো হয়েছে এগারো নম্বর চাঁন এভিনিউয়ে।

শহীদ মিয়া রোডে ঢুকেই গাড়ি থামাল একটা ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলের কাছে। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় নেমে হাঁটতে লাগল ও। একটার পর একটা বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে শহীদ। নিঃশব্দে হাঁটা অসম্ভব এই রাস্তায়। কাঁকর বিছানো চওড়া রাস্তা। তার উপর আলোও নেই। সরু একটা রাস্তাকে হঠাৎ বিরাট বড় করে তৈরি করা হচ্ছে।

আবছা অন্ধকারে একজন মোটাসোটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল শহীদ। এগিয়ে গেল ও পা পা করে, জিজ্ঞেস করল, 'গফুর, কি খবর?'

গফুর সরে এল খানিকটা। চিন্তিতভাবে বলল, 'ওরা বাড়ির ভিতর থেকে আর বের হয়নি, দাদামণি। প্রায় এক ঘন্টা হল এখানে এসেছে ওরা। অথচ তারপর

থেকে কোন সাড়াশব্দ পাইনি ওদের।'

'কেউ দেখা করতে আসেনি? জানালায় ওদের কারও ছায়াও দেখিসনি?'

'না, দাদামণি। ডি. কস্টা বাড়িটার উঠানে লুকিয়ে আছে, নিচু দেয়াল টপকে ঢুকেছে ও, ও-ও কিছু দেখেনি।'

শহীদ বলল, 'আমি ওদের সাথে কথা বলব এখন। ডি-কস্টাকে ফেরত পাঠিয়ে দিস, কিন্তু তোকে হয়ত দরকার হতে পারে।'

কথাটা বলে নিচু পাঁচিল টপকে বাড়িটার উঠানে প্রবেশ করল শহীদ। উঠানটা আলোকিত। ভিতরের রুমগুলোয়ও আলো জ্বলছে। শহীদ উঠান পেরিয়ে দরজার বেল টিপে ধরল।

মিনিট খানেক কাটল। খুলল না দরজা।

আবার বেল টিপল শহীদ। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না এবারও। শহীদ এবার অনেকক্ষণ ধরে একটানা বেল বাজিয়ে চলল। কিন্তু শেষ পর্যন্তও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

শহীদ উঠানের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকল, 'গফুর!'

গফুর একলাফে নিচু পাঁচিলটা টপকে বাড়ির ভিতর ঢুকল। শহীদের সামনে এসে দাঁড়াল ও। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'এ বাড়িতে ঢোকার বা বের হয়ে যাবার আর কোন পথ আছে কিনা জানিস?'

'নেই, দাদামণি। আমি ঘুরে দেখেছি।'

শহীদ চিন্তিতভাবে গফুরের দিকে তাকিয়ে রইল।

মুহূর্তটি অতীব অপ্রত্যাশিত। শহীদ কোন শব্দই শোনেনি, কিন্তু গফুরের দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকাতেই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে বলে মনে হল ওর। পলকের মধ্যে খুলে গেছে দরজাটা। মাথায় হ্যাট পরিহিত, মুখে রুমাল বাঁধা একটা ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল শহীদের উপর। ছায়ামূর্তির,উঁচানো হাতে একটা মারাত্মক অস্ত্র, শহীদ দেখতে পেল একসেকেণ্ডের জন্যে। অস্ত্রটা একটা হাতুড়ি। সরাসরি শহীদের মাথা লক্ষ্য করে হাতুড়িটা চালিয়ে দিল ছায়ামূর্তি। ভাগ্যগুণে মাথায় লাগেনি, হাতুড়িটা প্রচণ্ড বেগে এসে আঘাত করল কাঁধের মাংসে। অসহ্য যন্ত্রণা পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলল শহীদকে। বসে পড়ল ও নিজের অজ্ঞাতেই। দৌড়ুবার শব্দ কানে ঢুকল। টপাস করে একটা আওয়াজ হল। আস্তে আস্তে চোখ মেলল শহীদ। কাঁধটা ম্যাসেজ করতে করতে টলতে টলতে দাঁড়াল ও। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'গফুর!'

গফুর অবোধ্য একটা শব্দ করল উঠান থেকে। শত্রুর হাতুড়ির ঘা খেয়ে ভূপাতিত হয়েছে ওর দশাসই দেহটা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। শহীদ বলল, 'থানা হেডকোয়ার্টারে ফোন করতে হবে, গফুর।'

কাঁধের ব্যথায় মুখ বিকৃত করে কথাটা বলে শহীদ খোলা দরজাটার ভিতর

ঢুকে গেল ধীরে ধীরে।

ভিতরের হলরুমটা আলোকিত। ড্রয়িংরুমটাও। তারপরে পরপর তিনটে রুম, সবকটাই আলোকিত। কিন্তু মিস রোশনা বা জামিল হায়দার নেই কোথাও। উপরতলায় উঠে গেল শহীদ। উপরের প্রায় প্রতিটি রুমই আলোকিত। কোণার একটা রুমে আলো জ্বলছে না। পকেট থেকে রিভলভার বের করে দরজাটা সশব্দে ঠেলে খুলে ফেলল শহীদ। টর্চের বদলে লাইটার জ্বালল ও। দ্বিতীয় কোন শত্রু যদি ওত পেতে বসে থাকে, এই ভয়ে সতর্ক না হয়ে উপায় নেই শহীদের। রুমের সুইচ খুঁজে বাতি জ্বালল ও। কেউ নেই ঘরে। পাশের রুমটাও অন্ধকার। পাশের রুমের দিকে এগোল শহীদ।

রুমটায় ঢুকে সুইচ অন করতেই আলোর বন্যায় ভেসে গেল রুমটা।

মিস্ রোশনা হায়দার একটা আরাম কেদারায় বসে রয়েছে। তার মুখে রুমাল গোঁজা। হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা আষ্টেপৃষ্ঠে। শামিম হায়দার হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে মেঝের এককোণে। মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে তার। শহীদ দেখল শামিম হায়দার একটুও নড়াচড়া করছে না। শামিম হায়দারের মাথার কাছে একটা দরজা খোলা ওয়াল সেফ।

তিন

শহীদ হাঁটু মুড়ে শামিম হায়দারের পাশে বসল। পাল্স্ দেখল ও। বিট হচ্ছে। আঘাতটা কতটা মারাত্মক বোঝা মুশকিল। উঠে দাঁড়িয়ে থানা হেডকোয়ার্টারে একজন ডাক্তারের জন্যে ফোন করল ও। তারপর জুতোয় লুকোনো ছুরিটা বের করে মিস রোশনা হায়দারের দড়ির বাঁধনগুলো খুলে দিল। মুখে গোঁজা রুমালটাও বের করে দিল শহীদ। হাঁপাতে লাগল মিস্ রোশনা জোরে জোরে। চোখমুখে রক্ত উঠে গেছে। পা দুটো সোজা করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। খিল ধরে গেছে। শহীদ বাথরুমের বেসিন থেকে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে এসে মিস্ রোশনার চোখ-মুখ মুছে দিল।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে রয়েছে মিস্ রোশনার। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে। শামিম হায়দারের চোখের পাতা নড়তে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। শহীদের বিশেষ কিছু করার নেই ওর জন্যে। শহীদ ঝুঁকে পড়ল সেফটার দিকে। এটা কমবিনেশন ওয়ালসেফ। প্রায় মেঝের উপর থেকেই তৈরি করা হয়েছে সেফটা। সেফটা খোলা দেখে বোঝা যায় ভাঙাচোরার দরকার পড়েনি, কমবিনেশন নম্বর মিলিয়েই খোলা হয়েছে। হাতলটা দেখে শহীদ ধারণা করল আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না হয়ত। সেফের ভিতরকার ড্রয়ারগুলো টানা হয়েছে। ড্রয়ারের জিনিসপত্র অগোছাল। রুমের একটা টেবিল ওল্টানো।

দোয়াতের কালি পড়ে কার্পেটে মেখে গেছে।

এমন সময় শব্দ পাওয়া গেল জুতোর। শহীদের নাম ধরে ডাকল কেউ। সাড়া দিল শহীদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রুমে প্রবেশ করলেন ডাক্তার। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'হেডকোয়ার্টারে গফুরকে দেখেছেন, ড. মল্লিক?'

'দেখেছি। গুরুতর কিছু নয়। ওর শরীরে ওসব কয়েক মিনিটের জন্যে স্থায়ী হয়। বাড়িতে ফিরে যেতে বলে দিয়েছি ওকে।'

রুমে প্রবেশ করল এবার ইন্সপেক্টর বোরহান উদ্দিন। শহীদ ঘটনাটুকু প্রয়োজন অনুযায়ী বলে আঙুলের ছাপ আবিষ্কারের জন্যে নির্দেশ দিল। বিশেষ নজর দিতে বলল সেফ টেবিল সম্পর্কে। সেফের কাগজপত্রগুলোও সাজাতে নির্দেশ দিল শহীদ। এক নজর দেখে রিপোর্ট দেবার নির্দেশ দিল। মিনিট তিনেক পরেই আর একদল লোক ঢুকল রুমে। ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট, ক্যামেরাম্যান।

ড. মল্লিক শামিম হায়দারকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন, 'আঘাত খুব বেশি মারাত্মক নয়। নার্সের হাতে বাড়িতেই থাকা চলে।'

শহীদ নিচু স্বরে ডাক্তারকে বলল, 'কোন নার্সিং হোমে রাখলে হবে ওকে, পুলিসের লোক সবসময় থাকবে ওর কাছে। ওর অবস্থা সঙ্কটজনক একথা ওকে বোঝালে কাজ আদায় হবে হয়ত।'

ড. মল্লিক হাসলেন। বললেন, 'মৃত্যুশয্যায় আছে মনে করে মুখ খুলতে পারে, এই ধারণা করছেন, কেমন?'

প্রশংসার দৃষ্টি ডাক্তারের চোখে। শহীদের বুদ্ধির উপর তাঁর আস্থা আছে।

শহীদ মিস রোশনাকে ধরে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে বসাল নির্জন অন্য একটা রুমে। আরাম কেদারায় বসিয়ে দিয়ে ও নিজে বসল একটা চেয়ারে। সিগারেট ধরাল একটা। বলল, 'এবার বোধহয় আপনি সব বলবেন?'

'কি...ঠিক কি ঘটেছে তা ভাল করে বলতে পারব না আমি...!'

শহীদ বলল, 'খুব দুর্বল স্মরণ শক্তি। কোথায় ঘটেছিল প্রথম আক্রমণ?'

'অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যে! আজ রাতটা শামিমের এখানে কাটাব ঠিক করে এসেছিলাম। শামিমই দরজা খোলে। প্রথমে ভিতরে ঢুকি আমি। ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে একজন লোক আমার মাথা ঢেকে দেয় একটা চটের থলে দিয়ে। আমার কাঁধ অবধি ঢেকে যায় থলেতে। তারপরই শুনতে পাই শামিমের পড়ে যাবার শব্দ। চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি, কিন্তু মুখ থলে চাপা ছিল বলে সে চিৎকার বেশি দূর যেতে পারেনি। লিভিংরুমে আক্রান্ত হই আমরা। থলে চাপা পড়ে চিৎকার করে ওঠার সাথে সাথে আমাকে লোকটা তুলে নেয় পাঁজাকোলা করে। চেয়ারে বসায় শয়তানটা আমাকে, তারপর শক্ত করে বেঁধে ফেলে। থলেটা তখনও আমার কাঁধ অবধি চাপা ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম শামিমকে শয়তানটা শাসাচ্ছে ওয়াল-সেফের কমবিনেশন নম্বর জানার জন্যে।'

'এবং শামিম নিশ্চয় তাকে নম্বরটা দেয়?'

মিস রোশনা বলে উঠল, 'না দিয়ে উপায় কি! না দিলে প্রাণ যেত। যাই হোক, লোকটা এবার আমার মাথা থেকে থলেটা সরিয়ে নেয়। লোকটার মুখে রুমাল বাঁধা ছিল। চোখের ভুরু অবধি একটা টুপিও পরা ছিল। শুধু চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিলাম শয়তানটার। শয়তানটা এবার আমাকে জেরা করতে শুরু করে। লোকটা সেঁফের ভিতর থেকে কিছু নিতে এসেছিল জোর করে। সে ব্যাপারেই প্রশ্ন করছিল আমাকে।'

'জিনিসগুলো কি? কি নিতে এসেছিল সে?'

মিস্ রোশনা বলল, 'তা আমি জানি না। শয়তানটা শুধু বলছিল—"সেই কাগজগুলো কোথায় বলো!" লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছিল "সেই কাগজগুলো"র কথা যেন আমি ভালভাবে জানি। অথচ সত্যি সত্যি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি।'

শহীদ ভারি কণ্ঠে বলল, 'তারমানে লোকটা রহস্যময় কিছু কাগজপত্র চাইছিল, যা ওয়াল সেফে সে পায়নি, কেমন? এবং কাগজপত্রগুলো সম্পর্কে আপনার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, তাই না? থাকবেই বা কেমন করে, আপনি তিনমাস ধরে বাইরে ছিলেন। কিন্তু মিথ্যে কথা বললে, যদি বলেন, ভুল করবেন মিস রোশনা।'

মিস রোশনা ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, 'আপনি আমাকে অপমান করতে চান?'

শহীদ গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, 'না। স্রেফ সত্য কথা জানতে চাই আমি। কেন আপনারা আক্রান্ত হলেন? এবং কে আপনাদেরকে আক্রমণ করল? মিস রোশনা, আমার সন্দেহ এই কেসের সাথে জড়িত কোন না কোন মানুষ কোন না কোন সত্য চেপে যাচ্ছে। লোকটা দেখতে কেমন ছিল, তাই বলুন।'

'লোকটার গড়ন অনেকটা আপনার মত। কালো ওভারকোট পরে ছিল। গ্লাভস ছিল হাতে, নীল রঙের। কালো জুতো। ডান পায়ের মোজাটা গোড়ালির কাছে ছেঁড়া।'

শহীদ বলল, 'আমি এসে পড়াতে ভালই হয়েছে। কেন এসেছিলাম আমি জানেন? আপনি আজ রাতে আমার বাড়িতে গিয়ে আমাকে কেবল অর্ধ-সত্য বলে এসেছেন কেন তা জানার চেষ্টায়।'

মিস রোশনা উত্তর দিল না। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'শামিমকে কোন্ নার্সিং রুমে পাঠানো হয়েছে?'

শহীদ বলল, 'খোঁজ নিয়ে পরে জানাব আমি।'

একটু ভেবে নিয়ে সিগারেট ফেলে দিল শহীদ। মিস রোশনাকে দেখল খানিকক্ষণ। তারপর বলতে শুরু করল, 'হত্যাকাণ্ড একটা ঘটে গেছে। আপনার আব্বা একাজ করেননি বলে বিশ্বাস আপনার। কিন্তু তার বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ

রয়েছে আমাদের হাতে, ফাঁসি হতে পারে। আপনার আম্মা আক্রান্ত হতে পারেন বলে সন্দেহ। আপনি হয়ত জানেন না কেন এবং কে আপনাদেরকে আক্রমণ করে পালিয়েছে, কিন্তু আপনার আম্মা আক্রান্ত হতে পারেন একথা যখন জানেন তখন নিশ্চয় তার কারণও জানেন আপনি। এখন সময় হয়েছে সেকথা জানাবার। আপনার ভাই যেভাবে আঘাত পেয়েছে তাতে মারা যেতেও পারে হয়ত। আপনি নিজেও নিরাপদে ঠিক নেই। এছাড়াও অনেক ব্যাপার আছে। মিস রোশনা, আপনাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে আসল সত্য একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে, যা রহস্যময়। বলুন তো কি সেই রহস্য?'

মিস্ রোশনা উত্তর দিল না। শহীদ আবার বলতে লাগল, 'আরও হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে, ঘটবে বলেই আমার বিশ্বাস, এবং সেজন্যে দায়ী হবেন আপনিও। এখনও সময় আছে, এখনও বলুন। রহস্যটা যাই হোক, আপনার চাচাত ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এবং তাতে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা দিতে পারে আপনার পিতার জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে।'

মিস রোশনা উত্তর না দিয়ে খোলা দরজার দিকে মুখ ফেরাল। অকস্মাৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর চোখ জোড়া আতঙ্কে। পরমুহূর্তে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল শহীদ। রিভলভারটা বের করে ফেলেছে ও। সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল এক ঝলক আলো এসে পড়ল ওদের দুজনের উপর। পরক্ষণে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কণ্ঠ শোনা গেল একজন লোকেরঃ 'দৈনিক রঙ্গ'-র জন্যে চমৎকার একখানা ছবি হবে! প্রখ্যাত ডিটেকটিভ শহীদ খান জেরা করছে প্রখ্যাত সিভিল সার্ভেন্টের মেয়ে মিস রোশনাকে—সন্দেহবশত!'

শহীদ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ফিরে এসে বসল চেয়ারে। মিস রোশনা দিশেহারার মত ফ্যাল ফ্যাল করে শহীদের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্বাভাবিক চিৎকার করে বলে উঠল, 'অসম্ভব! ছবিটা খবরের কাগজে ছাপা চলবে না।'

শহীদ বলল, 'আপনি আক্রান্ত হয়েছেন এবং খবরের কাগজের লোক খবর পেয়ে সুযোগ মত ফটো তুলে নিয়ে চলে গেছে। ছাপা না ছাপার উপর আপনার কোন হাত নেই, মিস রোশনা।'

মিস রোশনা কেমন যেন আঁতকে উঠল, 'দোহাই আপনার, ছবিটা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন, মি. শহীদ!'

শহীদ বলল, 'খবরের কাগজের লোক কি ছাপবে আর কি ছাপবে না তা আমার নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হবার নয়। একমাত্র অভিযোগ আনা যায়—লোকটা বাড়ির ভিতর অনুমতি না নিয়ে ঢুকেছিল। কিন্তু এইরকম ব্যাপারে এ অভিযোগ টিকবেও না।'

হতাশায় চোখ বন্ধ করল মিস রোশনা। একটু পর ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল,

'আপনি সত্যি কি ওটা না ছাপার ব্যবস্থা করতে পারেন না?'

'না, দুঃখিত। মিস রোশনা, আপনার আম্মাকে কে আক্রমণ করবে বলে সন্দেহ করেন আপনি?'

মিস রোশনা উত্তর দিল না। শহীদ রুমটার একদিকে তাকাল চিন্তিতভাবে। টেবিলের উপর মিস রোশনার ছবি একটা। ঠিক যেমন একটা ছিল মি. জামিল হায়দারের ডেস্কের উপর। তারমানে ওর ভাইও একটা ছবি কাছে রেখেছে। সম্ভবত ওদের মা তুলেছে ছবিটা। ভদ্রমহিলার দারুণ শখ ছবি তোলার। শহীদ উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এগোতে এগোতে বলল, 'আমি আশা করি অত্যধিক দেরি হয়ে যাবার আগেই সব কথা খুলে বলবেন আপনি আমাকে।'

শহীদ ফিরে এল আগের রুমটায়, যেখানে আক্রান্ত হয়েছিল ভাই-বোন একসঙ্গে। রুমের ভিতর কামালকে দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত হল শহীদ। কামাল কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিল পনেরো দিন আগে। কামাল চিন্তিতভাবে এগিয়ে এল শহীদের দিকে। বলল, 'সন্ধ্যার পরই ফিরেছি ঢাকায়। আজ তোর সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিল না। গফুর বাড়ি থেকে ফোন করেছিল। তাই ছুটে এলাম। খবর কি?'

শহীদ বলল, 'পরে শুনিস সব। এখানে কতক্ষণ হল এসেছিস?'

কামাল বলল, 'বেশ খানিকক্ষণ হল। সেফের কাগজপত্রগুলো দেখে ফেলেছি আমি ইতিমধ্যে। হাতের ছাপ দেখা গেছে দু জায়গায়, সম্ভবত শামিম হায়দারেরই। কয়েকদিন আগের আঙ্গুলের ছাপগুলো পরিষ্কার চেনবার উপায় নেই। যে লোকটা সেফ থেকে কাগজপত্রগুলো বের করেছে সে নিঃসন্দেহে গ্লাভস পরে ছিল হাতে। মিস রোশনার মুখে যে রুমালটা পাওয়া গেছে তাতে শামিম হায়দারের মনোগ্রাম রয়েছে। কাগজপত্রগুলো ব্যবসায়িক বা ওই জাতীয়, বিশেষ কোন কাজ দেবে না, আমার বিশ্বাস।'

শহীদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'চমৎকার। তুই এখানে ঢুকেই দেখছি আমার চেয়ে বেশি তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিস।'

কামাল ইন্সপেক্টর বোরহানকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'সব তথ্য তো আসলে এর সাপ্লাই করা, আমি পরিবেশন করলাম।'

শহীদ বলল, 'শোন, তুই এখানেই থেকে যা। বাড়িটার সম্পূর্ণ এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবি কিছু পাওয়া যায় কিনা। সকালে আসব আমি। ইতিমধ্যে নজর রাখবি মিস রোশনার ওপর।'

কামাল হাতে কাজ পেয়ে সানন্দে বলে উঠল, 'ভাল কথা।'

শহীদ বেরিয়ে এল শামিম হায়দারের বাড়ি থেকে। থানা হেডকোয়ার্টারে ফোন করে ও জেনে নিল শামিম হায়দারকে কোন্ নার্সিং হোমে রাখা হয়েছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নার্সিং হোমে উপস্থিত হল ও।

শামিম হায়দারের মাথায় মোটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। শহীদকে দেখে হাসল, কিন্তু অভ্যর্থনাহীন হাসি। জিজ্ঞেস করল, 'আবার কি চান? পুলিস ডিটেকটিভ—এদেরকে আমি দেখতে পারি না। শুধু জেরা জেরা আর জেরা। আমি একটা কথারও উত্তর দিচ্ছি না, মনে রাখবেন। যাক, কি ঘটেছিল বলবেন কি? বাঁচাল কে আমাকে?'

শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'আমি।'

শামিম হায়দার বলে উঠল, 'বাহ্! আমি তাহলে ঋণী হলাম!'

শহীদ বলে উঠল, 'ঋণী না থাকলেও চলবে। আমাকে আগে যা বলেছেন তাছাড়া আর কি জানেন বলুন দেখি? চোর কেন এসেছিল?'

'জানি না, কিছু জানি না। ওসব কথা বাদ দিন, আমি যা চাই তা হল এই যে পুলিস যেন জনসাধারণকে নিরাপদে রাখার আরও ভাল ব্যবস্থা করে। কাজের মধ্যে শুধু নিরপরাধী লোককে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করতে পারেন, আর চোর-ছ্যাঁচড়া এলাহিকাণ্ড ঘটিয়ে চলে যাবার পর যার ক্ষতি হল তাকে বিরক্ত করতে পারেন। শুনুন, আমি শুধু জানি যে আপনি বা আপনারা স্রেফ অকারণে আমার আব্বাকে গ্রেফতার করেছেন। এর বেশি আর কিছু জানি না আমি। আশা করি রোশনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'খবরের কাগজে ফটো ছাপার ব্যাপারে মিস রোশনা অমন আতঙ্কিত কেন বলতে পারেন?'

'ও ওই রকমই। কেউ ওর ফটো তুলুক তা ও চায় না। ছোটবেলা থেকেই।'

'আপনার বাড়ির টেবিলে ওর চমৎকার একটা ছবি দেখেছি আমি।'

'আম্মা তুলেছিলেন ওটা। নিয়মের ব্যতিক্রম আর কি।'

শহীদ কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে চেপে বসল ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগেনে। শহীদ গভীর ভাবনায় ডুবে গেল গাড়ি চালাতে চালাতে। পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ও মিস রোশনা এবং শামিম একটা রহস্যময় ব্যাপার চেপে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। সম্ভবত ওদের চাচাত ভাই গোলাম হায়দারের হত্যা সম্পর্কেই কোন রহস্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ওদের পিতার ফাঁসি হবে একথা জেনেও চেপে রাখবে কথাটা?

ভোর সাড়ে-চারটেয় বাড়িতে ফিরে বিছানায় উঠল শহীদ। মাথার ভিতর কিলবিল করছে নানা দুশ্চিন্তা তখনও।

•

কামাল ইন্টারেস্টিং কিছু কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল থানা হেডকোয়ার্টারে শহীদ চলে যাবার পরই। ইন্সপেক্টর বোরহান বাড়িটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছিল লোকজন লাগিয়ে। কামালও ছিল সঙ্গে। এমন সময় খবর এল মিস রোশনা জীপ নিয়ে বাইরে বের হচ্ছে।

কামাল মিস রোশনাকে অনুসরণ করে 'দৈনিক রঙ্গ'-এর অফিসের বাইরে ভেসপাটা দাঁড় করাল। মিস রোশনা ততক্ষণ অফিসের ভিতরে প্রবেশ করেছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত অফিস কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে পড়ল কামাল। বারান্দায় উঠে কাছে যে জানালাটা পেল সেটার পাশে গিয়ে উঁকি মারল ভিতরে। কামাল দেখল মিস রোশনা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা টেবিলের সামনে। একজন লোক, হাতে তার ক্যামেরা, তাকে বলছে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, 'বলুন, মিস রোশনা।'

মিস রোশনা ব্যগ্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'আপনিই নিশ্চয় আমার ছবি তুলেছেন?'

'তা-ই। খুব চমৎকার উঠেছে কিন্তু। সেজন্যে দায়ী আপনার অপূর্ব সৌন্দর্য।'

মিস রোশনা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'ওটা আমি ফিরে পেতে চাই।'

'অসম্ভব। মাফ করবেন।'

মিস রোশনা পুনরাবৃত্তি করল তার দাবি, 'ওটা আমি চাই।'

ফটোগ্রাফার বলল, 'তা হয় না, মিস রোশনা। এটা আমাদের ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ। ফটো তুলি কাগজে ছাপব বলে। তা কোন ক্ষেত্রেই ফিরিয়ে দেয়া যায় না।'

মিস রোশনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল পলকে, 'ফিরে পেতেই হবে ওটা আমাকে। আপনি বুঝতে পারবেন না···কিন্তু, ফিরে পেতেই হবে ওটা···। টাকা দেব আমি, খুশি হয়ে দেব, যত টাকা চান···!'

অকস্মাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মিস রোশনা।

খানিকক্ষণের নিস্তব্ধতা। ফটোগ্রাফার বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। খানিক পর কি মনে করে সে বলল, 'দেখুন, এই মুহূর্তে আর আমার কিছু করার নেই। ওটার ভার এখন সম্পাদকের হাতে। আমি বড়জোর সম্পাদককে অনুরোধ করতে পারি আপনার সাথে আলাপ করার জন্যে। যদিও তাতে কোন লাভ হবে কিনা বলতে পারছি না আমি।'

মিস রোশনা রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'তা-ই করুন। আমাকে নিয়ে চলুন সম্পাদকের কাছে।'

ফটোগ্রাফার মিস রোশনাকে নিয়ে চলে গেল সম্পাদকের রুমের দিকে। কামাল অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দাতেই।

প্রায় আধঘন্টা পর মিস রোশনার হিল তোলা জুতোর খটখট শব্দ শুনতে পেল কামাল। বারান্দার এক কোণে সরে গেল ও। অফিস রুম থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে এদিকে এগিয়ে যাচ্ছে মিস রোশনা একাই। সম্পাদকের সঙ্গে কোন সমঝোতায় আসতে পেরেছে কিনা বলা মুশকিল—কামাল ভাবল।

মিস রোশনা জীপে চড়ে বসল। ফিরে গেল সে শামিম হায়দারের বাড়িতে।

বেলা দশটায় ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজ মেলে ধরল শহীদ চোখের সামনে।

'দৈনিক রঙ্গ'-তে মিস রোশনার ছবি নেই দেখে রীতিমত আশ্চর্য হল ও। তবে কি কাগজের কোন হোমরা-চোমরাকে ধরে ছবিটা না-ছাপাবার ব্যবস্থা করেছে মেয়েটা?

তাড়াতাড়ি স্নান করে নাস্তা সারল শহীদ। ফোনে কথা বলল কামালের সঙ্গে মিনিট তিনেক। কোর্টে যেতে বলল ও কামালকে। ফোন ছেড়ে দিতেই ঘরে ঢুকল মহুয়া। বলল, 'তোমার পরগাছা এসেছিলেন সকালবেলা।'

মহুয়ার কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল শহীদ পোশাক পরতে পরতে, 'মানে! আমার পরগাছা আবার কে হলেন? চিরজীবন জেনে এসেছি আমিই তোমার পরগাছা।'

'এই শুরু হয়ে গেল মুখরোচক কথাবার্তা। মি. সিম্পসন গো, তোমার পরগাছাই তো ভদ্রলোক। রাজ্যের সমস্যা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে কেমন সরকারী চাকরি করছে নামে মাত্র।'

'ও কথা বোলো না, মহুয়া। মি. সিম্পসনের মত বুদ্ধিমান অফিসার পাকিস্তানে খুব কম আছে। তা কি বললেন মি. সিম্পসন?'

মহুয়া বলল, 'তোমার মুখ থেকে কাল রাতের ঘটনা শুনতে চাইছিলেন। তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে বলে গেলেন কামালের সাথে আলাপ করবেন। আর কাল রাতে কামাল মিয়া যেসব কাগজপত্র থানা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়েছিল সেগুলো দিয়ে গেছেন তোমাকে।'

মহুয়ার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা আর না বলে বেরিয়ে পড়ল ও কোর্টের উদ্দেশে।

কোর্টে গিয়ে শহীদ খবর পেল মি. জামিল চৌধুরীর শুনানির ডেট পড়েছে আগামী সপ্তাহে। কোর্টে উপস্থিত ছিল মিস রোশনা। কামাল তাকে অনুসরণ শুরু করেছে কোর্ট থেকে। সন্দেহজনক কোন লোককে দেখা যায়নি কোর্টে। ইন্সপেক্টর বোরহান খবরগুলো দিল শহীদকে। শহীদ আর অপেক্ষা না করে ফিরে এল বাড়িতে।

মি. সিম্পসনের দিয়ে যাওয়া কাগজপত্রগুলো মনোযোগ সহকারে দেখল শহীদ। ঘন্টা আড়াইয়ের মত সময় লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে। কোন লাভ হল না। সন্দেহজনক বা গোপনীয় কোন কিছুই নেই ওগুলোতে।

মহুয়া ডাকতে এল খাওয়ার জন্যে। আড়াইটা বেজে গেছে। খেতে বসল শহীদ। মহুয়া পরিবেশন করছিল। হঠাৎ অভিমানী কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'কি পেলে বলো তো তুমি! খাওয়ার সময়টাতেও চিন্তা-ভাবনাগুলোকে দূরে রাখতে পারো না?'

শহীদ মহুয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'ঠিক আছে। আগে খেয়ে নেই, তারপর না হয় ভাবব।'

শহীদের কথা শেষ হতেই ঘরের দরজা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা দেহ এসে

দাঁড়াল। মুখ তুলে তাকিয়েই মহুয়া অবাক হয়ে বলে উঠল, 'কি রে, গফুর, তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

'দাদামণি!'

চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল শহীদ! গফুরের গলার এই বিশেষ উত্তেজিত ডাক বহুদিন শোনেনি। গফুর সহজে উত্তেজিত হয় না, হলে অমন কাঁপা গলায় ডেকে ওঠে।

'কি হয়েছে রে?'

গফুর বলে উঠল, 'দাদামণি, কামালদা ফোন করেছে, শুধু বলল–পাঁচ নম্বর, জাহাঙ্গীর রোড, শ্যামলীতে আমি আছি।'

'যা, গাড়ি বের কর তুই।'

খাওয়া ছেড়েই উঠে পড়ল শহীদ হাত ধুয়ে। কামাল এ ধরনের অসমাপ্ত খবর পাঠাবার লোক নয়। নিশ্চয় অসাধারণ কিছু ঘটেছে। শহীদ মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি, কামাল মিস রোশনাকে অনুসরণ করছিল।

তিন মিনিটের মধ্যে গাড়িতে চেপে বসল শহীদ। দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা বাড়ি থেকে। ট্রাফিক পুলিসকে দু'বার জিজ্ঞেস করে নিল ও গাড়ি থামিয়ে, জাহাঙ্গীর রোডের ঠিক কোন দিকটায় বাড়িটা।

পৌঁছে গেল শহীদ জাহাঙ্গীর রোডে অল্প সময়ের মধ্যেই। আশেপাশে সৌখিন ভদ্রলোকদের বাগান সহ বড় বড় বাড়ি। কিন্তু পাঁচ নম্বরে কোন লোকজন বাস করে কিনা সন্দেহ। বড় বড় আকাটা ঘাস বাড়িটার উঠানময়। নিঃসন্দেহে পোড়ো বাড়ি।

কামালকে আশেপাশে দেখতে পেল না শহীদ। ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে বাড়িটা অতিক্রম করে খানিক দূরে গিয়ে থামল শহীদ। রাস্তার একদিকে সবগুলো বাড়ি, অন্যদিকে ঘাস এবং আগাছা। শহীদ গাড়ি থেকে নেমে পাঁচ নম্বরের দিকে এগোল। গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। খোলা গেট। এবং বহুদিন থেকেই খোলা এটা, শহীদ অনুমান করল। বোধহয় বন্ধ করা যায় না আর, বহুদিনের পুরানো। কিন্তু গাড়ির চাকার দাগ দেখল শহীদ, গেট অতিক্রম করে চলে গেছে। সম্প্রতি হয়েছে এই দাগ। পায়ের দাগ নেই কোথাও। কামালের অনুপস্থিতিতে ভীতিবোধ করল শহীদ। উপরতলা নিচেরতলা চোখ বুলিয়ে চলল শহীদ। কিন্তু কামালের ছায়াও দেখা গেল না কোথাও। শহীদ গেট অতিক্রম করল। জানালাগুলোর অস্তিত্ব টের পেল শহীদ, কিন্তু লম্বা লম্বা ঝোপ-ঝাড়ে প্রায় জানালাই ঢাকা পড়েছে। নির্জন মনে হচ্ছে এত বড় বাড়িটা। গ্যারেজের কাছে এসে এদিক ওদিক তাকাল শহীদ। গাড়ি নেই ভিতরে। ও ডাকল উঁচু স্বাভাবিক কণ্ঠে, 'কামাল!'

কোন উত্তর এল না। জানালাগুলোর দিকে তাকাল শহীদ তীক্ষ্ণ চোখে। কারও কোন ছায়ামাত্র নেই। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ও উঠান পেরিয়ে। কলিংবেল

দেখা যাচ্ছে একটা। টিপে ধরল শহীদ। উচ্চরবে বেজে উঠল সেটা। গভীর নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরল বেলের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়বার বেল না বাজিয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। তারপর সম্পূর্ণ বাড়িটা চক্কর মারল একবার। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শহীদ। একটা জানালার পাল্লা খোলা, শহীদ দূর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পেল জোর করে কেউ মোচড় দিয়ে লোহার শিকগুলো বাঁকিয়েছে। শহীদ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারল জানালাটা দিয়ে। ভিতরে তাকিয়ে ও বুঝতে পারল ঘরটা এককালে বাথরুম হিসেবে ব্যবহার করা হত। কেউ নেই ভিতরে। জানালা গলে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল শহীদ। খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করল একটা ঘরে। আসবাবপত্রহীন ঘর। কেউ নেই। এক ধারে দেখা যাচ্ছে একটা খোলা দরজা। কান পাতল শহীদ। না, কোথাও কোন শব্দ নেই। দরজাটার দিকে এগোতে এগোতেই শহীদ একজন মানুষের পা দেখতে পেল। চমকে উঠল ও। হঠাৎ মন্থর হয়ে গেল ওর গতি। ধীরে ধীরে দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। যে-কোন মুহূর্তে একজন আততায়ী আক্রমণ করতে পারে বলে সন্দেহ হচ্ছিল ওর। দরজাটা অতিক্রম করল ও অতি সন্তর্পণে। আর কেউ নেই ঘরে। বিরাট ঘরের ভিতর শুধু উপুড় হয়ে পড়ে আছে কামাল। মাথাটা প্রায় গুঁড়ো হয়ে গেছে ওর। মেঝেতে রক্তের ধারা।

চার

স্থানীয় ভদ্রলোকদের সাহায্যে থানায় এবং হাসপাতালে খবর পাঠাতে বিলম্ব হয়নি শহীদের। অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছুবার আগেই ড. মল্লিক পৌঁছেছেন। কামালকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে এসে তিনি পাণ্ডুর মুখে বললেন, 'শরীর থেকে রক্তক্ষরণ বড় কম হয়নি। এক্সরে প্লেট না দেখে কোন আশা দিতে পারছি না আমি, মি. শহীদ। আপনি ঠিক উপযুক্ত সময়ে পৌঁছেছিলেন বলে ওর মৃত্যু ঘটেনি।'

ড. মল্লিক, মি. সিম্পসন, ইন্সপেক্টর বোরহান গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বড় একটা রুমের ভিতর। বাড়িটা পরখ করে দেখা হয়ে গেছে। কয়েকমাস ধরে এখানে বাস করে না কেউ এটা বোঝা গেছে। শহীদ উপর এবং নিচের তালা পরীক্ষা করেছে। পায়ের ছাপ আবিষ্কার করেছে পুলিস বিভাগীয় এক্সপার্টরা। একজোড়া মহিলার এবং দ্বিতীয় জোড়া পুরুষের। শহীদ বুঝতে পারল কামাল মিস রোশনাকেই অনুসরণ করে এ-বাড়িতে ঢুকেছিল নিঃসন্দেহে। মহিলার পায়ের ছাপ নিশ্চয়ই মিস রোশনার। কিন্তু দ্বিতীয় জোড়া পায়ের ছাপ কামালের নয়। মিস রোশনার সঙ্গে তাহলে কে ছিল? পাশের বাড়ির একজন ছোকরা চাকর জানিয়েছে যে শহীদ পৌঁছুবার কুড়ি মিনিট আগে এ বাড়ি থেকে একটা গাড়িকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। এ ছাড়া আর কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি।

ওরা সকলে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে আছে শহীদের দিকে। কঠোর মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে শহীদের মুখাবয়ব। কামাল তার জীবনের একমাত্র প্রিয় বন্ধু এবং সহকর্মী। কামালকে ছাড়া কোন কথা ভাবতে পারে না ও। সেই কামাল আজ মৃত্যুর দুয়ারে।

লম্বা হাতলওয়ালা একটা হাতুড়ি পড়ে ছিল কামালের চেতনাহীন দেহের পাশেই। ওটা দিয়েই আঘাত করা হয়েছে ওকে। আততায়ী গ্লাভস পরেছিল বলে ছাপ পাওয়া যায়নি। হাতুড়ির মাথায় রক্ত এবং কালো চুল ছিল—কামালের মাথার। শহীদ মি. সিম্পসনের দিকে ফিরে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'যত বেশি সম্ভব লোক লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন, বাড়িটার সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজার জন্যে। হয়ত কিছু একটা পেয়েও যেতে পারি আমরা।'

শহীদের কথা শেষ হতেই একজন কনস্টেবল ছুটে দ্রুত রূমের ভিতর ঢুকল। মি. সিম্পসন গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কি হল?'

কনস্টেবলটি বলল, 'ঘাসের উপর এটা পড়েছিল, স্যার। মনে করলাম খবরটা জানানো দরকার। একটা চুরুট। এখনও একটু একটু গরম স্যার। যদিও নিভে গেছে অনেকক্ষণ আগে।'

হাত বাড়িয়ে সিগারটা নিল শহীদ। তিনভাগের দু ভাগ পোড়া একটা চুরুট। শহীদ বলে উঠল, 'এই তো, এরকমই কিছু একটা খুঁজছিলাম আমি!'

ড্রয়িংরূমে শহীদের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোফায় বসে আছে মহুয়া। শহীদ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। মহুয়া আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে উঠল, 'কেমন আছে কামাল?'

'একই রকম।'

মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল শহীদ। মহুয়ার চোখের কোণে জল। বলে উঠল, 'কি হবে!'

শহীদ উত্তর দেবার আগেই দরজার কাছ থেকে শোনা গেল অসম্ভব ভারি এবং আশ্বাসপূর্ণ একটি কণ্ঠস্বর, 'শহীদ, আমার হাতেই কামালের ভার দাও। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'দাদা!' মহুয়া সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত স্বরে বলে উঠল।

শহীদের মুখাবয়ব উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুহূর্তে। দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ও স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে, 'ভিতরে এসো কুয়াশা।'

অস্বাভাবিক দীর্ঘ এবং বিশাল স্কন্ধধারী কুয়াশা প্রবেশ করল ড্রয়িংরূমে। কালো আলখাল্লার ভিতর থেকে অবিশ্বাস্য শক্তিধর পেশীবহুল শরীরটা ফুটে বেরুচ্ছে। কুয়াশা উজ্জ্বল হাসছে। অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব। রূমে পা দেবার সঙ্গে

সঙ্গে উজ্জ্বল একটা জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ল যেন সর্বত্র। মহুয়া বলে উঠল, 'বসো, দাদা।'

কুয়াশা আসন গ্রহণ করল ধীরে ধীরে। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'কামালের খবর পেলে কোথায় তুমি?'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'তোমাদের প্রতিটি মুহূর্তের খবরই আমি রাখার চেষ্টা করি, শহীদ। এখন সোজা হাসপাতাল থেকে আসছি। ডাক্তাররা শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে—তাদের পক্ষে কামালকে বাঁচানো সম্ভব নয়। আমি ভাবছিলাম—তুমি যদি মনে করো, তাহলে চেষ্টা করে দেখব। জার্মানীর ড. হোগ, ফ্রান্সের ড. সিরাফ্রা, চীনের ড. চ্যা চাং, ব্রিটেনের ড. আব্রাহাম—এরা আমার সাথেই কাজ করছে একটা বিশেষ গবেষণার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে ওরা ওদের সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করতে পারে কামালকে বাঁচাবার জন্যে।'

শহীদ দ্রুত উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে। বলে উঠল, 'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি অনেক কারণের মধ্যে এটার জন্যেও কুয়াশা। কামালকে বাঁচাবার আর কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি। খানিক আগেই ডাক্তার মল্লিক জানিয়ে দিয়েছেন তাঁদের করার আর কিছু বাকি নেই। তোমার সাথে পৃথিবীবিখ্যাত চারজন ডাক্তারী শাস্ত্রের পণ্ডিত যখন রয়েছেন তখন নিশ্চয়ই শেষ চেষ্টা করে দেখা উচিত। আমি সব ব্যবস্থা করছি এখুনি।'

কুয়াশা বলল, 'আমি সব ব্যবস্থা করেই এসেছি। তুমি শুধু ড. মল্লিককে ফোন করে জানিয়ে দাও ব্যাপারটা। হাসপাতালের বাইরে আমার অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। কামালকে তাতে শুধু তুলে দিলেই চলবে।'

শহীদ ফোন করে তখুনি ড. মল্লিককে কথাটা জানিয়ে দিল। মহুয়া স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে চা-এর ব্যবস্থা করতে চলে গেল। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি অ্যাম্বুলেন্স আনিয়েছ নাকি?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ, চারটে অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া চলছিল না। গরীব লোকগুলো কুঁড়েঘরে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকে, কেউ খবর দেবার নেই হাসপাতালে। তাই ওই রকম মরণোন্মুখ রোগী পেলেই অ্যাম্বুলেন্স করে বাড়িতে নিয়ে যাই। বাড়িতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি।'

শহীদ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুয়াশার দিকে। মানুষের প্রতি কি অপরিসীম মমতাবোধ কুয়াশার। ও যা বলল তা হাজার ভাগের এক ভাগও নয়, নিজের কথা বেশি করে বলা কুয়াশার চরিত্রে নেই। কুয়াশা দেশের বৃহত্তম এবং সর্বাধুনিক হাসপাতাল তৈরি করে ফেলেছে নিশ্চয়ই, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই শহীদের। অথচ কথাটা এমন ভাবে জানাল যে তেমন বড় কিছু নয় ব্যাপারটা।

'তোমার বর্তমান কেসে সাহায্য করার কিছু আছে কি আমার?'

শহীদ এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'কেসটার সমস্যা বড়

বিরক্তিকর। কয়েকজনের অসহযোগিতার ফলে জটিল এবং রহস্যময় হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা আগাগোড়া। তবে সামান্য একটা কাজ করার আছে। তুমি ডি. কস্টা আর মান্নানকে একবার পাঠিয়ে দিয়ো।'

কুয়াশা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেব। আচ্ছা, চলি শহীদ। মহুয়াকে বলে দিয়ো ওকে নিরাশ করে চলে যেতে হচ্ছে। কামালকে দেখা দরকার আমার। বুঝিয়ে বোলো, কামালকে যেদিন সুস্থ অবস্থায় দিয়ে যাব সেদিন দুপুরে ওর রান্না খেয়ে যাব।'

'এসো।'

শহীদ বলল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কুয়াশা ধীরে ধীরে এগোল দরজার দিকে। অকস্মাৎ উদ্যত রিভলভার হাতে নিয়ে দরজার সামনে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং মি. সিম্পসন। থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। মি. সিম্পসন উত্তেজিত গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আজ তোমায় নিরস্ত্র অবস্থায় পেয়েছি, কুয়াশা! আজ তোমার সেই ইঁদুর মুখো ডি. কস্টাও নেই যে আমার রিভলভার থেকে গুলি বের করে নেবে। মাথার ওপর হাত তোলো, কুয়াশা। আত্মসমর্পণ না করলে গুলি করব আমি।'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'গুলি যে করবেন সে আমি বুঝতে পারছি। পর পর কয়েকটা কেসের কিনারা করতে না পেরে বেপরোয়া হয়ে আছেন আপনি! কিন্তু কি অপরাধে গ্রেফতার করছেন তা জানতে পারি কি?'

মি. সিম্পসন গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন, 'তোমার অপরাধ কি আঙুলে গোণা যায়? হাজার হাজার অপরাধ করেছ তুমি। হ্যাঁ, হয়ত এই মুহূর্তে আমাদের হাতে প্রমাণ নেই। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তোমাকে গ্রেফতার করা চলে না তা ভেবো না। প্রমাণ ছাড়াই তোমাকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমার আছে। পরে কি হয় দেখা যাবে। কথা নয় আর, আত্মসমর্পণ করো, কুয়াশা।'

কুয়াশা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল হাঃ হাঃ করে। হাসি থামতে বলে উঠল, 'আপনি বড্ড তাড়াহুড়ো করেন বলেই ব্যর্থ হন। ধীর মস্তিষ্কে ভেবে দেখুন দেখি, সত্যি সত্যি গ্রেফতার করতে পারবেন কি আমাকে? আপনারা কি জানেন না যে আমি কখনও কোথাও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে যাই না?'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'আজ তোমার কোন চালাকিই চলবে না, কুয়াশা। প্রাণ গেলেও তোমাকে আজ পালাতে দিচ্ছি না।'

একবিন্দুও নড়ছে না মি. সিম্পসনের হাতের উদ্যত রিভলভার। কুয়াশা হাসল। বলল, 'জানেন তো কোন ব্যাপারেই সীমা অতিক্রম করতে নেই। আপনার উচ্চাশা সীমা লঙ্ঘন করে গেছে। এর ফলে শুধু শুধু সাময়িক টাক সৃষ্টি হবে আপনার মাথায়।'

মি. সিম্পসন একটু বিমূঢ় হয়ে কঠোর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কি বলতে

চাইছ তুমি পরিষ্কার করে বলো!'

কুয়াশা হঠাৎ উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'ভিতরে এসো, গোপী। কর্তব্য পালন করো। কাম ইন গোপী। ডু ইউর ডিউটি।'

মি. সিম্পসন কুয়াশার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠলেন; 'চালাকি খাটবে না আজ, কুয়াশা। আমার মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। আমি…'

মি. সিম্পসন চমকে উঠে থেমে গেলেন। বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল তাঁর চোখের দৃষ্টি। পিছন থেকে কে যেন তাঁর পিঠে একটা শক্ত নল চেপে ধরেছে। নলটা যে রিভলভারের তাতে সন্দেহ হল না তাঁর। কুয়াশা হাসল। বলল, 'রিভলভারটা ফেলে দিন, মি. সিম্পসন। বলা যায় না, আমি অনুমতি না দিলেও গোপী ওর রিভলভারের ট্রিগার টিপে দিতে পারে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মি. সিম্পসন রিভলভারটা ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরে তাকালেন তিনি। এবং পরমুহূর্তে অপ্রত্যাশিত একটা দৃশ্য দেখে আতঙ্কে লাফিয়ে দরজার চৌকাঠ থেকে একেবারে রুমের ভিতর চলে এলেন। কুয়াশা হেসে উঠল হাঃ হাঃ করে। হাসি থামতে সে বলে উঠল, 'গোপীকে গতবার আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসেছি। এতদিন ট্রেনিং নিচ্ছিল ও। আজই প্রথম সঙ্গে করে এনেছি। যে-কোন মানুষের মাথার চুল উড়িয়ে টাক করে দিতে পারে ও গুলি করে, এমন অব্যর্থ লক্ষ্য ওর। আচ্ছা, গুড বাই, মি. সিম্পসন।'

কুয়াশা দরজা অতিক্রম করে গেল। পিছন পিছন চলল আফ্রিকার গহীন জঙ্গলের ভয়ঙ্কর জানোয়ার, ট্রেনিং প্রাপ্ত বিশালদেহী ওরাং ওটাং।

কুয়াশা এবং কুয়াশার বনমানুষ চোখের আড়াল হয়ে যেতেই মি. সিম্পসন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কুড়িয়ে নিলেন রিভলভারটা। তারপর ছুটলেন দরজার দিকে। শহীদ এতক্ষণে কথা বলে উঠল, 'অকারণে দৌড়াদৌড়ি করে লাভ নেই, মি. সিম্পসন। কুয়াশাকে এত সহজে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। কে না চায় কুয়াশাকে গ্রেফতার করতে, আমিও কি চাই না? কিন্তু ছেলেমানুষের মত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে চেষ্টা করলেই তো আর হবে না। আপনি প্রস্তুতি পূর্ণ না করেই কেন চেষ্টা করেন!'

মি. সিম্পসন ধপ করে সোফায় বসে পড়ে বলে উঠলেন, 'কি করে জানব বলো ও আবার একটা বনমানুষ আনিয়ে দেহরক্ষী হিসেবে গড়ে তুলেছে।'

শহীদ বলল, 'না জানারই কথা বটে। কিন্তু একথা অবশ্যই ভুলে গেলে চলে না যে আমাদের কুয়াশা নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে কখনও কোথাও যায় না। ওর ব্যবস্থাগুলো ভালমত জানার পর সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে গ্রেফতার করার চেষ্টা করা উচিত ওকে।'

মি. সিম্পসন গুম মেরে বসে রইলেন মাথা নিচু করে। ব্যর্থতার গ্লানিই শুধু

পেয়ে এলেন তিনি কুয়াশাকে গ্রেফতার করতে গিয়ে। প্রতিবার কোন না কোন উপায়ে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেছে কুয়াশা। আজও সেই পুরানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল কেবল।

বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে থেকে অবশেষে মি. সিম্পসন কাজের কথা শুরু করলেন। শামিম হায়দারের খবর হল এই যে তাকে আরও দু'তিন দিন নার্সিং হোমে থাকতে হবে। গতকাল টেমপারেচার দেখা দিয়েছিল তার। আজ কোর্টে শুনানির পর মিস রোশনা তাকে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই শেষ। তারপর যায়ওনি, ফোনও করেনি। তার আম্মাকেও দেখতে যায়নি সে। শামিম হায়দারের বাড়িতেও না। মি. সিম্পসন ফাইল ঘেঁটে দেখে এসেছেন শামিম হায়দারের বাড়িতে যা যা জিনিস-পত্র দেখা গিয়েছিল সেগুলোর লিস্ট। তার মধ্যে সিগারেট আছে কয়েক রকমের, কিন্তু সিগার নেই। এদিকে মিস রোশনার নিরুদ্দেশের খবর দেশের সকল থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এখনও কোন সন্ধান মেলেনি অবশ্য। জাহাঙ্গীর রোডের সেই পোড়ো বাড়ি থেকে বের হবার পর তার আর কোন সন্ধানই নেই। একথা জোর করে বলা অসম্ভব মিস রোশনা ইচ্ছাকৃতভাবে গেছে না অনিচ্ছাকৃতভাবে। কামাল কথা বলতে পারলে চিন্তা ছিল না। ও নিশ্চয় জানে অনেক কথা। মিস রোশনা সম্ভবত পোড়ো বাড়িটায় গিয়েছিল যে লোকটা কামালকে আঘাত করে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। শামিম হায়দারের গাড়িগুলো তার বাড়ির গ্যারেজে ছিল সর্বক্ষণ। কেউ বলতে পারছে না মিস রোশনা গাড়ি ছাড়া কিভাবে কি করছিল!

শহীদ খবরগুলো শুনল। তারপর চিন্তা করতে লাগল ও। এমন সময় গফুর এসে খবর দিল, 'দাদামণি, কলিম আর ডি. কস্টা এসেছে।'

'নিয়ে আয় ওদেরকে।'

গফুর খানিক পর ডি. কস্টা আর কলিমকে সঙ্গে করে নিয়ে এল রুমের ভিতর। ডি.কস্টা গর্ব্বিত মুখে বুক ফুলিয়ে রুমের ভিতর ঢুকে ভারিক্কি চালে বলে উঠল, 'গুড ইভিনিং, জেন্টেলম্যান! টা কি এমন ডরকার পড়িল, মি. শহীড? হামাকে এমন আর্জেন্ট টলব কেন? নিশ্চয় হামার ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টে স্যাটিসফায়েড হইয়া…!'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, তোমাদেরকে একটা কাজ করতে দেব। সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

শহীদ পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে সেটা খুলল। প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা কয়েকটা সিগার বের হল প্যাকেট থেকে। শহীদ একটা দেখিয়ে বলল, 'এগুলোর নাম Ramonez সিগার। একটা ডাচ ফার্ম এগুলো তৈরি করে। টিন এবং প্যাকেটে করে বিক্রি হয়। সম্ভবত টিনের এজেন্ট একজনই আছে ঢাকায়। এই ব্র্যাণ্ডের সিগার বাজারে বহুদিন থেকে চলছে। আমরা অফিশিয়ালভাবে

এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করব। কিন্তু খুচরো বিক্রেতাদের সাথেও যোগাযোগ করা দরকার, এবং কাজটা খুব কঠিনও। ঢাকায় বহু দোকানদার এই সিগার বিক্রি করে। তাদেরকে খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া দোকানদারদেরকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে কে কে তাদের দোকান থেকে এই সিগার সচরাচর কেনে।'

শহীদ থামতে কলিম জানতে চাইল, 'ঠিক কোন এলাকায় খুঁজতে হবে তার কোন সীমানা নেই?'

শহীদ বলল, 'না। হয়ত ঢাকায় এগুলো কেনাই হয়নি। সেক্ষেত্রে আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। দেশের প্রতিটি জেলায় নমুনা পাঠানো হবে। কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব সন্ধান চাই। তোমরা সবাই এখন থেকে কাজ শুরু করে দাও। আমার ধারণা যে লোকটা কামালকে আঘাত করে পালিয়েছে সে এই সিগার টানত।'

মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে উঠল পরিবেশটা। ছলছল করে উঠল গফুরের চোখ। এমন কি ডি. কস্টারও সারা মুখে বিষণ্ণতার ভাব ফুটে উঠল। শহীদ মি. সিম্পসনকে বলল, 'আপনিও অফিসে গিয়ে নমুনা দেখিয়ে যত বেশি সংখ্যক লোক সম্ভব পাঠিয়ে দিন এদিক-ওদিক।'

কলিম বলে উঠল, 'আচ্ছা, চলি, মি. শহীদ। আশা করি নিরাশ করব না আপনাকে।'

ডি. কস্টা বলে উঠল, 'টাহলে যেটে হয় হামাদেরকে, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া ডরকার। গুডবাই, ফির মিলেঙ্গে হাম লোগ!'

ওরা বিদায় নিল। মি. সিম্পসনও কয়েক মিনিট পর চিন্তিত মুখে উঠলেন।

মি. সিম্পসন বিদায় নেবার পর শহীদ 'দৈনিক রঙ্গ'-র অফিসে গিয়ে উপস্থিত হল। 'দৈনিক রঙ্গ'-র সম্পাদক আশরাফ চৌধুরী একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি। অর্থ এবং প্রতিপত্তি দুই-ই আছে ভদ্রলোকের। শহীদ ভেবে অবাক হচ্ছিল এমন ধরনের লোককে মিস রোশনা রাজি করল কিভাবে ছবিটা না-ছাপাতে!

কিন্তু কেন রাজী হলেন আশরাফ চৌধুরী! এবং মিস রোশনাই বা কেন অমন ভীতিবোধ করছিল ছবিটা ছাপার ব্যাপারে? এটা কি স্রেফ নির্জলা অনিচ্ছা? নাকি এই অনিচ্ছার পিছনে কোন বিরাট কারণ আছে?

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সম্পাদকের রূমে ডাক পড়ল। রূমের ভিতর ঢুকতেই আশরাফ চৌধুরী সহাস্যে বলে উঠলেন, 'কি সৌভাগ্য, আপনার মত গুণীর পদধূলি পড়ল আমার অফিসে! তা কি করতে পারি, মি. শহীদ, আমি আপনার জন্যে?'

শহীদ আসন গ্রহণ করে বলল, 'গতরাতে মিস রোশনা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল, মি. চৌধুরী? একটা নির্দিষ্ট ছবির ব্যাপারে?'

চৌধুরী হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ। মেয়েটির জন্যে দুঃখবোধ হচ্ছিল আমার।

ওকে সাহায্য করতে পেরে খুশিই হয়েছি আমি। ছবিটা না-ছাপবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

'তাই নাকি!'

শহীদ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এমন ভাবে উচ্চারণ করল শব্দ দুটো। চৌধুরী বললেন, 'এ ধরনের অনুরোধ প্রায়ই রক্ষা করতে হয় আমাদেরকে, মি. শহীদ।'

'আচ্ছা, মিস রোশনা তার এই অদ্ভুত অনুরোধের কারণ সম্পর্কে কিছু বলেছিল কি?'

'না। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল মেয়েটা তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর সামান্য একটা অনুরোধ রক্ষা করতে পেরে আমি আনন্দিত।'

শহীদ বলল, 'আই সি! ও শুধু চাইছিল ছবিটা যেন কোনমতেই ছাপা না হয়?'

'হ্যাঁ। আর একটা ব্যাপার, মিস রোশনা যেন আশা করছিল আমি কিছু তথ্য দেব ওকে। বুঝতে পারলাম না কি তথ্য চায় ও আমার কাছ থেকে। সেজন্যেই অনেক সময় কথা বলে কাটিয়ে গিয়েছিল ও।'

শহীদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। আবার যদি মিস রোশনা আপনার সাথে দেখা করতে…।'

আশরাফ চৌধুরী কথা দিলেন, 'আমি জানাব আপনাকে।'

শহীদ বাইরে বের হয়ে একটা পাবলিক বুদ থেকে ফোন করল মি. সিম্পসনের অফিসে। না, মিস রোশনার কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি কোথাও।

বাড়ি ফিরে এল শহীদ।

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে পরদিন অবধি ঢাকায় Ramonez সিগার বিক্রেতারা তালিকাভুক্ত হল। পরদিন সন্ধ্যার পর থেকে তালিকাভুক্ত হল দোকানদারদের রেগুলার সিগার খরিদ্দাররা। প্রায় পঞ্চাশজন খরিদ্দার পাওয়া গেল, যারা নির্দিষ্ট কয়েকটি দোকান থেকে নিয়মিত Ramonez সিগার কেনে। এইসব খরিদ্দারদের সম্পর্কে খোঁজ নেয়া হল। মিস রোশনা যেদিন যে সময় অদৃশ্য হয়েছে সেদিন সে সময় এরা কে কোথায় ছিল তার খোঁজখবর সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

মিস রোশনার কোন সন্ধানই নেই কোথাও।

তিনটে খবরের কাগজ মিস রোশনার নিরুদ্দেশের খবর ছেপেছে ছবিসহ। কিন্তু দৈনিক রঙ্গ-'র ফটোগ্রাফার যে বিশেষ ছবিটা তুলেছিল সেটা প্রকাশিত

হয়নি।

কামাল যুদ্ধ করে চলেছে মৃত্যুর সঙ্গে। এখনও অচেতন। কুয়াশা দিনে কয়েকবার ফোন করে আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছে মহুয়া আর শহীদকে। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই কামালের। মিসেস জামিল হায়দারকে যে পুলিস বিভাগীয় নার্স পাহারা দিচ্ছে তার কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। শামিম হায়দারের বাড়ি খালি পড়ে আছে। শামিম হায়দার নার্সিং হোম থেকে সম্ভবত আগামীকাল ছাড়া পাবে।

শহীদ নিজের বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে সিগারেট টানছিল একটার পর একটা। মহুয়া জানে কখন শহীদকে বিরক্ত করা উচিত নয়। শহীদ যখন গভীর কিছু চিন্তা করে তখন সে কাছে বড় একটা আসে না। পাশের বাড়িতে বেড়াতে গেছে সে লীনাকে নিয়ে। গফুরকে সঙ্গে নিয়ে ডি. কস্টা গেছে কোথায় যেন। ওরা দু'জন ক্রমশ বন্ধু হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা বেমানান। একজন যেন ছোটখাট একটা পাহাড়, অন্যজন ঠিক তার সামনে সরু পাটখড়ি একটা।

আর একটা সিগারেট ধরাল শহীদ। এমন সময় বেজে উঠল কলিং বেলটা। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ। ড্রয়িংরুম থেকে বের হয়ে এল ও। দ্বিতীয়বার বেজে উঠল বেল। অধৈর্য কোন লোক ডাকছে, ভাবছে শহীদ। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আর একবার বাজল বেল। শহীদ খুলে দিল দরজা।

'মি. শহীদ?'

শহীদ উত্তর দিল, 'ইয়েস।'

ভদ্রলোক বিদেশী, তবে ইউরোপিয়ান নয়। মধ্য প্রাচ্যের কোন দেশের হবে সম্ভবত। ইংরেজিতে বলে উঠল ভদ্রলোক, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হতে পারছি। আমার নাম মোহাম্মদ আমান গাজী। ইরাক থেকে আসছি আমি।'

শহীদের মনে পড়ল মিস রোশনা তিন মাসের জন্যে ইরাক গিয়েছিল। করমর্দন সারতে সারতে দেখল শহীদ, শক্ত-সমর্থ কিন্তু একহারা গড়ন আমান গাজীর। উজ্জ্বল, ঝকঝকে দাঁত। দামী স্যুট পরনে। সাবলীল, সপ্রতিভ ভঙ্গি চোখে মুখে। খানিকটা উত্তেজিত। আমান গাজী বলে উঠল, 'বহু লোক আমাকে জানিয়েছেন যে আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রোশনাকে খুঁজে বের করে দিতে পারেন।'

একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। শহীদ রাস্তার দিকে তাকাল। আমান গাজীর কালো মরিসটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার ডান দিক থেকে একটা টয়োটা আসছে মন্থর গতিতে। শহীদ বলল, 'আসুন, ভিতরে বসে আলাপ করা যাক।'

একপাশে সরে দাঁড়াল শহীদ আমান গাজীকে পথ করে দেবার জন্যে। ঠিক তখুনি ফায়ারিঙের শব্দটা হল। চোখ তুলে প্রথম ফায়ারিঙের আলোর ঝলকটা

দেখতে পেল না শহীদ। দ্বিতীয়টার দেখতে পেল। দ্বিতীয় গুলিটা এসে লাগল দরজার পাশে, দেয়াল থেকে প্লাসটার খসে পড়ল।

শহীদ দেখল ডান দিক থেকে যে টয়োটা আসছিল সেটার পিছন দিক থেকে ফায়ার করেছে একজন লোক। লোকটাকে ভাল মত দেখতে পেল না ও। দ্রুত বেগে পালাচ্ছে গাড়িটা।

আমান গাজীকে পাশ কাটিয়ে ছুটল শহীদ। আমান গাজীও ছুটল। কয়েক লাফে এগিয়ে গিয়ে আমান গাজীর মরিসটায় চেপে বসল শহীদ। ব্যাক সীটে উঠল আমান গাজী। তীব্র একটা ঝাঁকানি দিয়ে ছুটতে শুরু করল মরিস।

গুলশান রোড চওড়া এবং লম্বা। গুলি করে গাড়িটা পালাচ্ছিল উঁচু মাটির ঢিবিটার দিকে। গাড়ি চালাতে চালাতে পলায়নরত টয়োটার পিছনে লাল আলোর টুকরো দুটো দেখতে পাচ্ছিল শহীদ। টয়োটা মোড় নিল বাঁ দিকে। ওদিকেও ঢিবি আছে।

গতি না কমিয়েই মোড় নিল শহীদ। রাস্তায় চাকার ঘষা লেগে তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল। আমান গাজী গাড়ির বিপরীত কোণে গিয়ে ধাক্কা খেল। মোড় নিতে আবার দেখা যাচ্ছে টয়োটার লাল আলো। বাঁ দিকে কয়েকটা মোড় আছে এ এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবার। টয়োটার ড্রাইভার যদি রাস্তাগুলো ভাল করে চেনে তাহলে ঠিক পালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সোজাই এগিয়ে যাচ্ছে টয়োটা এখনও।

অকস্মাৎ বাতাসের তীব্র আঘাত লাগল শহীদের মুখের পাশে। চিৎকার করে উঠল ও, 'কি হল…!'

আমান গাজী উইণ্ডস্ক্রীন সরিয়ে মাথা গলিয়ে দেখার চেষ্টা করছে টয়োটাটাকে। সে বলে উঠল, 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন টয়োটার প্যাসেঞ্জারের কাছে রিভলভার আছে।'

শহীদ ভোলেনি, ওর বাঁ হাতেও রিভলভার রয়েছে। একটা লাইট পোস্ট অতিক্রম করার সময় শহীদ পলকের জন্যে দেখল আমান গাজীর একটা হাত জানালার বাইরে। সেই হাতে একটা রিভলভার। আমান গাজী নাড়াচাড়া করছে সেটা টয়োটার লাল আলোর দিকে তাকিয়ে। শহীদ মরিসের গতি আরও বাড়িয়ে দিল। দুটো গাড়ির মধ্যে এখন ব্যবধান একশো গজের কাছাকাছি। আমান গাজী চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আরও স্পীডে চালানো যায় না!'

স্পীডমিটারের কাঁটা কাঁপছে আশির ঘরে। একজন ট্রাফিক পুলিস চিৎকার করে উঠল রাস্তা থেকে। তিনটে প্রাইভেট কার বিদ্যুতবেগে পিছনে চলে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ল দুটো বেবীট্যাক্সি রাস্তার ধারে। আমান গাজী বলে উঠল, পুলিসের গাড়ি ছিল আশেপাশে, জীপ আসছে একটা। অকস্মাৎ ডান চোখটায় কি যেন পড়ল শহীদের। বন্ধ হয়ে গেল সেটা। সম্ভবত কাঁকর পড়েছে। পানি গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে চোখ থেকে। এমন সময় তীক্ষ্ণ একটা শব্দ কানে ঢুকল। এক

মুহূর্ত পর আর একটা শব্দ হল। গুলি করছে টয়োটা থেকে। মরিসের বনেটে লেগে পিছলে গেল বুলেট। দ্বিতীয়টা মিস হল।

আমান গাজীও গুলি করল। শহীদের চোখ দিয়ে পানি ঝরছে তো ঝরছেই। প্রচণ্ডভাবে করকর করছে চোখটা। আর একটা গুলির শব্দ শুনল ও। টয়োটা থেকে আবার গুলি করা হল। এক চোখ দিয়েই দেখছিল শহীদ। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ডান দিকে মোড় নিল টয়োটা। চোখের আড়াল হয়ে গেল সেটা মুহূর্তে। আমান গাজী চিৎকার করে উঠল, 'জোরে, আরও জোরে!'

বিদ্যুৎবেগে মোড় নিল শহীদ। পরক্ষণে চমকে উঠল ও সামনে একটা লরি দেখে। ক্ষিপ্র হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল শহীদ। রাস্তার পাশে সারি সারি গাছ। গাছের পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল মরিস। কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে লরির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে পারল শহীদ। কিন্তু দুর্ঘটনা এড়াতে গিয়ে গাড়ির কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছে ও। মরিস সজোরে গিয়ে ধাক্কা খেল বড় একটা গাছের সঙ্গে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। মাথা ঠুকে গেল কাঁচের সঙ্গে দুজনেরই। আমান গাজী চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে গাড়িটা!'

শহীদ দেখতে পাচ্ছিল না। আমান গাজী দরজা খুলে নেমে পড়তে শহীদ একচোখে রুমাল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আমান গাজী ততক্ষণ রাস্তা ধরে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। শহীদ দেখল টয়োটাটা রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ নেই আশেপাশে। আমান গাজী অদৃশ্য হয়ে গেল দেখতে দেখতে রাস্তার মোড়ে। গুলির শব্দ শুনল শহীদ। পরক্ষণে একটা জীপ গাড়ির শব্দ কানে ঢুকল। পিছন ফিরে তাকাল শহীদ। জীপটা এসে থামল শহীদের পাশে। শহীদ বলে উঠল, 'আমি শহীদ খান। রাস্তার ওই দিকে যাও কয়েকজন, সশস্ত্র আততায়ী পালিয়ে গেছে ওদিকে।'

তিনজন কনস্টেবলের উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টর কায়েস আহমেদ বলে উঠল, 'জলদি যাও তোমরা। আমার নাম কায়েস আহমেদ, ইন্সপেক্টর, মি. শহীদ। আপনার সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আগে হয়নি আমার।'

শহীদ হাসল। বলল, 'আমার সাথে পরিচিত হবার এই তো মোক্ষম পরিবেশ। ইন্সপেক্টর, গাড়ি দুটো সরাবার ব্যবস্থা করুন এখুনি। মরিসটা আগে, টয়োটার ব্যাপারে খুব সাবধান, আঙুলের ছাপ চাই ওটা থেকে।'

'ইয়েস, স্যার।'

গাড়ি সরাবার কাজ শুরু করে দিল ইন্সপেক্টর। ভিড় জমে গেছে গাড়ি আর মানুষের। চোখের কাঁকরটা রুমালের কোণা দিয়ে বের করে ফেলে এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছে শহীদ। আমান গাজী বা কনস্টেবলগুলো ফিরে আসছে না এখনও।

আমান গাজী কে আসলে?

শহীদ আততায়ীর গাড়ি টয়োটার হাতলে রুমাল জড়িয়ে খুলল দরজাটা।

ড্যাশবোর্ডের পকেটে, উইণ্ডস্ক্রীন, প্যানেলে টর্চের আলো ফেলে দেখল শহীদ। দ্বিতীয় ড্যাশবোর্ডের পকেটে টর্চের আলো স্থির হয়ে গেল। শহীদ চমকে উঠল। পরিচিত একটা বাক্স দেখা যাচ্ছে। বাক্সের উপর লেখাঃ Ramonez Perfects.

ছয়

খানিকপর ফিরে এল আমান গাজী। শহীদকে প্রশ্ন করল, 'পেলেন কিছু?'

শহীদ বলল, 'বিশেষ কিছু না। আপনি?'

তিক্ত কণ্ঠে বলল আমান গাজী, 'পালিয়ে গেছে ব্যাটারা। তবে ছাড়ব না ওদেরকে আমি। কতক্ষণ থাকবেন এখানে?'

'আমাকে কিছুক্ষণ থাকতে হবে আরও। আপনি চলে যেতে পারেন। কোথায় উঠেছেন আপনি, ঠিকানাটা দিয়ে যান।'

আমান গাজী জানাল, 'এয়ারপোর্ট থেকে একটা পত্রিকা অফিসে যাই আমি, সেখান থেকে সোজা আপনার বাড়িতে। কোন ঠিকানা নেই।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'এত তাড়াতাড়ি গাড়ি জোগাড় করলেন কোথা থেকে?'

'ঢাকায় আমার বন্ধু আছে কয়েকজন, তারা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল এয়ারপোর্টে।'

শহীদ ভাবল আমান গাজীর 'বন্ধুদের' অস্তিত্ব সম্পর্কে খবর নিতে হবে প্রয়োজনে। ও বলল, 'আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারবেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল আমান গাজী। শহীদ একটা পেট্রল কারে করে বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করল তাকে।

খানিক পরই মি. সিম্পসন লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। শহীদ প্রয়োজনীয় কয়েকটা কথা বলল মি. সিম্পসনকে। আমান গাজীর গাড়ি কোন মিস্ত্রিখানায় পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে ঘটনাস্থল থেকে বিদায় নিল ও। আমান গাজীর সঙ্গে কথা বলা দরকার, সিধে বাড়িতেই ফিরে এল শহীদ।

আমান গাজী গফুরের তত্ত্বাবধানে ফিটফাট হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। স্যুটটা ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। সেটা খুলে রেখে শহীদের শার্ট গায়ে দিয়েছে। গফুর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে হাতের কব্জিতে। ড্রয়িংরুমে বসে কফি খাচ্ছিল ও। শহীদ বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। কাপড়-চোপড় বদলে ফিরে এল ও ড্রয়িংরুমে। সোফায় বসতেই আমান গাজী বলল, 'মি. শহীদ, আমি সত্যি দুঃখিত যে আমার জন্যে আপনাকে এমন কষ্ট পেতে হল।'

শহীদ বলল, 'কষ্ট সবটুকু হয়েছে আপনারই। ওদেরকে দেখতে পেয়েছিলেন?'

'কি রকম চেহারার লোক তা দূর থেকে দেখে বোঝা যায়নি।'

শহীদ জানতে চাইল, 'আপনাকে এভাবে আক্রমণ করার কারণ সম্পর্কে কোন

ধারণা করতে পারেন?'

'না। অনুমান করে নিন।'

শহীদ বলল, 'ওরা হয়ত চায়নি আপনি আমার সাথে কথা বলেন।'

আমান গাজী চিন্তিতভাবে বলল, 'হতে পারে। মি. শহীদ, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করছি এবং প্রশ্নটার উত্তর পেতেই হবে আমাকে। আপনি কি মনে করেন ওই লোকগুলোই রোশনাকে কিডন্যাপ করেছে?'

শহীদ বলল, 'হয়ত।'

'যদি ওরা রোশনার কোন রকম ক্ষতি করে তাহলে টুকরো টুকরো করব আমি ওদের সবক'টাকে।'

শহীদ খানিকপর প্রশ্ন করল, 'আপনি ইরাক থেকে ঠিক কি কারণে এসেছেন, মি. গাজী?'

'রোশনাকে খুঁজে বের করার জন্যেই এসেছি আমি। আমার বন্ধু আছে এমব্যাসিতে। তাদেরকে টেলিগ্রাম করেছিলাম ওর খবর চেয়ে। ওরাই নিরুদ্দেশের খবরটা দেয়।'

সম্ভবত মিথ্যে কথা বলছে না ও এমব্যাসিতে বন্ধুর অস্তিত্ব সম্পর্কে, ভাবল শহীদ। ও প্রশ্ন করল, 'মিস রোশনাকে খুঁজে বের করার এত বেশি আগ্রহের কারণ কি জানতে পারি?'

'রোশনার সাথে পরিচয় হয় আমার ইরাকে। ওকে আমার ভাল লেগেছিল। ওর কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাই না। একথা শুনে মনে করবেন না যে আমাদের বিয়ের কথাও পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। এত অল্পদিনে অতদূর এগোনো সম্ভব নয়। মাত্র একমাস আগে ওর সাথে আমার পরিচয় হয়।'

'কবে শেষ দেখেছেন আপনি মিস রোশনাকে?'

'ঢাকায় ফেরার সময় ইরাকে, এয়ারপোর্টে।'

শহীদ জানতে চাইল, 'আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন আপনি?'

'এয়ারপোর্ট থেকে একটা সংবাদপত্র অফিসে গিয়েছিলাম আমি। "দৈনিক রঙ্গ"। ওখানের সবাই বলল আপনার সাহায্য ছাড়া রোশনাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। আপনার প্রতি জার্নালিস্টদের বিশ্বাস অগাধ, দেখলাম নিজের চোখেই। তাই এলাম। এখন, যেভাবেই হোক, আপনি ব্যবস্থা করুন রোশনাকে উদ্ধার করার। আপনি সাহায্য না করলে আমি একাই চেষ্টা করব। কোন বাধাই রুখতে পারবে না আমাকে।'

'অনেক বাধা রুখে দাঁড়াবে আপনার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে যদি লাইসেন্সহীন লোডেড রিভলভার নিজের সঙ্গে রাখেন ঢাকা শহরে।'

'ভাল কথা, রিভলভারের লাইসেন্সের ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারলে ঝামেলা মুক্ত হই আমি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি যখন। আমার দেশের

লাইসেন্স সঙ্গেই আছে।'

শহীদ বলল, 'তা হয়ত করে দেয়া যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আপনি ফায়ার করেছেন। টয়োটার পেট্রল ট্যাঙ্কে দুটো গুলি লেগেছে। গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়েছিল ওরা পেট্রল ট্যাঙ্কে গুলি লাগাতেই। গাড়িটা এখন থানা হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে গেছে। আর আপনারটা কারখানায়। পরে জানাব আমি কোন কারখানায় আছে।'

'ধন্যবাদ।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'শুধু মিস রোশনার নিরুদ্দেশ সংবাদ শুনেই চলে এলেন আপনি ঢাকায় সুদূর ইরাক থেকে?'

'খবর পেয়ে এক ঘন্টাও দেরি করিনি আমি। চাটার্ড প্লেনে ঢাকায় নেমেছি। রোশনাকে খুঁজে পাবার জন্যে আমি গোটা পৃথিবীটা অন্তত তিনবার চক্কর মারতে পারি প্লেন নিয়ে। মি. শহীদ, আমার একটা প্রশ্নের যথাসম্ভব সরাসরি পরিষ্কার উত্তর দেবেন?'

শহীদ চুপ করেই রইল।

'আপনার কি মনে হয় রোশনা খুন হয়েছে?'

শহীদ সিগারেট ধরাল একটা। শহীদ প্রস্তুত ছিল না মিস রোশনা নিহত হয়েছে কিনা এ কথার উপর মন্তব্য করতে। কেউ যদি তাকে হত্যা করতেই চায় তাহলে সেই পোড়ো বাড়িতেই তার লাশ পাওয়া উচিত ছিল। যাকে খুন করবে তাকে অন্যত্র বয়ে নিয়ে যাবার কি দরকার? যে যাই বলুক, মিস রোশনাকে জোর করে নিয়ে যাবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সে সম্ভবত স্ব-ইচ্ছাতেই গেছে। শহীদ সে কথাই জানাল আমান গাজীকে। আমান গাজী বলল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন রোশনা একদল অপরাধীদের সাথে স্বেচ্ছায় গেছে? অসম্ভব!'

আমান গাজীর মুখাবয়ব পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করল। প্রচণ্ড একটা মানসিক আঘাত পেয়েছে যেন ও কথাটা শুনে। এমন সময় মহুয়া প্রবেশ করল ড্রয়িংরুমে। আমান গাজীর সঙ্গে মহুয়ার পরিচয় আগেই হয়েছে। শহীদকে ও জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে আবার বের হবে নাকি তুমি?'

'আশা করি বের হব না। ফোন করব মি. সিম্পসনকে।'

গফুর এসে ঢুকল, 'দাদামণি, রুম তৈরি।'

শহীদ আমান গাজীকে বলল, 'আপনি এখানেই থেকে যান। ওপাশের রুমে বিশ্রাম নিতে পারেন আপনি।'

আমান গাজী উঠে চলে গেল গফুরের সঙ্গে। শহীদ বলে উঠল মহুয়াকে, 'মিস রোশনার দেশে ফিরে আসার যথার্থ কারণ আছে। কিন্তু আমান গাজী কেন তার দেশ থেকে এত দূরে ছুটে এসেছে? শুধুই কি প্রেম? নাকি অন্য কিছু? সঙ্গে ওর রিভলভার, তারমানে বিপদের আশঙ্কা আছে একথা ওর অজানা ছিল না। আমার

সঙ্গে কথা বলার জন্যে আসা মাত্র গুলি করা হয় ওকে লক্ষ্য করে, নাকি…!'

শহীদ হঠাৎ চুপ করে গেল। মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'গুলি আমান গাজীর দিকে ছোঁড়া হয়েছিল? নাকি তোমার দিকে? আসল কথা চেপে যাচ্ছ কেন তুমি?'

শহীদ ঠিক জানে না কার প্রতি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল গুলি। মহুয়ার ধারণা তার প্রতি, কিন্তু সেটা খানিকটা আবেগ প্রবণতার জন্যে। শহীদ ফোন করল মি. সিম্পসনকে। মি. সিম্পসন বললেন, 'তুমি বরং আমার অফিসে একবার চলে এসো, শহীদ।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ। পরমুহূর্তে বেজে উঠল ফোনের বেল। রিসিভার কানে তুলতেই অপরপ্রান্ত থেকে ভারি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কুয়াশা বলছি।'

'শহীদ বলছি, কি খবর, কুয়াশা?'

ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করল শহীদ। কুয়াশা বলল, 'বেশি কথা জানতে চেয়ো না, শহীদ। কামালের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু কতটা ভাল এ-কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারব না আমরা। আচ্ছা, ছাড়ছি।'

কুয়াশা ছেড়ে দিতে শহীদও ফোন ছেড়ে ছিল। একটু আশ্বস্ত হল ও মনে মনে। কামাল এ যাত্রা বাঁচবে বলে এখনও বিশ্বাস হয় না ওর। তবু কুয়াশা যখন ভার নিয়েছে এবং অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত ভাল তখন বলা যায় না কিছুই। খবরটা শুনে আনন্দে চোখে জল এসে পড়ল মহুয়ার। গফুরেরও সেই-একই অবস্থা। লীনা তো লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেই চলেছে সারাদিন। কামালকে ওরা সবাই ভালবাসে অন্তর দিয়ে।

শহীদ মি. সিম্পসনের অফিসে পৌঁছুল। মি. সিম্পসনের নিজস্ব অফিস রুমে ঢোকার আগে ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের রুমে ঢুঁ মারল প্রথমে। অনেক তথ্য জমা হয়েছিল ওখানে। জানা হয়ে গেল শহীদের সব। প্রথমত আততায়ীদের গাড়ি টয়োটায় আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু স্টিয়ারিং হুইলে এবং ড্যাশবোর্ডে কোন ছাপ নেই। তার মানে হাতে গ্লাভস পরে গাড়ি চালানো হয়েছে। গাড়ির ভিতর থেকে পাওয়া গেছে Ramonez সিগার ছাড়া পাইপ, দেশলাই, একটা হ্যাণ্ডবুক। এসব সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে। তৈরি হলে শহীদের কাছে কপি পাঠানো হবে। অন্য একটা রুমে গেল শহীদ। সকলেই ওকে দেখে কামালের কথা জিজ্ঞেস করল। এই রুমে বুলেটের পরীক্ষা চলছে। আমান গাজীর মরিস গাড়ি থেকে যে বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো আততায়ীদের গাড়ি টয়োটা থেকে ছোঁড়া হয়েছিল। শহীদ প্রশ্ন করে জানতে পারল গুলিগুলো Smith and Wesson ·32-র।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট রুমে ঢুকল। সে জানাল—ফাইনাল রিপোর্ট হয়ে গেছে।

শহীদ জানতে পারল টয়োটায় যে আঙুলের ছাপগুলো পাওয়া গেছে তার কোন রেকর্ড নেই পুলিসের জিম্মায়। অর্থাৎ আততায়ী কোন দাগী লোক নয়। গাড়ির ভিতরের কোন কোন আঙুলের ছাপ মিলে গেছে Ramonez সিগারের বাক্সের উপরের আঙুলের ছাপের সঙ্গে। ছাপগুলো সবই নতুন নয় পুরাতনও আছে। শহীদ ছাপগুলো এনলার্জ করিয়ে কপি পাঠিয়ে দিতে বলল প্রতিটি জেলার থানা হেডকোয়ার্টারে। শহীদ বলল, 'এই হাতের ছাপওয়ালা লোকটাই আক্রমণ করেছিল কামালকে। অর্থাৎ কামালের আক্রমণকারী এবং টয়োটা করোনার আততায়ী একই লোক—Ramonez সিগার টানে লোকটা। একে খুঁজে বের করতে পারলেই অর্ধেক পথ অতিক্রম করতে পারব আমরা। এই মুহূর্তে ওই পর্যন্তই পৌঁছুতে চাই।'

শহীদ একজন কনস্টেবলকে ডেকে পাঠাল। ইতিমধ্যে একটা টেবিল দখল করে ইরাকের পুলিস কমিশনারের কাছে মোহাম্মদ আমান গাজীর পরিচয় দিয়ে তথ্য দেবার অনুরোধ জানিয়ে একটা টেলিগ্রামের ছক তৈরি করে ফেলল শহীদ। কনস্টেবল আসতে তাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল পোস্ট অফিসে। আমান গাজীর কাছে একটা 'Colt ·32' আছে এ কথা জানাতেও ভোলেনি শহীদ টেলিগ্রামে।

কাজগুলো সেরে মি. সিম্পসনের অফিসে এসে শহীদ দেখল রুম খালি। মি. সিম্পসন নতুন একটা কেসের কাজে বেরিয়ে গেছেন।

অগত্যা বাড়ি ফিরে এল শহীদ।

পরদিন সকাল। শহীদের ঘুম ভাঙতে মহুয়া এসে জিজ্ঞেস করল, 'বিদেশী অতিথিকে চা না অন্য কিছু দেব?'

শহীদ বলল, 'অরেঞ্জ জুস বা কফি পছন্দ করবে সম্ভবত।'

শহীদ কথাটা বলে আমান গাজীর রুমের দরজার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। মহুয়াকে বলল, 'দেখেছ?'

'কি?'

ভদ্রলোকের রুমের দরজা ঠিকভাবে বন্ধ নয়।

শহীদ দ্রুত রুম ছেড়ে বের হয়ে এল। আমান গাজীর রুমের ভিতর ঢুকল ও। পিছনে মহুয়া। শহীদ শূন্য রুম দেখে কোন মন্তব্য করল না। কিন্তু মহুয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ভদ্রলোক চলে গেছেন!'

টেবিলের উপর একটা চিরকুট পাওয়া গেল। শহীদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ লেখা। কোন ব্যাখ্যা নেই।

সাত

মি. সিম্পসনের ফোন পেয়ে এসেছে শহীদ।

মি. সিম্পসনের অফিসরুমে পা দিয়েই শহীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হল ডেস্কের উপর রাখা একটা হ্যাটের প্রতি।

'কোথা থেকে এল ওটা?'

শহীদের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে বললেন, 'ঢোকার সাথে সাথেই চোখে ঠেকেছে, কেমন? ওটা তোমার জন্যেই রাখা হয়েছে, শহীদ। আততায়ীরা যে টয়োটায় ছিল এই টুপিটা সেই টয়োটা থেকেই ছিটকে পড়েছিল রাস্তায়।'

চমকে উঠল শহীদ, 'বলেন কি!'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক তাই।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে চেক করিয়েছেন ওটাকে? চুল পাওয়ার কথা।'

হ্যাটটা হাতে তুলে নিয়ে পরখ করতে করতে বলল শহীদ। মি. সিম্পসন একটা এনভেলাপ ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'পাঁচটা চুল, জেট ব্ল্যাক। চুল দেখে অনুমান করা চলে যুবক লোক পরত এটা। লোকটা কি ধরনের তেল ব্যবহার করত তা হয়ত পরীক্ষা করে জানা যেতে পারে। কিন্তু একই ফর্মূলার তেল বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর আছে। সুতরাং খুব একটা সুবিধে হবে না তাতে।'

শহীদ বলল, 'তবু পরীক্ষা করতে হবে।'

মি. সিম্পসন জানালেন মিসেস জামিল হায়দারের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। শহীদ ফোন করল একটা বিশেষ নম্বরে। নম্বরটা কুয়াশা জানিয়েছে। কামালের খবর একই রকম—অপরিবর্তিত। শহীদ আবার ফোন করল শামিম হায়দার নার্সিং হোমে আছে কিনা জানার জন্যে। বেলা ন'টার সময় নার্সিং হোম থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে গেছে শামিম হায়দার, খবর পাওয়া গেল।

মি. সিম্পসনের সঙ্গে কয়েক মিনিট মাত্র আলাপ করে বিদায় নিল শহীদ। গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হল শামিম হায়দারের বাড়িতে। কলিংবেল টিপতে দরজা খুলে দিল শামিম হায়দার। শহীদকে দেখে বিরস হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। বলল, 'আবার কি দরকার পড়ল আপনার, মি. শহীদ?'

শহীদ বলল, 'আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন শুনে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এলাম।'

'কি কথা?'

শহীদ শামিম হায়দারকে পাশ কাটিয়ে দরজা অতিক্রম করে ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে গেল। পাশের রুমের দরজাটা অর্ধেক খোলা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডাইনিংরুমটা। শহীদ আসন গ্রহণ করে বলল, 'আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আপনার আব্বা আপনার চাচাত ভাইকে হত্যা করার অভিযোগে পুলিসের হেফাজতে আছেন।'

শামিম হায়দার তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই সময়টা আপনি আমার পিছনে

অপব্যয় না করে আমার বোনের সন্ধানে ব্যয় করলে ভাল করতেন।'

শহীদ বলল, 'সেই বরং আমাকে খবর দেবার জন্যে পাঁচটা মিনিট ব্যয় করতে পারে।'

'তার মানে! আপনাকে খবর দেবে ও কেমন করে! ওকে তো কিডন্যাপ করা হয়েছে!'

শহীদ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল শামিম হায়দারের দিকে। তারপর হাতের হ্যাটটা চোখের সামনে তুলে ধরে প্রশ্ন করল, 'চিনতে পারেন এটা?'

শামিম হায়দার মনোযোগ দিয়ে দেখল হ্যাটটা। বলল, 'সম্ভবত এইরকম একটা হ্যাট পরে আমাকে আর রোশনাকে আক্রমণ করেছিল সেই লোকটা। ঠিক চিনতে পারছি না।'

শহীদ বলল, 'এই হ্যাটটাই পরেছিল লোকটা, আমার বিশ্বাস। এবার বলুন আক্রমণকারী কি ধরনের ডকুমেন্টের জন্যে এসেছিল আপনার বাড়িতে।'

'একবার আপনাকে জানিয়েছি যে সে-কথা আমি জানি না।'

শহীদ হেসে ফেলে বলল, 'সত্য কথা লুকিয়ে কতক্ষণ রাখবেন। নিন, সিগার।'

পকেট থেকে Ramonez সিগারের প্যাকেটটা বের করে শামিম হায়দারের সামনে বাড়িয়ে ধরল শহীদ। শামিম হায়দার বিস্ময়বোধ করল, কিন্তু চমকে বা থমকে গেল বলে মনে হল না শহীদের। মনে হল না এই সিগার পূর্ব পরিচিত তার। সে বলে উঠল, 'সিগার মাঝে মধ্যে সন্ধ্যার পর খাই। তাও খুব কম। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য কি বলুন দেখি?'

শহীদ সিগার রেখে সিগারেট বের করে দিল। তারপর বলল, 'সত্য, পূর্ণাঙ্গ সত্য ছাড়া আর কিছু আবিষ্কার করা আমার উদ্দেশ্য নয়।'

একটু থেমে শহীদ অকস্মাৎ জানতে চাইল, 'আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থীটা কে?'

শামিম হায়দার চমকে উঠল। বলল, 'কি?'

শহীদ প্রশ্ন করল কঠিন কণ্ঠে, 'আপনার সঙ্গে কে আছে এখানে? কাকে আপনি আমার কাছ থেকে লুকোতে চেষ্টা করছেন?'

শামিম হায়দার নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। বলে উঠল ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে, 'মাত্র আধঘন্টা আগে এখানে ফিরে এসেছি আমি। এবং কোন মানুষের ছায়াও দেখিনি।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

শহীদ জোর দিয়ে বলল আবার, 'সম্ভবত কয়েকটা ব্যাপার ভুলে গেছেন আপনি। আপনার চাচাত ভাই খুন হয়েছে, আপনার আব্বা গ্রেফতার হয়েছেন, আপনার বোন রহস্যময় নাটকীয়তা দেখাবার পর ইচ্ছাকৃতভাবে অদৃশ্য…।'

'রোশনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'ধরা যাক কিডন্যাপই করা হয়েছে, যা সম্ভব বলে মনে হয় না। আপনি

আক্রান্ত হয়েছেন কিছু কাগজ পত্রের জন্যে, যেগুলোর অস্তিত্ব নেই বলে ধারণা দেবার চেষ্টা করছেন—সবগুলো যোগ করুন, কি দাঁড়ায়? এ ছাড়া আরও দুটো ব্যাপার আছে।'

শহীদের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল। শামিম হায়দার চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু শহীদের চোখজোড়া যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে তার চোখের দৃষ্টিকে। শহীদ কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল, 'দুটোর মধ্যে প্রথমটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা ওই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে—গতরাতে আমার প্রতি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। দ্বিতীয়টা ভীষণ সিরিয়াসলি নিয়েছি আমি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং সহকর্মীকে আক্রমণ করা হয়েছে কাপুরুষের মত। সে বাঁচবে কিনা বলা যাচ্ছে না। আমি আর কোনরকম সুযোগ দিতে চাই না কাউকে। কাকে আপনি লুকিয়ে রেখেছেন এই বাড়িতে?'

শামিম হায়দার উত্তর দিল না। শহীদ দেরি না করে দরজার দিকে পা বাড়াল। অর্ধভেজানো দরজাটা খুলে গেল শহীদের পৌঁছুবার আগেই। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল মোহাম্মদ আমান গাজী। নিজের বুকে হাত দিয়ে হাসি মুখে বলে উঠল সে, 'আমাকে খুঁজছেন বুঝি?'

শহীদ তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'তাহলে আপনি! মি. শামিম, কেন আপনি মি. গাজীকে আমার কাছ থেকে আলাদা রাখতে চান? মিথ্যে কথা বলার কি কারণ দেখাবেন আপনি?'

শামিম হায়দার বেপরোয়াভাবে বলল, 'আমার অতিথির ব্যাপারে অন্য কেউ নাক গলালে মিথ্যে উত্তরই পেতে হবে তাকে।'

'এখন ওসব খাটবে না। আপনার এবং আপনার অতিথির সকল ব্যাপারে এখন নাক গলাব আমরা। সন্দেহজনক লোকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমরা পালন করি না।'

'সন্দেহটা কি অভিযোগে?'

'হত্যাকাণ্ডের সমাধানে জটিলতা সৃষ্টি। এখানে কেন আপনি, মি. গাজী?'

আমান গাজী বলল, 'রোশনার ভাইয়ের সাথে আলাপ করার জন্যে। এবং আমার ধারণা হয়েছে আপনি যে প্রসেসে রোশনাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন তাতে দ্রুত ফল লাভ করা যাবে না, তাই আমি নিজেই শামিমকে নিয়ে চেষ্টা করব রোশনাকে খুঁজে বের করতে, ঠিক করেছি। আমি ঢাকায় এসেছিও সেই কারণে—দ্রুত রেজাল্ট চাই আমি।'

শহীদ বলে উঠল, 'কিন্তু সাবধান! দ্রুত রেজাল্ট পাবার বদলে দ্রুত হাজতে স্থানান্তরিত হবার সম্ভাবনাটাও একবার ভেবে দেখবেন।'

কথাটা বলে দাঁড়াল না শহীদ। বেরিয়ে এল শামিম হায়দারের বাড়ি ছেড়ে। সোজা মি. সিম্পসনের অফিসে পৌঁছুল ও। মি. সিম্পসন অফিসেই রয়েছেন। শহীদ

আসন গ্রহণ করে হ্যাটটা রাখল টেবিলের উপর। বলল ঢাকা শহর এলাকায় কতজন দোকানদার Ramonez সিগার বিক্রি করে?

মি. সিম্পসন লিস্টটা দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও প্ল্যান করছ নাকি?'

শহীদ দেখল লিস্টে প্রায় পঞ্চাশটা দোকানের নাম। বলে উঠল ও, 'দোকানদারের কাছে প্রথমে যাব আমরা। ওদেরকে দিয়েই চেষ্টা করব লোকটার সন্ধান পাবার জন্যে।'

'কিন্তু কিভাবে?'

শহীদ Ramonez সিগারের একজন ক্রেতা চাই, যে সচরাচর এই হ্যাটটা পরত।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মি. সিম্পসনের মুখ।

আট

হ্যাটটা চিনতে পারল বত্রিশ নম্বর দোকানদার। দোকানদার খরিদ্দারটার নাম-ঠিকানা জানে না, কিন্তু এই হ্যাট পরে গত দু'তিন মাস ধরে একজন লোক পনেরো দিন পর পর Ramonez সিগার নিয়ে যায় এক প্যাকেট—পঞ্চাশটা। যখন আসে শনিবারেই আসে লোকটা। আজ শুক্রবার। গত শনিবার লোকটা আসেনি। আগামী কাল আসার সম্ভাবনা সমধিক।

শহীদ ফিরে এল সন্তুষ্ট হয়ে মি. সিম্পসনের অফিসে। মি. সিম্পসন ফোনের রিসিভার কানে উঠিয়েছিলেন মাত্র, শহীদকে দেখেই বললেন, 'শহীদ, তোমার ফোন। কুয়াশা।'

ধক্ করে উঠল বুকটা। কুয়াশা ফোন করেছে তাকে এখানে! কেন! তবে কি কামাল···। রিসিভারটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে শহীদ বলে উঠল, 'শহীদ বলছি।'

অপরপ্রান্ত থেকে ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কুয়াশা বলছি, শহীদ। ভাল খবর। কামাল বিপদ-মুক্ত।'

শহীদের কণ্ঠ হতে বিস্ফোরণ ঘটল, 'ওয়াণ্ডারফুল! আমি কৃতজ্ঞ, কুয়াশা। কামাল কথা বলতে পারবে?'

'এখনি না। সময় হলে জানাব।'

'ধন্যবাদ, কুয়াশা। তোমাকে আর আটকে রাখব না, ছাড়ছি।'

ফোন ছেড়ে দিল শহীদ। মি. সিম্পসন বললেন, 'যাক, আমাদের সৌভাগ্য যে কুয়াশা ছিল, তা না হলে কামালকে বাঁচানো সম্ভব হত না হয়ত।'

শহীদ বলল, 'ঠিক তাই।'

মি. সিম্পসন প্রসঙ্গ বদল করে বললেন, 'তুমি ইরাকী পুলিস কমিশনারকে যে টেলিগ্রাম করেছিলে তার উত্তর দিয়েছে ওরা। এই যে।'

ঠিকানা দিয়েছিল শহীদ মি. সিম্পসনের অফিসেরই। টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে মনোনিবেশ করল শহীদ। পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে আমান গাজী সম্পর্কে। বয়স ত্রিশ। অবিবাহিত। পোলট্রি ফার্মের অংশীদার, বিভিন্ন ছোটখাট ব্যবসা আছে আরও। কপর্দকহীন অবস্থায় কর্মজীবনের শুরু। অস্বাভাবিক উন্নতি করেছে। অবশ্য বেআইনী উপায়ে টাকা সংগ্রহ করেছে বলে কোন প্রমাণ নেই। অভিযানপ্রিয়। মাঝেমধ্যেই লণ্ডন, দিল্লী, কায়রোয় ঘুরতে যায়। নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট প্লেনে চড়ে ঢাকার উদ্দেশে। ইরাকের ঠিক কোথায় প্রথম পরিচয় হয়েছিল তার সঙ্গে মিস রোশনার তা জানা যায়নি। তবে দু'জনকে এক সঙ্গে বেড়াতে দেখা গেছে ইরাকের হাই-সোসাইটিতে।

পরদিন সকালে জেল হাজতে মি. জামিল হায়দারের সঙ্গে দেখা করল শহীদ। তিনি জানালেন তাঁর মেয়ে ইরাকে গিয়েছিল ইন্টেরিঅর ডেকোরেশন সম্পর্কে ডিগ্রী নিতে। শহীদ মিসেস জামিল হায়দারের সঙ্গেও দেখা করল বাড়িতে। তিনি এখনও অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মিস রোশনার ইরাকে যাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনিও জানালেন ওই একই কথা। শহীদ ভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে খবর পেল কথাটা সত্য।

ঢাকার পরিত্যক্ত রেল স্টেশনের কাছে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হল শহীদ। সিগারের দোকানটা ওখানেই। গাড়ি দূরে পার্ক করে দোকানের রাস্তার বিপরীত পাশে এসে দাঁড়াল ও। দু'জন কনস্টেবলকে বলে এসেছে ও জোরে গাড়ি চালিয়ে কেউ পালাবার চেষ্টা করলে বাধা দিতে হবে।

দোকানটার দিকে তাকাল শহীদ। সিগারের দোকানের পাশে একটা স্টেশনারী দোকান। স্টেশনারী দোকানের উপর একজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোস্টার লাগাচ্ছে। লোকটা ডি. কস্টা। শহীদ ওকে চারিদিকে চোখ মেলে রাখার কাজ দিয়েছে। গতরাতে শহীদের কাছে কাজের জন্যে গিয়েছিল ডি. কস্টা। সিগারের দোকানের কাউন্টারে স্বাস্থ্যবান একজন লোক জিনিসপত্র গুছিয়ে শেলফে রাখছে। লোকটা আসলে ইন্সপেক্টর বোরহান। সেলস্ ম্যানের ছদ্মবেশ নিয়েছে ও। শহীদ এগিয়ে গিয়ে কুড়িটার প্যাকেট কিনল প্লেয়ারসের। ইন্সপেক্টর শহীদকে না চেনার ভান করল নিখুঁতভাবে। শহীদ সিগারেট নিয়ে ফিরে গেল অপর পারে। তারপর হাঁটতে লাগল ধীরে ধীরে।

তৃতীয়বার দোকানের বিপরীত পাশ দিয়ে যাবার সময় শহীদ দেখল একজন লোক নতুন একটা হ্যাট মাথায় দিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তা পেরোবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠল শহীদ। কিন্তু গাড়ির ভিড়ে সম্ভব হচ্ছে না কোন মতে। এদিক ওদিক তাকাল শহীদ। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। দোকানের দিকের ফুটপাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সে—মোহাম্মদ আমান গাজী। সিগারের দোকানের দিকে তীক্ষ্ণ নজর তার। একা।

শহীদ দোকানের দিকে তাকাল।

ইন্সপেক্টর বোরহান Ramonez সিগারের প্যাকেট বের করে নতুন হ্যাট পরিহিত খরিদ্দারটাকে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি কি এই ব্র্যাণ্ড চাইছেন, সাহেব? Ramonez?'

'হ্যাঁ।'

লোকটা উত্তর দিল। ইন্সপেক্টর বোরহান উত্তেজনা দমন করার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলল, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা বা দুটো প্রশ্ন করতে চাই…।'

নতুন হ্যাট পরিহিত খরিদ্দারটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ঘুরে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করল সে রাস্তার উপর দিয়ে।

ডি. কস্টা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে পড়ল ছাদের উপর থেকে রাস্তায়। কিন্তু লোকটা তখন দূরে–পালাচ্ছে। মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার উপর বসে পড়ে ডি.কস্টা চিৎকার করে উঠল, 'হায় হায়! বড্ড জোরে রান করিয়া গেল! গ্রেট একটা মিস্টেক হইয়া গেল!'

নয়

শহীদ লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল। ছোট ছোট ঘন কালো চুল মাথায়, গায়ের রঙ কালো, পাণ্ডুর বর্ণ মুখ, বড় বড় চোখ, খাড়া নাক, লম্বা গলা। ইন্সপেক্টর বোরহান কথা বলার চেষ্টা করতেই তড়াক করে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল লোকটা। আমান গাজী অকস্মাৎ শহীদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মি. শহীদ! ওই লোকটা!'

শহীদ প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল আমান গাজীকে। ছুটতে শুরু করল ও দ্রুত বেগে। লোকটা রাস্তার অপর দিক দিয়ে ছুটে চলেছে। মি. সিম্পসন দৌড়ে যাচ্ছেন পিছন পিছন। কাছাকাছিই ছিলেন তিনি। শহীদ রাস্তা পার হতে গিয়ে অকস্মাৎ ধাক্কা খেল একটা বেবীট্যাক্সির সঙ্গে। সময় মত সাবধান হতে পেরেছিল বলে মারাত্মক আঘাত পেল না ও। কিন্তু রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে। সেটা কুড়িয়ে নেবার সময় রইল না হাতে, দৌড়ুতে শুরু করল শহীদ। ঠিক এমন সময় পলায়নরত লোকটা গুলি করল। রিভলভার বের করে। মি. সিম্পসনের পায়ে লাগল গুলি। পড়ে গেলেন তিনি রাস্তার উপর। শহীদ থামল না। ইন্সপেক্টর বোরহান শহীদের পিছন পিছন আসছে চিৎকার করতে করতে, 'চোর! চোর!'

শহীদের পিছনে আর একজন লোকের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। রাস্তার কোন লোক অংশ গ্রহণ করল না পলায়নরত লোকটাকে বাধা দেবার জন্যে। রাস্তা অতিক্রম করল শহীদ দুঃসাহসিকভাবে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা ছুটন্ত গাড়ির এক

ইঞ্চি পাশ ঘেঁষে পলায়নরত লোকটা বিপরীতদিকের ফুটপাতে চলে গেল। হঠাৎ মোড় নিল সে। মোড় নিয়ে তিনটে বাড়ি অতিক্রম করে চতুর্থ বাড়িটার খোলা দরজা দিয়ে পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। শহীদ শুধু লোকটার শার্ট দেখতে পেল মোড়ে পৌঁছে।

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। বন্ধ হয়ে গেছে দরজাটা। শহীদ জোরে জোরে ধাক্কা মারল দরজায়। পিছন থেকে আমান গাজী বলে উঠল, 'ভাঙতে হবে দরজা, খুলবে না।'

শহীদ বলল, 'রিভলভারটা আমাকে দিন।'

'না।'

শহীদ বাক্যব্যয় না করে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল আমান গাজীর রিভলভারটা। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল ও দরজার গায়ে। ছিটকিনি ভেঙে গিয়ে খুলে গেল পাল্লা দুটো। বাড়ির উঠানে কাউকে দেখতে পেল না শহীদ। দোতলার উপর সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল একটা। দরজাটা দেখতে পেল শহীদ। ছুটল ও সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায়। আমান গাজী রয়েছে পিছন পিছন।

দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে এক সেকেণ্ডও চিন্তা করবার সময় নিল না শহীদ। ভিতর থেকে বন্ধ। কী-হোলের উপর রিভলভারের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল শহীদ। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে খুলে ফেলল ও দরজাটা। সামনের ঘরে কেউ নেই। ভিতরের কোন ঘরে ফোন বাজছে। আততায়ী ফোনে কথা বলছে। সামনের ঘরে ঢুকে অপরদিকের দরজার কাছে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মারল শহীদ। লোকটাকে দেখতে পেল ও। এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে রিসিভার। শহীদকে দেখতে পেয়েই গুলি করল লোকটা। বুলেট বেরিয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। শহীদ গুলি করল। লোকটার হাতে ধরা রিসিভারে অব্যর্থভাবে গিয়ে লাগল বুলেট। ভেঙেচুরে পড়ে গেল সেটা লোকটার হাত থেকে। দ্বিতীয়বার গুলি করল না শহীদ। ঘরের অপরদিকের আর একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে আমান গাজী। লোকটার পিছনে সে এখন। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটাকে ধরার জন্যে।

লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমান গাজী লাফিয়ে পড়ল তার উপর। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিমান পুরুষ লোকটা। আক্রান্ত হয়ে সে রিভলভার হারাল বটে, কিন্তু আমান গাজীকে ধাক্কা মেরে ফেরত পাঠাল ঘরের এক কোণে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। শহীদ ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছিল ঘরে। প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ও লোকটার মুখে।

লোকটা টলতে টলতে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে।

আমান গাজী উঠে দাঁড়াল। যেন কিছুই হয়নি তার। উঠে দাঁড়িয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে টলায়মান লোকটার ঘাড়ে। হঠাৎ হিংস্রতা পেয়ে বসেছে যেন ওকে।

প্রচণ্ড জোরে কয়েকটা ঘুসি মারল সে লোকটাকে। তারপর দমাদম লাথি চালাল। থামবার কোন লক্ষণ নেই।

শহীদ বলে উঠল, 'হয়েছে, থাক।'

কিন্তু থামল না আমান গাজী। পাগল হয়ে গেছে যেন ও। লাথির পর লাথি মেরে চলেছে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে লোকটা। শহীদ চমকে উঠল হঠাৎ পরক্ষণে রিভলভারের বাঁট দিয়ে আমান গাজীর নাকে ঘা মারল ও।

মি. সিম্পসন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে সানন্দে বলে উঠলেন, 'সাবাস! লোকটাকে তাহলে কাত করে ফেলেছ, শহীদ!'

পকেটের কাগজপত্র দেখে জানা গেল লোকটার নাম ইয়াকুব। বাড়িওয়ালাও সমর্থন করলেন কথাটা। বাড়িওয়ালা থাকেন পাশের বাড়িতেই। তিনি জানালেন মিস রোশনা ইরাকে যাবার আগে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল। ইরাকে যাবার সময় ইয়াকুবকে দিয়ে গেছে বাড়িটা বসবাস করার জন্যে। নিয়মিত ভাড়া পেয়ে আসছেন তিনি। তার আপত্তি করার কিছু ছিল না।

ইয়াকুব বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। কাপড় চোপড় সস্তা দামের এবং পুরানো। নতুন হ্যাটটা বেমানান। অবশ্য পুরানো হ্যাটটা কাপড় চোপড়ের সঙ্গে মিল খায়। মি. সিম্পসনকে ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। তিনি পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে লোকজন নিয়ে সার্চ করছেন সম্পূর্ণ বাড়িটা। আমান গাজী এই খানিক আগে জ্ঞান ফিরে পেয়ে একটা আরাম কেদারায় উঠে বসেছে। চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিচ্ছে যেন ও। নাকের মাঝখানটা আলুর মত হয়ে ফুলে উঠেছে তার।

শহীদ ফিরে এল তিনটি রুম একবার করে পরখ করে। মিস রোশনা যে এ বাড়িতে একসময় থাকত তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেডরুমে পাওয়া গেছে তার আব্বা মি. জামিল হায়দারের বাঁধানো ছবি। ছবির নিচে লেখা—'রোশনাকে, উপহার স্বরূপ'। সইটা মি. জামিল হায়দারের। আরও কয়েকটা ফটো দেখেছে শহীদ। সবগুলোই সম্ভবত মিসেস জামিল হায়দারের শখ করে তোলা। কিন্তু অল্প কয়েক দিন আগে মিস রোশনা এখানে ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই।

আমান গাজী চোখ মেলল। শহীদ বলল, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।'

'কেন, কেন! আমি তো আপনার প্রাণ বাঁচালাম!'

শহীদ বলল, 'আপনি আর একটু হলে খুন করে ফেলতেন লোকটাকে। আইন রক্ষকের কাজে বাধা প্রদান—এই হল আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ। আপনাকে হাজতে ভরার পর প্রশ্ন করব আমরা। আপনার অতি স্মার্টনেস বিপজ্জনক।'

আমান গাজী কথা বলল না। শহীদ ভাবছিল মিস রোশনা যে লোককে তার বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল সেই লোকই আক্রমণ করেছিল তাকে এবং তার ভাইকে—অথচ আক্রমণকারীকে চিনতে পারেনি সে। নাকি চিনতে পেরেও শহীদকে মিথ্যে কথা বলেছিল?

ইয়াকুব এখনও জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে না। তার গাল, ঠোঁট, কপাল ফুলে গেছে। আমান গাজী অমানুষিকভাবে মেরেছে লোকটাকে। কেন? শহীদ ভাবতে চেষ্টা করল। ষাটটি সেকেণ্ড যদি আরও দিত শহীদ ওকে, তাহলে মেরেই ফেলত সে লোকটাকে। আমান গাজী কি তাহলে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই হত্যা করতে চেয়েছিল ইয়াকুবকে? একথা ভেবেই তখন চমকে উঠেছিল শহীদ। যদি তাই হয় তাহলে ধরে নিতে হয় আমান গাজী নিশ্চয় চাননি ইয়াকুব পুলিসের কাছে বা শহীদের কাছে মুখ খুলুক। শহীদ ইয়াকুবের পালস দেখল। বিট হচ্ছে। আমান গাজী বলে উঠল, 'আমি খুন করিনি লোকটাকে।'

মি. সিম্পসন রুমে ঢুকলেন, শহীদ বলে উঠল, 'মি. সিম্পসন, এই ভদ্রলোককে হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন এখুনি। এর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

আমান গাজীকে ইন্সপেক্টর বোরহানের সঙ্গে থানা হাজতে পাঠিয়ে দিলেন মি. সিম্পসন। আমান গাজী কোন কথা বলল না যাবার সময়। চোখ জোড়া শুধু কুঁচকে রইল তার। যেন যন্ত্রণা হচ্ছে শরীরের কোথাও। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে কেমন যেন সন্তুষ্ট দেখাল।

ইয়াকুবের পকেট থেকে বুলেট, পেন্সিল, ছুরি, সিগার-দেশলাই, চাবি, মানিব্যাগ, দুটো ঘড়ির বাক্স, কিছু খুচরো পয়সা, চিরুনি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। চাবির গোছাটা ছাড়া আর কিছু প্রয়োজনে লাগবে না। মানিব্যাগের ভিতরে শতখানেক টাকা ছাড়া পাওয়া গেল মিস রোশনার একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটো। ফটোটা বহু দিন আগের তোলা, সম্ভবত কয়েক বছর আগের। ময়লা হয়ে কোণা ছিঁড়ে গেছে। ইয়াকুবের পকেটে বহুদিন থেকে আছে এটা, শহীদের ধারণা হল। কিন্তু এমন কিছু পাওয়া গেল না যা দেখে মিস রোশনা কোথায় আছে তা জানা যায়।

মি. সিম্পসন বললেন, 'শহীদ! ইয়াকুব জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।'

শহীদের চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল ও ইয়াকুবের দিকে। ড. মল্লিক খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলেন তাকে। চোখ পিট পিট করে তাকাল ইয়াকুব। শহীদ সামনে এসে দাঁড়াল, 'তোমার খেলা খতম হয়ে গেছে, ইয়াকুব। মিস রোশনা কোথায় বলো।'

শূন্য দৃষ্টিতে ইয়াকুব তাকাল শহীদের দিকে, 'আমি জানি না!'

'জানো, তুমি নিশ্চয়ই জানো। তুমিই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলে।'

ইয়াকুব উদাসভাবে বলে উঠল, 'বাজে কথা। আমি কিছু জানি না।'

এরপর শহীদ এবং মি. সিম্পসনের একটি কথারও উত্তর দিল না ইয়াকুব। থানায় যাবার পথে, থানায়, হাজত ঘরে—কোথাও মুখ খুলল না সে।

দশ

বিকেল বেলা মি. সিম্পসন ইয়াকুব সম্পর্কে তথ্য নিয়ে শহীদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ইয়াকুব একজন প্রাক্তন সৈনিক। অশিক্ষিত বলা চলে না। পারিবারিক ইতিহাস জানা যায়নি। খারাপ আচরণের জন্যে আর্মি থেকে বহিষ্কৃত। অপরাধজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হলেও, যাওয়া-আসা ছিল। বিভিন্ন চাকরি, ব্রোকারী করেছে—ছেড়ে দিয়েছে সবগুলোই কিছু দিন করে। একবার কুমিল্লা পুলিস সন্দেহ করেছিল ওকে ডাকাত দলকে খবরাখবর সংগ্রহ করে দেবার কাজ করে মনে করে। কখনও গ্রেফতার হয়নি। কিন্তু কয়েকজন ইন্সপেক্টর ওকে চেনে, সম্ভাব্য খারাপ লোক হিসেবে। রিভলভারটা সৈনিক জীবনে সংগ্রহ করেছিল সে। বুলেট কোথা থেকে পেত তা জানা যায়নি। কোন বাঁধন নেই জীবনে। আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে জানা যায়নি। মিস রোশনা ইরাকে যাবার সময় বাড়িটায় উঠে আসে সে। আগে একটা ছোট বাড়িতে থাকত কয়েকজনের সঙ্গে। মিস রোশনার বাড়িতে তার ঠাঁই পাবার কারণ অজ্ঞাত। কিন্তু এ বাড়িতে আসার পর তার আচরণ খুব রহস্যময়। বেশ কিছু টাকা খরচ করতে দেখা গেছে তাকে। ওর শোবার ঘরের তোশকের নিচে পাওয়া গেছে দেড় হাজার টাকা। ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে কখনও কেউ আসত না, একথা জানা গেছে। তবে আজ সকালে একজন দেখা করতে গিয়েছিল। সে হল আমান গাজী। আমান গাজী একজন লোককে জিজ্ঞেস করে বাড়িতে ঢুকেছিল। ইয়াকুবের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটির শব্দ দু'একজন শুনেছে। কুড়ি মিনিট পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে আমান গাজী। কিন্তু চলে যায় না সে। একটু পর ইয়াকুব সিগার কেনার জন্যে বের হয় বাইরে, আমান গাজী তাকে অনুসরণ করে।

শহীদ চিন্তিতভাবে বলল, 'মিস রোশনা ইয়াকুবকে চিনত এবং সে জানতে পেরেছিল ইয়াকুবই তাকে এবং তার ভাইকে আক্রমণ করে। আমার মনে হয় ইয়াকুব যা করেছে তা করানো হয়েছে টাকা দিয়ে। বেপরোয়া প্রকৃতির ও। ওকে দিয়ে কেউ কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে। মিস রোশনার বাড়িতে কেউ পাঠিয়েছিল ওকে, ওদেরকে আক্রমণও করিয়েছিল টাকা দিয়ে, মিস রোশনাকে অন্যত্র নিয়ে যাবার পিছনেও ওই একই কারণ। এবং আমাকে বা আমান গাজীকে আক্রমণ করেছিল ও ওই টাকার বদলেই। এসব ব্যাপারে ওর নিজের কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না আমার। সেই পোড়ো বাড়িতে মিস রোশনাকে ইয়াকুব বাধ্য করেছিল তার সাথে দেখা করতে। এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে শামিম হায়দার জানত ইয়াকুব কোথায় থাকে। সেই-ই সম্ভবত আমান গাজীকে জানায় ঠিকানাটা। শামিম হায়দারকে ইয়াকুব ব্ল্যাকমেল বা ওই জাতীয় কোন

অসুবিধের মধ্যে রেখেছিল, এই রকম একটা ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি যেন আমি। মি. সিম্পসন, মনে আছে তো যে গোলাম হায়দার একজন ব্ল্যাকমেলার ছিল। গোলাম হায়দার মি. জামিল হায়দারকে ব্ল্যাকমেল করত। ইয়াকুব হয়ত করত শামিম ও মিস রোশনা হায়দারকে। মিস্ রোশনার বাড়ি ব্যবহার করার অধিকারের পিছনে নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। যাই হোক, শামিম এবং মিস রোশনা চায়নি ইয়াকুব ধরা পড়ুক। এমনকি দু'জনে ইয়াকুবের হাতে আক্রান্ত হবার পরও স্বীকার করেনি যে আক্রমণকারীকে ওরা চেনে। এর মানে কি? এর মানে ওরা চায়নি পুলিসের কাছে ইয়াকুব মুখ খুলুক। কেন? ইয়াকুব মুখ খুললেই ওদের গোপনীয় কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। গোপনীয় কি এমন কথা যার জন্যে ব্ল্যাকমেল করতে পারছে ইয়াকুব ওদেরকে? শামিম হয়ত গোলাম হায়দার হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য জানে। বলা যায় না হয়ত সেই-ই তার চাচাত ভাইকে হত্যা করেছে। কেননা গোলাম হায়দার ব্ল্যাকমেল করত তার আব্বাকে। আব্বাকে ব্ল্যাকমেলিং থেকে বাঁচাতে গিয়ে হয়ত খুন করেই ফেলেছে সে গোলাম হায়দারকে। এদিকে পিতা ছেলেকে ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজেকে দোষী হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন অপ্রত্যক্ষভাবে। যদিও তিনি স্বীকার করেননি খুনের অভিযোগ। ওদের বিশ্বাস আসল খুনী কে তা আমরা জানতে পারব না, এবং মি. জামিল হায়দার যে আসল খুনী নন তাও স্বীকার করব আমরা শেষ পর্যন্ত। এবং মিস রোশনা ভাইকে রক্ষা করার জন্যে ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী সবকিছু চাপা দিয়ে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে।'

একটু থেমে শহীদ বলল আবার, 'কিন্তু আমার এই সব অনুমান নস্যাৎ করে দেয় অন্য একটি সত্য। সেটা হচ্ছে গোলাম হায়দার খুন হবার আগে থেকেই মিস রোশনার বাড়িতে ঠাঁই নেয় ইয়াকুব। সেক্ষেত্রে ব্ল্যাকমেল করার প্রশ্ন ওঠে না। অন্তত গোলাম হায়দারের খুনের ব্যাপারকে মূলধন করে সম্ভব হয় না। কেন না গোলাম হায়দার তখনও নিহত হয়নি। এবং আর একটা ব্যাপার মোহাম্মদ আমান গাজী এসবের মধ্যে কেন এসেছে? ইয়াকুব যখন দৌড়ে পালাতে শুরু করে তখন সে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল প্রায়। ওকে ধাক্কা মেরে ছুটতে শুরু করি আমি। ওকি তাহলে ইয়াকুবকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছিল? তাছাড়া ইয়াকুব যখন ধরা পড়ল তখন এমন অস্বাভাবিক ভাবে তাকে আঘাতের পর আঘাত করার কারণ কি? আমার যেন সন্দেহ আমান গাজী ইয়াকুবকে খুন করতে চেয়েছিল। যাতে সে আমাদের কাছে কোন কথা বলার সুযোগ না পায়।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'দেখো শহীদ, আমি স্বীকার করছি এই কেসের সমাধান আমার দ্বারা অসম্ভব। এমন জটিল এবং রহস্যময় ব্যাপার বড় একটা দেখা যায় না। তুমি যেমন বোঝো তেমন করো। আমার শুধু একটা বক্তব্য। আমান গাজী সম্পর্কে প্রয়োজন মত সাবধান থেকো। বিদেশী লোক। দু'দেশের সাথে

খারাপ সম্পর্কের সৃষ্টি যেন না হয়।'

শহীদ বলল, 'ধন্যবাদ, মি. সিম্পসন। সে কথা আমি জানি বৈকি।'

মি. সিম্পসন বিদায় নিলেন খানিক পর। শহীদও বের হল বাইরে।

জেল হাজতে আমান গাজীর সঙ্গে দেখা করতে এল শহীদ। আমান গাজী জেল হাজতে আছে বটে, কিন্তু আরামদায়ক বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে তাকে। শহীদ প্রথম প্রশ্ন করল, 'আপনি যখন শামিম হায়দারের কাছে ইয়াকুবের ঠিকানা পেলেন তখন আমাকে খবর না দিয়ে নিজে বাহাদুরী ফলাতে গিয়েছিলেন কেন, মি. গাজী? কেনই বা আপনি আমার পথরোধ করে ইয়াকুবকে পালাবার সুযোগ করে দিতে চাইছিলেন, এবং অবশেষে ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিলেন, মি. গাজী?'

আমান গাজী হতচকিত হয়ে বলে উঠল, 'আপনার পথরোধ করার চেষ্টা করিনি আমি, ইয়াকুবকে পালাবার সুযোগও করে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। আর ওকে মেরে ফেলতেই বা চাইব কেন আমি? ভীষণ রাগ হয়ে গিয়েছিল, তাই এলোপাতাড়ি মারছিলাম আর কি! আপনি ভুল বুঝলে আমার কিছু করার নেই। আমার বক্তব্য এই মুহূর্তে জানিয়ে দিতে চাই আমি। আগামী তিন ঘন্টা সময় দেব আপনাকে আমি। তারপর এমব্যাসিতে খবর পাঠিয়ে একজন অ্যাটর্নি চাইব। কোন সন্দেহ করবেন না, আমি সাহায্য পাব জানি বলেই এমব্যাসির সাহায্য চাইব। আমাকে কেন্দ্র করে যদি দুই বন্ধু দেশের মধ্যে গোলমাল বাধাবার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে আটকে রাখুন।'

শহীদ বলল, 'আপনাকে আটকে রেখেছি, এটার চেয়ে স্বস্তিকর আর কিছু জানা নেই আমার।'

শহীদ বের হয়ে এল জেল হাজত থেকে। এবার ও উপস্থিত হল মি. জামিল হায়দারের সেলে।

মি. জামিল পেশন্স খেলছিলেন। শহীদকে দেখে খেলা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। কার্ডগুলো গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। শহীদ প্রশ্ন করল, 'মি. জামিল, দুটো প্রশ্ন এর আগে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। প্রশ্ন দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম প্রশ্ন—আপনি কি নিজেকে নির্দোষী প্রমাণ করার জন্যে চেষ্টা করবেন কোর্টে?'

'নিশ্চয় করব, একশোবার!'

'তাহলে কাকে আপনি আড়াল করবার, বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? আপনি গোলাম হায়দারকে হত্যা না করে থাকলে আর কে তাকে হত্যা করতে পারে? কে সে? কাকে আপনি রক্ষা করতে চাইছেন?'

'কাউকে নয়, মি. শহীদ,' জামিল হায়দার গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন।

শহীদ বলল, 'আপনি যদি অপরিচিত কাউকে রক্ষা করার প্রয়াস পান তার

ফল দাঁড়াবে আপনার মৃত্যু। এবং তা অপমানকরও বটে আপনার জন্যে।'

মি. জামিল পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কাউকে নয়, মি. শহীদ।'

শহীদ বলল, 'বেশ। আচ্ছা, ইয়াকুব নামে কাউকে চেনেন কি আপনি?'

'না। ওই নামের লোক একজন সিনেমায় আছে হয়ত। কাউকে চিনি না।'

শহীদ জানতে চাইল, 'মোহাম্মদ আমান গাজী?'

মি. জামিল হায়দার এমন অস্বাভাবিকভাবে চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালেন শহীদের দিকে যে, তাঁর শরীরের ধাক্কা লেগে টেবিলের উপর থেকে কার্ডগুলো পড়ে গেল মেঝেতে।

এগারো

শহীদের সঙ্গে যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে মি. জামিলের ততবারের মধ্যে এই প্রথমবার চমকে উঠলেন তিনি ভয়ানকভাবে। শহীদ মৃদুস্বরে বলে উঠল, 'কি জানেন আপনি আমান গাজী সম্পর্কে, মি. জামিল?'

মি. জামিল হায়দার শহীদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'কিছুই বলতে পারব না আমি। কোন সাহায্যই করতে পারব না আমি আপনাকে। দুঃখিত।'

'আমি আপনাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছি, কথাটা ভুলে যাবেন না, মি. জামিল।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার চেষ্টা করছেন।'

শহীদ বলল, 'ওটা আমার কাজ নয়। আমার কাজ আপনার সুবিচার যাতে হয় তার চেষ্টা করা। আপনি অপরাধ হলে শাস্তি পাবেন, পাওয়াবার চেষ্টা করব আমি। আপনি নিরপরাধ হলে মুক্তি পাবেন, এবং মুক্তি যাতে পান সেই চেষ্টাই করব আমি।'

'আমার লয়ার সে-কাজ আরও ভাল ভাবে করবে।'

'সম্ভব হবে না, যদি আপনি তথ্য লুকিয়ে রেখে সব কথা খুলে না বলেন।'

মি. জামিল বললেন, 'আমি যা বলেছি তার বেশি বলতে রাজি নই, মি. শহীদ।'

শহীদ দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। বলল, 'অন্য কারও খাতিরে মৃত্যুবরণ করাটা খুব বড় ব্যাপার, মি. জামিল। কিন্তু...থাক!'

কুয়াশা ৩৩

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৭২.

এক

জেল হাজতে মি. জামিল হায়দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর শহীদ এগারো নম্বর চাঁন অ্যাভিনিউয়ে উপস্থিত হল। মিসেস জামিলের সঙ্গে কথা বলবে ও। মি. জামিল হায়দারকে গ্রেফতার করার দিন যে চাকরানীকে দেখেছিল শহীদ সে-ই দরজা খুলে দিল কলিংবেল টিপতে। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বিবিসাহেব কেমন আজ রাতে?'

'খানিকটা ভাল, হুজুর। ড্রয়িংরুমে আছেন উনি। সেই ঘটনার পর থেকে আজই প্রথম নিচের তলায় নেমেছেন বিবিসাহেব।'

সেই ঘটনাটা মানে মি. জামিল হায়দারকে গ্রেফতার করার ঘটনাটা। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'নার্স কোথায়?'

পুলিস বিভাগ থেকে একজন নার্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে মিসেস জামিলের দিকে নজর রাখার জন্যে। মিসেস জামিলের মেয়ে মিস রোশনার অনুরোধেই এটা করা হয়েছে। মিস রোশনা অদ্ভুতভাবে সন্দেহ পোষণ করে যে তার আম্মা দুশ্চিন্তায় আত্মহত্যা করতে পারে। কিন্তু শহীদের বিশ্বাস, মিসেস জামিলকে কেউ খুন করার চেষ্টা করতে পারে এই সন্দেহ পোষণ করে মিস রোশনা মনে মনে।

'নার্স বিবি সাহেবের সঙ্গেই আছে।'

'খবর দাও আমি দেখা করতে চাই ওঁর সাথে।'

চাকরানী চলে গেল শহীদকে হলঘরে রেখে। খানিক পর ফিরে এল সে। শহীদ চলল তার পিছু পিছু। ধনী লোকদের বাড়ির ইউরোপিয়ান ফর্মালিটিগুলো অপরিবর্তনীয়। একটার পর একটা দরজা খোলা হল এবং ঘোষণা করা হল সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রবেশ করছেন। অবশেষে ড্রয়িংরুমের সামনে শেষ ঘোষণাটি উচ্চারিত হবার পর শহীদ দেখা পেল মিসেস জামিল হায়দারের।

বিরাট বড় ড্রয়িংরুম। তিন রঙের বিভিন্ন আকৃতি এবং কাঠামোর তৈরি সোফা সেট। জানালায় দামী পর্দা। মেঝের কার্পেটটা কাশ্মীরী। মিসেস জামিল হায়দারের পায়ের কাছে একটা কালো কুচকুচে বিড়াল বসে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে শহীদের দিকে। মিসেস জামিল বিড়ালটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বসুন, মি. শহীদ।'

'ধন্যবাদ।'

কার্ড খেলা সম্ভবত হায়দার ফ্যামিলির নিয়মিত রুটিন। মিসেস জামিল নার্সের সঙ্গে পিকেট খেলছিলেন, বত্রিশটা কার্ডের খেলা, দু'জনার। পাশের টেবিলে শেরির বোতল এবং গ্লাস। মিসেস জামিল মদ্যপানে অভ্যস্ত, জানত শহীদ। মিসেস জামিলকে দেখে রীতিমত আশ্চর্য হল আজ শহীদ। আজ ভদ্রমহিলাকে অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে। শহীদকে আসন গ্রহণ করতে বলে প্রশ্নবোধক চোখ তুলে তাকালেন, বললেন, 'আশা করি আমার জন্যে সুখবর নিয়ে এসেছেন?'

'আমি একটা কি দুটো প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে, সেগুলোর উত্তর পেলে উপকার হবে মি. জামিলের। আপনি কি কখনও ইয়াকুব নামে কোন লোকের খবর জানতেন?'

উত্তর যেন তৈরি হয়েই ছিল, 'না। কখনও শুনিনি ও নাম, দেখার প্রশ্নও ওঠে না।'

'ধন্যবাদ। আপনি কি কখনও মোহাম্মদ আমান গাজীর নাম শুনেছেন? একজন ইরাকী ভদ্রলোক?'

মি. জামিলের মতই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন মিসেস জামিল আমান গাজীর নাম শোনা মাত্র। শান্ত ভাবটুকু নিমেষে উবে গেল তাঁর মুখাবয়ব থেকে। দারুণ আতঙ্ক স্থান দখল করল মুখের চেহারায়।

আতঙ্ক? না, ঘৃণা?

মিসেস জামিল শক্ত হাতে চেপে ধরেছেন চেয়ারের দুটো হাতল। চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছেন। কোন কথা বললেন না। চোখের ভাষা লুকিয়ে রাখার জন্যেই যেন বন্ধ করে রেখেছেন পাতা দুটো। নার্স এক পা এগিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখল একটা। তিনি চোখ মেলে চেষ্টাকৃত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বহুদিন আগে, মি. শহীদ, আমি একজন মোহাম্মদ আমান গাজীকে চিনতাম। সে আমাদের বন্ধু ছিল। কেন জিজ্ঞেস করছেন আপনি তার কথা?'

'তার কাছ থেকে কোন খবরাখবর পেয়ে আসছেন?'

'না।'

'কতদিন আগের ব্যাপার সেটা?'

'অনেক বছর আগের কথা। সে চলে যায় ইরাকে বসবাস করার জন্যে।'

'আজ কত বছর বয়স হবে তার?'

মিসেস জামিল খানিক চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, 'পঞ্চাশ বা পঞ্চান্নর কম নয়।'

শহীদ চমকে উঠল। ঢাকায় যে মোহাম্মদ আমান গাজী এসেছে ইরাক থেকে তার বয়স আটাশ থেকে ত্রিশ, তার বেশি নয়। সে জানিয়েছে মিস রোশনার সাথে তার ইরাকে দেখা হবার পর প্রেমে পড়ে সে। রোশনা বিপদে পড়েছে শুনে ছুটে এসেছে। তাহলে এই বয়স্ক মোহাম্মদ আমান গাজী কে? ইরাকে একই পরিবারের

দু'জনের নাম কোন কোন সময় একই রকম রাখা হয়। তবে কি বয়স্ক আমান গাজীর ছেলে ঢাকায় উপস্থিত এই আমান গাজী?

মিসেস জামিল আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন।

বাড়িতে ফিরে আধঘন্টা চিন্তিতভাবে বসে রইল শহীদ সিগারেট টানতে টানতে। তারপর ফোন করল মিসেস জামিলের নার্সকে। নার্স অপর প্রান্ত থেকে বলল, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

'শহীদ খান।'

নার্স প্রায় উত্তেজিত গলায় জানাল, 'আমি প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম আপনি ফোন করবেন, মি. শহীদ। আপনি যাবার পরপরই মিসেস জামিল অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি আমি। বিছানায় শুয়ে আছেন উনি এখন। খুব বেশি অসুস্থ দেখাচ্ছে। আমার বিশ্বাস আপনার কথা শোনার প্রতিক্রিয়া এটা।'

শহীদ বলল, 'কোন মন্তব্য করেছেন আমি চলে আসার পর?'

'না। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জানানো দরকার, মি. শহীদ। আমি ওঁর ডেস্কে এবং রাইটিং টেবিলের কাছে গিয়েছিলাম একবার। দুটো চিঠি দেখতে পেয়েছি আমি। দুটোতেই "মোহাম্মদ আমান গাজীর" সই আছে। সাধারণত যে কাগজে চিঠি লেখা হয় এ দুটো তেমন নয়, ইরাক থেকে এসেছে এ দুটো। তারিখ নেই। মিসেস জামিলের উদ্দেশ্যে লেখা।'

শহীদ জানতে চাইল, 'চিঠির বক্তব্য কি?'

'সাধারণ বক্তব্য। যেন পরিবারের পরিচিত কেউ ভালমন্দ খবর নেবার জন্যে চিঠি দুটো লিখেছে। ইরাকের হোটেল কমোডোরের প্যাডে লেখা চিঠি দুটো।'

শহীদ বলল, 'আমি লোক পাঠাচ্ছি, চিঠি দুটো পাঠিয়ে দিয়ো। আর, হ্যাঁ, কান সব সময় খাড়া করে রাখবে তুমি। আমান গাজী এবং ইয়াকুব—এই দু'জনার নাম এবং কথা কেউ বলে কিনা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল রাখবে।'

'আর একটা কথা, মি. শহীদ। আমি একটা রসিদ পেয়েছি। প্রায় তিন বছরের পুরানো রসিদ। প্রফেশনাল ডিটেকটিভ আবিদ চৌধুরীকে টাকা পেমেন্ট করার রসিদ। মিসেস জামিল আবিদ চৌধুরীকে কোন কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তাই ধারণা হয় না কি?'

'তা বটে। কিন্তু আবিদ চৌধুরী মারা গেছেন। এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না, যদি মিসেস জামিল নিজে না জানান। এবং জানাবেন না, আমি জানি। আচ্ছা, রাখছি। দরকার মনে করলেই খবর দিয়ো আমাকে।'

শহীদ রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর কি ভেবে মি. সিম্পসনকে ফোন করল ও। মি. সিম্পসন অপরপ্রান্তে এলেন। শহীদ বলল, 'মি. আমান গাজীকে দিয়ে একটা স্টেটমেন্ট সই করিয়ে নিন এখুনি। স্টেটমেন্ট সই করিয়ে নেবার আধঘন্টা পর ছেড়ে দেবেন ওকে হাজত থেকে, তার আগে নয়। যে-সব ঘটনার

সাথে ও জড়িত সেগুলো সম্পর্কে ওর বিবৃতিটায় সই করিয়ে নেবেন। সই করিয়ে এখুনি সেটা পাঠিয়ে দিন আমাকে। ওর হাতের সইটা দেখতে চাই আমি নিজের চোখে। ওটার সাথে আর একজন আমান গাজীর হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে চাই আমি।'

'আর একজন আমান গাজী? কি বলছ তুমি শহীদ?'

শহীদ মি. এবং মিসেস জামিলের সাথে ওর সাক্ষাৎকারের কথা বলল। নার্সের চিঠি পাবার কথাটা যোগ করল সব শেষে। মি. সিম্পসন ফোন ছেড়ে দিলেন নিশ্চিন্ত ভাবে।

খানিক পরই ফোন করলেন মি. সিম্পসন শহীদকে, 'স্টেটমেন্ট সই করেছে আমান গাজী। খানিক পরই ছাড়ব ওকে। ও বলছে ছাড়া পেয়ে শামিম হায়দারের বাড়িতে উঠবে ও।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। স্টেটমেন্টটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন আমাকে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'লোক পাঠিয়ে দিয়েছি তোমার বাড়ির উদ্দেশে। পৌঁছে যাবে এখুনি। ছাড়ছি।'

ফোন ছেড়ে দিল শহীদও। সাত মিনিট পর একজন কনস্টেবল এল স্টেটমেন্টটা নিয়ে। শহীদ মোহাম্মদ আমান গাজীর সইটা দেখল। এবার মিলিয়ে দেখা দরকার মিসেস জামিলের কাছে ইরাক থেকে যে মোহাম্মদ আমান গাজীর চিঠি এসেছে তার হাতের লেখার সাথে। কিন্তু গফুরকে পাঠাবে ভেবেছে শহীদ নার্সের কাছ থেকে চিঠিগুলো আনার জন্যে, অথচ গফুর গেছে মহুয়া আর লীনার সাথে কামালের জন্যে মার্কেটিং করতে। কামাল খানিকটা সুস্থ হয়েছে। খবর দিয়েছে কুয়াশা মহুয়াকে ফোন করে। যে-কোন দিন যে-কোন সময় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে কুয়াশা কামালকে। মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে কামাল। বাড়ি ফিরলে যত্ন করতে হবে ওকে, তাই ভেবে মার্কেটিং করতে বের হয়েছে ওরা।

ওরা ফিরল পনেরো মিনিট পরই। শহীদ গফুরকে ডেকে বলল, 'এগারো নম্বর চাঁন অ্যাভিনিউয়ে এখুনি একবার যা তুই। ওখানে যে নার্সটা আছে সে দুটো চিঠি দেবে, সেগুলো খুব সাবধানে নিয়ে আসবি। দেখিস কেউ যেন তোকে না দেখে। আর হাত ছাড়া করবি না চিঠি দুটো।'

গফুর মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বের হয়ে গেল বাড়ি থেকে।

এগারো নম্বর চাঁন অ্যাভিনিউয়ে নিরাপদেই পৌঁছুল গফুর। নার্সের কাছ থেকে একটা খাম নিল, খামের ভিতর চিঠি দুটো আছে। খামটা মুঠোর ভিতর নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে এল। খুব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে খামটা দাদামণি বার বার করে বলে দিয়েছে। গফুর এদিক ওদিক তাকাল। না, কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হল না। এবার জোরে জোরে পা চালাল ও। যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে

পৌঁছুনো যায় ততই ভাল।

হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে পৌঁছে গেল গফুর বিশ মিনিটের মধ্যে। মনে মনে স্বস্তিবোধ করল ও। দশাসই শরীরটা হাঁটার ক্লান্তিতে ঘেমে নেয়ে গেছে। তা যাক, কাজটা দাদামণির আদেশ মত যথাযথ করেছে সে।

বাড়ির গেট অতিক্রম করে বুক পকেটে হাত দিল গফুর খামটা আছে কি না দেখবার জন্যে। আছে। পকেট থেকে হাতের মুঠোয় রাখল ও সেটা। উঠানটা অন্ধকার। যাবার সময় গেট বন্ধ করে গিয়েছিল ও বাইরে থেকে, বাতিও নিভিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকার উঠান ধরে বারান্দার দিকে এগোতে লাগল গফুর।

গফুর বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছুতেই এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটল। বারান্দার থামের আড়াল থেকে একটি ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়ল তার উপর। ছায়ামূর্তিকে দেখার আগেই বেকায়দায় পড়ল গফুর। ছায়ামূর্তির হাতে একটি চটের থলে ছিল। সেই থলেটা চোখের পলকে গফুরের মাথায় গলিয়ে দিয়েছে ছায়ামূর্তি।

আক্রান্ত হয়েই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল গফুর। বাড়ির ভিতর কেউ তাকে এমন অদ্ভুতভাবে আক্রমণ করবে তা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। কিন্তু বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠল সে পর মুহূর্তেই। তারপর সে দু'হাত মাথার উপর তুলে থলেটা মাথা থেকে খোলবার চেষ্টা করল। আক্রমণকারীর তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই দেখে অবাক হয়ে গেল গফুর। দ্রুত খুলে ফেলল ও মাথা থেকে থলেটা। চোখ মেলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল ও। চোখ দুটো ভয়ঙ্কর ভাবে করকর করে জ্বালা করে উঠল। একরাশ বালি ছুঁড়ে দিয়েছে বদমাশ আক্রমণকারী ছায়ামূর্তি। হাত দিয়ে ঘষতে লাগল গফুর চোখ দুটো। খামটা পড়ে গেল হাত থেকে। এমন সময় গফুর চিৎকার করে উঠল আর্তকণ্ঠে, 'দাদামণি!'

কয়েক সেকেণ্ড পরই শহীদ ও মহুয়া দরজা খুলে ছুটে এল গফুরের কাছে। গফুরের অবস্থা দেখে মহুয়া পানি নিয়ে এল এক বালতি। শহীদ বাড়ির উঠানে দেখতে পেল না কাউকে। ও শুধু লক্ষ করল সদর দরজাটা খোলা। আর গফুরের পাশে পড়ে রয়েছে একটা টর্চ আর একটা থলে। ও দুটো কার চিনতে পারল না শহীদ। পানি ছিটিয়ে গফুরের চোখ জোড়া বালি-মুক্ত করতে লাগল মহুয়া।

গফুর খানিক পরই চোখ মেলে তাকাতে পারল। চোখ জোড়া টকটকে রক্তবর্ণ ধারণ করছে ওর। শহীদ প্রশ্ন করল উদগ্রীব কণ্ঠে, 'কি করে অমন হল গফুর?'

গফুর যা যা ঘটেছে সব বলল। শহীদ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, 'সেকি! বাড়ির ভিতর আক্রমণ করার জন্যে কে ওত পেতে থাকতে পারে! চিঠি দুটো তুই নিয়ে আসছিস একথা সে জানলই বা কিভাবে!'

গফুর বলল, 'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না, দাদামণি।'

শহীদ ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে ডেস্কের ড্রয়ার টেনে দেখল। আমান গাজীর সই

করা যে স্টেটমেন্ট মি. সিম্পসন লোক মারফত পাঠিয়েছিলেন সেটা শহীদ ডেস্কের ড্রয়ারে রেখেছিল। শহীদ দেখল সেটা ড্রয়ারে নেই। হঠাৎ জানালাগুলোর দিকে তাকাল শহীদ। ওর সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হল। শহীদ দেখল একটা জানালার শিক বাঁকিয়ে নিঃশব্দে ড্রয়িংরুমে ঢুকেছিল কেউ। সে-ই চুরি করে নিয়ে গেছে স্টেটমেন্টটা। ওই একই চোর গফুরকে আক্রমণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মানে চোর অনেকক্ষণ ধরে আড়ি পেতে শুনেছে শহীদের সাথে নার্সের এবং শহীদের সাথে মি. সিম্পসনের ফোনের মাধ্যমে কথাবার্তাগুলো। তা না হলে চিঠিগুলোর কথা জানতে পারল সে কিভাবে?

শহীদ বলল, 'গফুর, তুই বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিলি?'

গফুর মাথা নাড়ল।

শহীদ বলল, 'চোর দরজা খুলে পালিয়ে গেছে। যা দরজাটা দিয়ে আয়।'

গফুর দরজা দিতে চলে গেল।

দুই

আধঘন্টা পর শহীদ শুনতে পেল গফুরের অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠস্বর। গফুর কথা বলছে যেন কার সাথে। মহুয়া আর লীনা যে যার রুমে শুয়ে পড়েছে। শহীদ একা সিগারেট টানছে ড্রয়িংরুমে। গফুর সম্ভবত কিচেনরুমে কফি তৈরি করছে শহীদের জন্যে। কার সাথে অমন গম্ভীরস্বরে কথা বলছে গফুর?

শহীদ ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে ভিতর দিকে পা বাড়াল। ধীরে ধীরে কিচেনরুমের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ও। দেখল গফুর কেটলিতে পানি চাপিয়ে চুলোয় দিয়েছে। আর নাছোড় বান্দা ডি.কস্টা একটা টুলে বসে হাঁটু জোড়া নাচাতে নাচাতে গফুরকে বলছে, 'কিন্টু হামি কি টোমার কাছে কোন অপরাঢ করিয়াছি? কেন টুমি হামার সাথে হমন গম্ভীর ভাবে কঠা বলিটেছ?'

গফুর গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'বকবক কোরো না বলছি, ডি.কস্টা, আমার মন মেজাজ খুব খারাপ এখন।'

'টা টো বুঝিলাম। মাগার, কি কারণে টোমার মুড খারাপ টা টো বুঝিলাম না। হামাকে যডি টুমি সকল প্রোবলেম খুলিয়া বলিটে, টাহা হইলে হয়টো টোমার কোন উপকার করিটে পারিটাম।'

গফুর বিরক্ত ভরে বলে উঠল, 'আরে ছোঃ। তুমি আবার আমার কি উপকার করতে পারবে শুনি! তা আসল কথা বলো, এতরাতে আজ আবার এখানে আসা হয়েছে কেন?'

ডি.কস্টা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'টুমি টো জানোই গফুর, হামাকে ডিটেকটিভ হোটেই হোবে। টাই টোমার নিকট হইটে মি.

শহীড খান সম্পর্কে দুই চারিটি মূল্যবান কঠা শুনিটে ইন্টারেস্টেড হামি। কিন্টু, আজকের বিষয় ভিন্ন, আজ হামি স্রেফ টোমার উপকার করার জন্যই আসিয়াছি। বলো ডেখি এবার কি টোমার প্রোবলেম?'

গফুর কথা না বলে চুপ করে রইল। ডি.কস্টা নরম সুরে বলে উঠল, 'আরে, লজ্জা কিসের! বলো টুমি!'

গফুর একটু ইতস্তত করে বলতে শুরু করল তার আক্রান্ত হবার ঘটনাটা। মিনিট তিনেক লাগল গফুরের সব কথা বলতে। ঘটনাটা শুনে গফুরের প্রতি সহানুভূতিতে বিষণ্ন হয়ে উঠল ডি.কস্টার মুখের চেহারা, চোখের দৃষ্টি। ডি.কস্টা বলে উঠল তারপর, 'টুমি আলবৎ কিচ্ছুটি ভাবিও না! হামি টোমার সকল প্রোবলেম ডুর করিয়া ডিব। টুমি হামার ঢার শোড করিয়া ডাও ডেখি, মনে আছে টো ম্যাঙ্গো খাওয়াইয়াছিলাম গট হপ্টায় টোমাকে?'

গফুর চোখ বড় বড় করে বলে উঠল, 'গত সপ্তাহে তুমি আম খাইয়েছিলে, আর তার পয়সা চাইছ তুমি আজ! সেকি কথা, পয়সা চাইবে জানলে তোমার আম আমি তো খেতাম না!'

ডি.কস্টা নির্বিকার কণ্ঠে বলে উঠল, 'কি আর করা যাইটে পারে, ঢার টো শোড করিটেই হইবে! ম্যাঙ্গো টো ফেরট ডিটে পারিবে না, হজম হইয়া গেছে!'

গফুর পকেট থেকে পয়সা বের করতে করতে রাগত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ইংরেজরা বেনিয়ার জাত, আর তুমি তো আধা ইংরেজ—ডবল হারামী! বলো কত দাম তোমার আমের।'

ডি.কস্টা গম্ভীর ভাবে বলে উঠল, 'জাট টুলে গাল ডেবে না বলে ডিচ্ছি। বারো আনা।'

গফুর বারো আনা পয়সা মেঝেতে সশব্দে ফেলে দিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠল, 'দূর হয়ে যা, শয়তান। আর যদি তোকে কখনও এখানে দেখি তাহলে…তাহলে…!'

ডি.কস্টা বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'হায় টোমার উপকার করার জন্যে হামি এটো কিছু করিলাম আর টুমি হামাকে গালি পাড়িটেছ। লিসেন, গফুর, টোমার প্রোবলেম ডুর করিয়া ডিটেছি। শুঢু টোমারই না, টোমার ডাডামণি মি. শহীড খানের প্রোবলেমও ডুর করিয়া ডিব! এই নাও, এই খামটা রাখো। গুডবাই।' ডি.কস্টা গফুরের সামনে একটা খাম ফেলে রেখে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল।

শহীদ জানালা দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল সব। ডি.কস্টার কথা শুনে কিছু একটা ধারণা করেছিল ও, খামটা দেখে ধারণাটা সত্য প্রমাণিত হল। ড্রইংরুম থেকে এই খামটাই খানিক আগে চুরি হয়ে গিয়েছিল।

শহীদ গফুরের উদ্দেশে বলে উঠল, 'গফুর, ডি.কস্টাকে ধরে আনত!'

ডি.কস্টা পিছন ফিরে শহীদকে দেখেই প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়ুতে শুরু করল।

গফুর যখন কিচেনরুমের দরজার সামনে এসেছে ততক্ষণে ডি.কস্টা গেট খুলে রাস্তায় নেমে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। শহীদ হাত নেড়ে গফুরকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'পালিয়েছে শয়তানটা! দে দেখি খামটা। কেন ও এমন আশ্চর্য কাণ্ড করল বুঝতে পারছি না।'

গফুর খামটা তুলে শহীদের হাতে দিল। শহীদ ড্রয়িংরুমে ফিরে এল সেটা নিয়ে। সোফায় বসে সিগারেট জ্বালিয়ে আপন মনেই ও একটু হাসল। তারপর খুলল ডি.কস্টার দিয়ে যাওয়া খামটা।

খামটা খুলে শহীদ দেখল ভিতরে ড্রয়িংরুম থেকে চুরি হয়ে যাওয়া ঢাকায় অবস্থানরত আটাশ বছরের মোহাম্মদ আমান গাজীর সই করা স্টেটমেন্ট এবং নার্স কর্তৃক গফুরের হাতে পাঠানো এবং গফুরের হাত থেকে আক্রমণকারী কর্তৃক ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া ইরাক থেকে পাঠানো ষাট বছরের মোহাম্মদ আমান গাজীর লেখা চিঠি দুটো রয়েছে। তা ছাড়াও রয়েছে কুয়াশার লেখা কয়েকটা তথ্য। তথ্যগুলো শহীদের দরকার। দুই আমান গাজীর হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে চায় শহীদ, দু'জন একই লোক না আলাদা লোক। সে কাজ কুয়াশাই করে দিয়েছে। কুয়াশা লিখেছে ইরাক থেকে ঠিকানাবিহীন চিঠি দুটো লিখেছে একজন ষাট বছরের লোক, কোন সন্দেহ নেই এতে এবং স্টেটমেন্টটা যে সই করেছে তার বয়স ত্রিশের বেশি হতে পারে না।

শহীদ দেখল ইরাক থেকে পাঠানো বয়স্ক আমান গাজীর চিঠি দুটো অতি সাধারণ ভাষায় এবং সাধারণ বিষয়ে লেখা। যেন বহুদিনের পরিচিত জনের কাছে কুশল জানিয়ে কুশল কামনা করা ছাড়া আর কিছু না।

গফুর কফির পেয়ালা নিয়ে ঢুকল ড্রয়িংরুমে। শহীদ বলল, 'শয়তান ডি.কস্টাই তোকে আক্রমণ করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চিঠি দুটো।'

গফুর গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, 'কেন?'

শহীদ বলল, 'কেন আবার! শখের ডিটেকটিভ হবার সাধ হয়েছে যে তার। যেচে পড়ে আমার কোন কাজ করে দিতে পারলে ওর প্রতি আমি সন্তুষ্ট হব এবং হয়ত ভাবছে ওকে আমার সহকারীও করে নিতে পারি—তাই। লুকিয়ে আমাদের অনেকগুলো কথা শুনে চিঠিগুলো নিয়ে কি করতে হবে বুঝে ফেলেছিল শয়তানটা। চিঠিগুলো বাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কুয়াশার কাছে। তার হাতেপায়ে ধরে আমার কাজটা তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে এসেছে। যাক, ওকে আবার তুই মারধর করতে যাসনে। একেই তো রোগা, তার ওপর তোর হাতের মার খেলে ভয়েই মরে যাবে ও। তবে বেশি ধারেকাছে ঘেঁষতে দিবি না ওকে অপ্রয়োজনে।'

গফুর গম্ভীর স্বরে বলল, 'ওকে আমি অন্যভাবে শাস্তি দেব।' কথাটা বলে শহীদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই বিশাল দেহটা নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল গফুর।

মি. সিম্পসন ফোন পেলেন কনস্টেবল আবিদ আলীর।

আবিদ আলী কোথাও যে পাহারা দিচ্ছে একথা স্মরণ ছিল মি. সিম্পসনের, কিন্তু ঠিক নির্দিষ্ট কোন জায়গায় তা মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছেন। আবিদ আলী বলল, 'স্যার, ওরা গাড়ি নিয়ে বাইরে বের হবার তোড়জোর করছে।'

'ওরা কারা?'

'শামিম হায়দার আর মোহাম্মদ আমান গাজী। শামিম হায়দার গাড়ি পরীক্ষা করে তেল ভরার জন্যে লোক ডেকে পাঠিয়েছে গ্যারেজ থেকে, ওদের কথা শুনতে পেয়েছি আমি। মনে হচ্ছে দূরে কোথাও যাবার ব্যবস্থা করছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'এখুনি আসছি আমরা। সম্ভব হলে ওদেরকে দেরি করিয়ে দেবার চেষ্টা করো, কিন্তু সাবধানে!'

কথাটা বলেই শহীদকে ফোন করলেন মি. সিম্পসন। শহীদকে ওর বাড়ি থেকে তুলে নেবেন মি. সিম্পসন, কথা হল। মি. সিম্পসন ঢাকার প্রতিটি পেট্রল কারকে নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা করলেন প্রয়োজনীয় হুকুম জারি করে। পেট্রল কারগুলো শামিম হায়দারের টয়োটা বা আমান গাজীর মরিস গাড়ি দেখতে পেলেই অনুসরণ করবে। অবশ্যই নিজেদেরকে লুকিয়ে।

শহীদকে বাড়ি থেকে তুলে নিলেন মি. সিম্পসন। সীট বদল করে ড্রাইভিং সীটের পাশে বসলেন তিনি। রেডিওর ব্যবস্থাসম্পন্ন স্কোয়াড কারের ড্রাইভিং সীটে বসে বিদ্যুৎবেগে ছেড়ে দিল শহীদ গাড়ি।

শামিম হায়দারের বাড়ির কাছে পৌঁছুবার আগেই শহীদ দেখল একটা টয়োটা করোনা ছুটে আসছে। রাস্তার পাশে জীপটা দাঁড় করাল শহীদ। মি. সিম্পসন তাড়াতাড়ি একটা ডেলি নিউজ-পেপার তুলে মুখ ঢাকলেন। শহীদ সিগারেট জ্বালাবার ভঙ্গিতে দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল। টয়োটা ওদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। শহীদ দেখল শামিম হায়দার এবং আমান গাজী সামনের সীটে পাশাপাশি বসে রয়েছে। ওদেরকে লক্ষ করেনি।

জীপের মুখ ঘুরিয়ে টয়োটাকে অনুসরণ করে চলল শহীদ।

এয়ারপোর্ট পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে টয়োটা।

দেখতে দেখতে আড়াই ঘন্টা পেরিয়ে গেল। সোজা ময়মনসিংহের দিকে এগিয়ে চলেছে টয়োটা। মধুপুর খুব বেশি দূরে নয় আর।

সামনেই একটা মোড়। মি. সিম্পসন তীক্ষ্ণ চোখে মোড়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাদের অন্য একটা গাড়ি মোড়ে অপেক্ষা করছে। গাড়ি বদলানো যেতে পারে।'

মোড়ের সামনে জীপ থামিয়েই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ওরা। পুলিসের একটা ফোক্সওয়াগেন অপেক্ষা করছিল। দ্রুত চড়ে বসল ওরা, ড্রাইভারকে জীপ নিয়ে ফিরে যাবার ইঙ্গিত জানালেন মি. সিম্পসন। গাড়ি ছেড়ে দিল শহীদ। শামিম হায়দারের মরিসটাকে দেখা যাচ্ছে না। হয়ত কোনদিকে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাবে কোথায়, পুলিসের অন্যান্য পেট্রল কার নজর রাখছে নিশ্চয়। শহীদ নয়-দশ মিনিট ধরে সত্তর মাইল গতিতে গাড়ি চালাল। তারপর গতি কমিয়ে দিয়ে মোড় নিয়ে একটা গ্রামের পথ ধরল। টয়োটাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছে।

কাঁচা পথ দিয়ে খানিকক্ষণ কোণাকুণি ভাবে এগিয়ে আবার মেন রোডে ফিরে এল শহীদ গাড়ি নিয়ে। টয়োটা সামনে। টয়োটার যাত্রী দুজন পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না একবারও। গাড়ি বদলাবার ফলে ওদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়নি।

হঠাৎ টয়োটা দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার পাশে। শহীদ না থেমে এগিয়ে গেল। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে এল ফোক্সওয়াগেন। শহীদ বলে উঠল, 'কেউ ফলো করছে কিনা ভাল করে বোঝার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা। নতুন গাড়ির ব্যবস্থা করুন, মি. সিম্পসন।'

মি. সিম্পসন মধুপুর থানায় রেডিওর মাধ্যমে খবর পাঠালেন। কাছাকাছি নির্দিষ্ট একটা জায়গায় একটা গাড়ি পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলেন তিনি।

টয়োটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে। পূর্বের মন্থর গতি বজায় রেখে সোজা এগিয়ে চলেছে ফোক্সওয়াগেন। মোড় নিল শহীদ। মি. সিম্পসন দিক নির্ণয় করে যেতে লাগলেন শহীদের সুবিধার্থে। মিনিট দেড়েক পরেই দেখা গেল একটা ওপেল রেকর্ড দাঁড়িয়ে আছে একটা ব্রিজের সামনে। নিঃশব্দে নামল ওরা। গাড়ি বদল করে ফিরতি পথে মেন রোডের দিকে চলল ওপেল।

মেন-রোডে পৌঁছে ওরা সেই মুহূর্তে গ্রীন রঙের টয়োটাকে দেখতে পল না বটে, কিন্তু তিন মিনিটের মধ্যে আবিষ্কার করা গেল। শহীদ আধ মাইল দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে চলল। টয়োটা কয়েকটা মাটির টিলা অতিক্রম করে গেল। শহীদ গাড়ি নিয়ে একটা মাটির টিলার উপর উঠতেই মি. সিম্পসন উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন, 'ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে।'

টয়োটা দাঁড়িয়ে পড়েই আবার ব্যাক করল কিছুটা, তারপর বাঁ দিকের মোড়ের কাছে পৌঁছে আধ মিনিটের জন্যে দাঁড়াল। মোড়ের সামনে একটা সাইনবোর্ড, তাতে লেখা—শেখ অ্যাণ্ড মোহাম্মদ ফার্ম।

রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলল টয়োটা। গতরাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই কাঁচা রাস্তার কাদার উপর দিয়ে হেলেদুলে, টলতে টলতে এগিয়ে চলল টয়োটা।

ফার্মের প্রধান গেটে টয়োটা দাঁড়িয়ে পড়ল। আশপাশে কোন মানুষজনের দেখা নেই।

শহীদ মোড়টা অতিক্রম করার আগেই ওপেলের স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। মি. সিম্পসন গাড়ি থেকে নামতে নামতে মোড়ের সাইনবোর্ডটা পড়লেন ভাল করেঃ 'শেখ অ্যাণ্ড মোহাম্মদ ফার্ম—ফ্রেশ মিল্ক অ্যাণ্ড এগ্‌স।' মি. সিম্পসন বললেন, 'কি করা এখন? রেডিওর আওতার বাইরে আমরা বর্তমানে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়েছে যখন, তখন আশপাশের থানা-ইনচার্জরা এবং পেট্রল কারগুলো আমাদের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দেরি নয়, পিছন দিক দিয়ে ঘুরে ফার্মের মানুষজন কে কোথায় কতজন আছে পরখ করে আসুন আপনি। যদি দেখে ফেলে এবং জবাবদিহি চায় তাহলে বলবেন আপনার গাড়ির ব্রেক খারাপ হয়ে গেছে, ফোন করতে চান। কোন গ্যারেজে ফোন করবেন, ওদের সন্দেহের উদ্রেক না করার জন্যে। যদি ধরা না পড়েন তাহলে দেখে শুনে ফিরে আসবেন সামনের দিকে। আমাকে দেখতে না পেলে অপেক্ষা করবেন।'

মি. সিম্পসন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। এবং দ্রুত পায়ে রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে চললেন ফার্মের পিছন দিকে।

মি. সিম্পসন অদৃশ্য হয়ে যেতে শহীদ এগোল প্রধান গেটের দিকে। গেটটা খোলা। ভিতরে ঢুকল শহীদ ধীরে ধীরে। প্রকাণ্ড একটা উঠান সামনে। গোয়াল ঘর দেখা যাচ্ছে, গরু নেই। উঠানের দু'পাশে বেড়াঘেরা বাগান। বাঁ দিকে সারি সারি ঘর। জানালাগুলো কোনটা খোলা, কোনটা বন্ধ। দরজা সবগুলোই ভিতর থেকে বন্ধ। জানালাগুলো তীক্ষ্ণ চোখে দেখল শহীদ। কেউ ওকে লক্ষ করছে বলে মনে হল না। কোথাও কোন মানুষজনের চিহ্ন নেই।

গোয়াল ঘরের কাছাকাছি সারি সারি ঘরগুলোর প্রধান দরজা। দরজাটার কাছে গিয়ে পৌঁছুতে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। গলাগুলো আলাদা আলাদা ভাবে চিনতে পারল না ও। তবে ফার্ম-হাউসের দোকান থেকে শব্দগুলো আসছে বলে ধারণা করল ও।

বুকটা ধক ধক করছে শহীদের। কেউ ওত পেতে বসে নেই তো আশেপাশে তার দিকে লক্ষ রেখে? কামালের কথা মনে পড়ল। কামালের মত মারাত্মক ভাবে আহত হবে না তো সে অকস্মাৎ আততায়ীর গোপন আক্রমণে!

মৃদু পদশব্দ শোনা গেল। অপেক্ষা করে রইল শহীদ। একটু পরই দেখা গেল মি. সিম্পসনকে। কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি, 'পিছনের দরজাও বন্ধ। বাইরে কেউ নেই।'

শহীদ বলল, 'আপনি আমাদের গাড়িটা মেইন রোডে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কোন পেট্রল কার দেখতে পেলে তো ভালই, তা না হলে মধুপুর থানায় ফোন করবার ব্যবস্থা করবেন। লোকজন দরকার।'

মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'ফার্মটা ঘেরাও করতে চাও তুমি। কি ব্যাপার,

শহীদ, তোমার কি ধারণা যে মিস রোশনা হায়দার এখানেই আছে?'

'ওরকমই ধারণা বটে আমার।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'গুড। আমি যাচ্ছি।'

শহীদ অপেক্ষা করে রইল। এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট, চার মিনিট।

অবশেষে দশ মিনিট কেটে গেল। বিমূঢ় হয়ে পড়ল শহীদ। মি. সিম্পসন গেলেন কোথায়? প্রতিটি সেকেণ্ড আশা করছিল ও ওপেল রেকর্ডের স্টার্ট নেবার শব্দ শুনতে পাবে। কিন্তু কই!

মি. সিম্পসন কি বিপদে পড়লেন?

শহীদ গেটের দিকে পা বাড়াল। একজন পুরুষের ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'খবরদার, একটুও নড়াচড়া নয়।'

চমকে উঠে পকেটে হাত ভরতে ভরতে ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। কিন্তু নিরাশ হল ও। ঘরগুলোর প্রধান দরজার সামনে একজন লোক তার দিকে একটি রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রিগারে চেপে বসছে লোকটার আঙ্গুল। শহীদ পকেট থেকে খালি হাতটা বের করল। এই মুহূর্তে রিভলভার বের করা মানে মৃত্যু বরণ করা।

রাইফেলধারী লোকটা ছোটখাট, ময়লা পোশাক পরনে, কাদা মাখা ভারি জুতো পায়ে। একরোখা ধরনের চেহারা। শহীদ বলে উঠল, 'তোমার হাতের ওটা নামাও।'

'এগিয়ে আসুন, সাহেব,' লোকটা ব্যঙ্গভরে বলে উঠল।

শহীদ দ্বিতীয়বার হুকুমের স্বরে বলল, 'নামাও ওটা বলছি!'

'ঠাট্টা হচ্ছে মনে করছেন? আসুন এখানে, এদিকে!'

লোকটা কথা বলতে বলতে এক পা সামনে বাড়ল। বেপরোয়া ভাবটা চরম আকারে ফুটে উঠেছে লোকটার মধ্যে। শহীদ ভাবছিল কোনদিক থেকে কোন সাহায্যের আশা নেই। মি. সিম্পসনকে সম্ভবত গাড়ির কাছে বাধা দেয়া হয়েছে।

'আমি আর একবার সুযোগ দেব। শেষ বার বলছি, এদিকে আসুন।'

শহীদ শুরু করল, 'আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, এবং আমি আদেশ দিচ্ছি...।'

শহীদ ওর পিছনে একটা শব্দ শুনল। নরম মৃদু শব্দ। ঘুরে তাকাবার চেষ্টা করল ও। কাউকে দেখতে পেল না। গর্জে উঠল সামনে দাঁড়ানো লোকটার হাতের রাইফেল। ওয়ার্নিং ফায়ার। শহীদের মাথা থেকে ইঞ্চি দেড়েক উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট।

হঠাৎ শহীদের পিছনে দ্রুত শব্দ উঠল একটা। শহীদ ঘুরে দাঁড়াবার সাথে সাথে দেখল একজন লোককে। অচেনা লোক। শহীদের মাথার উপর উঁচিয়ে

ধরেছে লোকটা একটা হাতুড়ি। এক পলক সময়ও পেল না শহীদ সাবধান হবার। নেমে এল হাতুড়িটা মাথা বরাবর প্রচণ্ড বেগে। মাথাটা সরিয়ে নেবার ব্যর্থ প্রয়াস পেল ও। তবে আঘাতটা লাগল মাথার একপাশে, পিছলে গেল হাতুড়িটা। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথায় অন্ধকার ঘনিয়ে এল অকস্মাৎ ওর চোখের সামনে।

ঢলে পড়ে গেল শহীদ। জ্ঞান হারাল সাথে সাথেই।

চোখের সামনে তখনও গাঢ় অন্ধকার বিরাজমান।

জ্ঞান ফিরছে শহীদের, কিন্তু ও এখনও অর্ধ-সচেতন। নিকষ কালো অন্ধকারই সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে ওকে। এখন প্রচণ্ড ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে সর্বশরীর। কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্ধকার, নৈঃশব্দ্য এবং মাথায় দাউ দাউ জ্বলছে ব্যথার আগুন।

চোখ খুলল শহীদ। তবু গাঢ় অন্ধকার দূর হল না। ব্যথাটা অপেক্ষাকৃত কম মনে হল। চোখ দুটো আবার বন্ধ করল ও।

শহীদ স্মরণ করার চেষ্টা করল সব কথা। ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল গোলাম হায়দার হত্যাকাণ্ডের সকল ঘটনা। গোলাম হায়দার জামিল হায়দারের ভাইয়ের ছেলে। বিয়ে হবার আগেই কোন এক যুবতীর গর্ভে জামিল হায়দারের এক অবৈধ সন্তান হয়। পঁচিশ বছর ধরে সে সন্তানের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অন্তত সকলে তাই জানিয়েছে। জামিল হায়দার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বড় চাকুরে। তাঁর মান-সম্মান আছে সমাজে। এবং এই মান-সম্মানের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় গোলাম হায়দার। সে জানল জামিল হায়দারের অবৈধ সন্তানের খবর। সে ব্ল্যাকমেল শুরু করে চাচাকে। তারপর একদিন খুন হয় গোলাম হায়দার। খুনী হিসেবে গ্রেফতার করা হয় জামিল হায়দারকে। এখন জামিল হায়দারের বিচার চলছে। কিন্তু জামিল হায়দার গ্রেফতার হবার পরপরই নাটকীয়তার সূচনা হয়। জামিল হায়দারের কন্যা মিস রোশনা ইরাক থেকে ঢাকায় এসে শহীদকে জানায় তার আম্মা মিসেস জামিলকে পুলিসের তরফ থেকে পাহারা দিতে হবে। শহীদ বুঝতে পারে মিসেস জামিল আততায়ীর হাতে নিহত হবে এই আশঙ্কা করছে মিস রোশনা। কিন্তু মিস রোশনা এর ভিতরকার রহস্য চেপে যায়। সব কথা খুলে বলে না শহীদকে। শহীদ সেদিন রাতেই মিস রোশনার সাথে দেখা করে কথা আদায় করার জন্যে যায় তার ভাই শামিম হায়দারের বাড়ি। সেই বাড়িতে একজন হ্যাট পরিহিত লোককে দেখে ও। লোকটা বেপরোয়াভাবে পালিয়ে যায়। শহীদ দেখে বাড়ির ভিতর মিস রোশনা হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় এবং শামিম হায়দার মাথায় হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে অচেতন। কিন্তু ওরা দু'জনই অস্বীকার করল পরে। হ্যাট পরিহিত লোকটাকে ওরা চেনে না। অথচ শহীদের ধারণা হয় ওরা লোকটাকে চিনেও মিথ্যে কথা বলেছে।

শহীদ এরপর কামালকে নির্দেশ দেয় মিস রোশনা যেখানে যায় সেখানে পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করার জন্যে। কামাল একটা পোড়োবাড়ির ঠিকানা জানায় ফোনে। শহীদ ছুটে যায় সেখানে। দেখে কামাল মারাত্মক অবস্থায় আহত হয়ে পড়ে আছে, মিস রোশনা কোথাও নেই। কামালকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ডাক্তাররা জানায় কামালকে বাঁচানো তাদের ক্ষমতার বাইরে। কুয়াশা ছুটে আসে খবর পেয়ে। কামালকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায় সে। পৃথিবী বিখ্যাত কয়েকজন ডাক্তার কুয়াশার কাছে বিশেষ এক গবেষণায় নিযুক্ত, তারা হয়ত কামালকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারে। শহীদ রাজি হওয়াতে কুয়াশা কামালকে নিজের আস্তানায় নিয়ে যায়। এদিকে মিস রোশনার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তার ভাই শামিম হায়দার দাবি করে রোশনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এরপরই সুদূর ইরাক থেকে আগমন ঘটে মোহাম্মদ আমান গাজীর। আমান গাজী বয়সে যুবক, সে শহীদের সাথে দেখা করে জানায় যে মিস রোশেনার সাথে তার প্রেম ছিল, খবর পেয়ে মিস রোশেনাকে উদ্ধার করার জন্যে এসেছে। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ই ওদের প্রতি গুলি ছুঁড়ে পালায় একটা লোক। শহীদ বুঝতে পারে না তার প্রতি, না আমান গাজীর প্রতি গুলি ছোঁড়া হল। ওরা অনুসরণ করল আততায়ীকে। বহুদূর গিয়ে অবশেষে গাড়ি ফেলে পালিয়ে গেল আততায়ী। গাড়ির ভিতর পাওয়া গেল বিশেষ এক ধরনের চুরুট। এই চুরুটই পাওয়া গিয়েছিল সেই পোড়ো বাড়িতে, যেখানে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কামাল। বোঝা গেল দুটি ঘটনার নায়ক একজনই। শহীদ এই বিশেষ Ramonez চুরুটের উপর নির্ভর করে লোকটার সন্ধান শুরু করল। পাওয়াও গেল লোকটাকে। কিন্তু পালাতে চাইছিল সে, হঠাৎ কোথা থেকে আমান গাজী ছুটে এসে লোকটাকে ধরে ফেলল এবং মারতে মারতে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করল। শহীদের আগেই রহস্যময় মনে হয়েছিল আমান গাজীর অদ্ভুত সব ব্যবহার। এবার ওর মনে প্রশ্ন জাগল ধৃত লোকটাকে কি আমান গাজী উদ্দেশ্যমূলকভাবে মেরে ফেলতে চাইছিল? শহীদ ভেবে-চিন্তে গ্রেফতার করল আমান গাজীকে। ধৃত লোকটার নাম খালেক। তাকে বিভিন্ন ভাবে জেরা করার প্রয়াস পাওয়া গেল। কিন্তু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিল না সে। শহীদ এরপর আমান গাজী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে তার পাঠাল ইরাকে। ইরাক থেকে যে আমান গাজীর খবর এল সে আমান গাজীর বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ। মি. এবং মিসেস হায়দার আমান গাজীর নাম শোনা মাত্র দারুণ ভাবে চমকে উঠলেন এবং এ-সম্পর্কে বিস্তারিত কোন কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। এদিকে মিস রোশনার কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ মি. সিম্পসনের সাথে শহীদ চলে আসে আমান গাজী এবং শামিম হায়দারকে অনুসরণ করার জন্যে…।

একে একে সকল কথা মনে পড়ে গেল শহীদের।

কতক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়েছিল তা বুঝতে পারল না।

ব্যথাটা কমে আসছে মাথার। কিন্তু অন্ধকারে নিজের এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সদ্য ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে না বলে অস্বস্তি বোধ করছে ও। কোথায় আছে সে? হাত দুটো বাঁধা। চিত হয়ে শুয়ে আছে মেঝেতে। অন্ধ কূপে ফেলে গেছে শত্রুরা ওকে? নাকি কয়েদখানা এটা? ফার্ম হাউসের এবং যে লোকটা ওর মাথায় হাতুড়ির ঘা মেরেছিল তার কথা মনে পড়ল ওর।

ধীরে ধীরে উঠে বসবার চেষ্টা করল। মাথার ব্যথাটা বাড়ল খানিক। উঠে বসল ও। একই প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়ে পড়ল। একপা একপা করে অতি সাবধানে পা বাড়াল। হাত দুটো এগিয়ে দিয়েছে। যাতে দেয়াল-টেয়াল থাকলে বুঝতে পারা যায়। পাওয়া গেছে দেয়াল। দেয়ালের পিঠে হেলান দিয়ে হাঁপাতে শুরু করল ও। মাথার ব্যথাটা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে আবার।

গাঢ় অন্ধকার দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন দিকেই কোন জানালা নেই। হঠাৎ তলপেটের শূন্যতাবোধ অপেক্ষাকৃত বেশি মনে হল শহীদের। খিদে? মনে মনে এত দুঃখেও হাসি পেল। প্রশ্ন জাগল পরক্ষণেই—এখন রাত না দিন?

দেয়াল ঘেঁষে পা-পা করে এগোতে লাগল শহীদ। জানালা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। দরজা নিশ্চয় একটা না একটা কোথাও আছে। ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল ও। হাত দুটো বাঁধা তবু শক্ত কাঠের স্পর্শ অনুভব করতে ভুল হল না। পরীক্ষা করে দেখল শহীদ। হ্যাঁ, এটা একটা দরজাই বটে।

এবার চেষ্টা করল হাতের বাঁধন খুলে ফেলতে। বার বার প্রাণপণে চেষ্টা করল ও হাত দুটোকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল খোলা গেল না শক্ত দড়ির বাঁধন।

দরজার হাতল ধরল শহীদ কোনরকমে। হাত দুটো বাঁধা হলেও হাতলটা মুঠো করে ধরতে পারছে ও, ঘোরাতেও পারছে। দরজাটা তালা মারা কি না ভাবতে ভাবতে মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল ওর।

দরজা অবশেষে খুলে গেল। তার মানে তালা দেয়া ছিল না। আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল ওর মনে। কিন্তু পরমুহূর্তে সে আনন্দ উবে গেল মন থেকে। দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়েছে বটে, কিন্তু তাসত্ত্বেও সামনে গাঢ় অন্ধকার বিরাজমান। তার মানে কি? তবে কি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে প্রবেশ করার দরজাটা খুলেছে ও? তবে কি বন্দী দশা থেকে মুক্তি পায়নি ও?

দরজাটা অতিক্রম করে কয়েক পা সামনে বাড়ল অন্ধকারে। বাঁ দিকে দেয়াল রয়েছে, স্পর্শ করে অনুভব করল। ডান দিকেও দেয়াল, পরীক্ষা করে দেখল। তার মানে একটা সরু গলির মধ্যে এসে পড়েছে ও। যাক এটা তাহলে কোন বন্ধ ঘর

না, প্যাসেজ। দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে প্যাসেজটা। অতি সাবধানে এগিয়ে চলল শহীদ ধীরে ধীরে।

খানিক দূর যেতেই পা ফসকে পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল শহীদ। পা'টা মচকে গেল না ভাগ্যক্রমে। অন্ধকারে বুঝতে পারেনি সামনে সিঁড়ির ধাপ। ধাপগুলো সাবধানে গুনে গুনে নামতে লাগল ও। মাত্র দুইটা ধাপ। তারপর দু'দিকে দুটো প্যাসেজ চলে গেছে। কোন দিকে যাওয়া যায় এখন? ভেবে এক্ষেত্রে কোন লাভ নেই। দু'দিকেই নিকষ কালো ঘন অন্ধকার। ডান দিক ধরে এগিয়ে চলল শহীদ। খানিক দূর যেতেই মাথাটা ঠুকে গেল দেয়ালের সাথে। বাঁধা হাত দুটো দিয়ে পথের সন্ধান করে চলল ও। সামনে দেয়াল। বাঁ দিকে একটা প্যাসেজ পাওয়া গেল। পা-পা করে এগিয়ে চলল ও। আবার সিঁড়ি পাওয়া গেল। উপর দিকে উঠে গেছে, মোট ছয়টা ধাপ। ধাপগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে চলল ও দেয়াল ধরে ধরে। ডান দিকে দুবার মোড় নিল। অন্ধকারের যেন শেষ নেই। এগিয়ে চলল শহীদ। বিশ পঁচিশ কদম এগোবার পর আবার মোড়।

মোড় নিতেই শহীদ আলোর দেখা পেল। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা। দরজার বাইরে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। বুকটা ধ্বক ধ্বক করছে উত্তেজনায়। এগোল ও। দরজাটার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। শত্রুর আস্তানা এটা! এখন কি করা উচিত? নিজেকে মুক্ত করা দরকার সব চেয়ে আগে। কিন্তু শত্রুর আস্তানায় কেউ তার বাঁধন খুলে দেবে এ আশা বাতুলতা। অথচ কারও সাহায্য ব্যতীত বাঁধন মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এই বাড়ি থেকে বের হবার উপায়ও জানা নেই।

দু'হাত তুলে দরজায় ধাক্কা মারল শহীদ। যা হবার হবে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে কোন উপায় নেই এই মুহূর্তে। ঘরের ভিতর আলো যখন জ্বলছে তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে। তা সে-লোক শত্রু…।

দরজাটা খুলে গেল অকস্মাৎ। দরজার পাল্লা দুটো শহীদের গায়ে এসে ধাক্কা মারল। ঘরের ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলোর বন্যা বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। সেই আলোর বিপরীতে, দরজার চৌকাঠে, এসে দাঁড়িয়েছে এক নারী। শহীদ পরিষ্কার চিনতে পারল মিস রোশনা হায়দারকে।

মিস রোশনা চমকে উঠে পিছিয়ে গিয়ে ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল একটা। শহীদ প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঢলে পড়ছে। খপ করে ধরে ফেলল ও দরজার একটা পাল্লা। হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। মিস রোশনা দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাঁড়ান, ধরছি!'

দ্রুত দু'পা এগিয়ে এসে শহীদের কাঁধ ধরে ফেলল মিস রোশনা। শহীদ পা বাড়াল। ঘরে ঢুকে মিস রোশনার সাহায্য ছাড়াই কয়েক পা এগিয়ে একটা কাঠের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল ও। মাথার ব্যথাটা বেড়ে গেছে হঠাৎ। মিস রোশনা দরজা বন্ধ করে দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকাল শহীদের দিকে।

তারপর অস্ফুট স্বরে শুধু উচ্চারণ করল, 'মি. শহীদ!'

'অদ্ভুত জায়গায় দেখা হল। যাক, আগে আমার হাতের বাঁধন খোলবার ব্যবস্থা করা যায়?' শহীদ হাসবার চেষ্টা করে বলল।

মিস রোশনা ত্রস্তপদে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রয়ার থেকে বের করল সে একটা চকচকে ধারাল ছোরা। ছোরাটা নিয়ে এগিয়ে আসছে সে শহীদের দিকে সোজা।

বুকটা ধ্বক করে উঠল শহীদের। মিস রোশনার সকল রহস্যময় আচরণের কথা মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল। মিস রোশনা তার শত্রু না মিত্র?

এগিয়ে আসছে মিস রোশনা। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো লেগে চক্‌চকে ছোরার ব্লেডটা ঝিলিক মারছে। অসহায়বোধ করল শহীদ। কিন্তু মিস রোশনা সে সব লক্ষ করল না। শহীদের বাড়িয়ে ধরা হাত জোড়া ধরে দড়ির বাঁধনের উপর ছোরা চালাতে শুরু করল সে।

বাঁধন কেটে ফেলল মিস রোশনা। কাটতে গিয়ে দু'জায়গার মাংসে ছোরার ডগা বিঁধে রক্ত বের হল। তীব্র জ্বালা করতে লাগল কাটা জায়গাগুলো।

মিস রোশনা পাশের ঘরে গেছে। একটু পরে দুধ নিয়ে এল সে। শহীদ বিনাবাক্য ব্যয়ে গ্লাসটা খালি করল। ক্লান্তি বোধ ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। শহীদ দেখল মিস রোশনাকে সুসজ্জিতই দেখাচ্ছে। ঘরের দিকে মনোযোগ দিল এবার ও। এটা একটা কিচেনরুম।

মিস রোশনা পাউরুটি কাটছে মিটসেফের কাছে দাঁড়িয়ে। স্টোভে চায়ের পানি ফুটছে। খানিক পরই শহীদের সামনে একটা ট্রে এনে রাখল মিস রোশনা। স্যাণ্ডউইচ, পাউরুটি, মাখন, পনির এবং মধু। মিস রোশনা বলল, 'খিদে পেয়েছে বলে মনে হয়, কেমন?'

শহীদ খেতে খেতে বলল, 'খুব।'

খাওয়া সারল শহীদ নিঃশব্দে। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত ভরল। রিভলভারটা নেই, আশাও করেনি ও। ঘড়িটাও নেই। মিস্ রোশনা জানতে চাইল, 'কি খুঁজছেন?'

'ক'টা বাজে বলতে পারেন?'

'এগারোটা দশ।' ঘড়ি দেখে বলল মিস রোশনা।

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'কি বার আজ?'

'শনিবার।'

শহীদ নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'সৌভাগ্যক্রমে একটা দিন হারাইনি আমি।'

'কতক্ষণ ধরে অমন হালে ছিলেন আপনি?'

'শেষ ব্যাপার যেটা আমার স্মরণ আছে সেটা হল আজ বেলা দুটোর সময়

ঘাত খেয়ে জ্ঞান হারাই আমি।'

'খিদে লাগাটা অস্বাভাবিক নয় সেক্ষেত্রে।'

'আপনি আমাকে আরও আগে মুক্ত করতে পারতেন।'

'আমি জানতাম না আপনি এখানে রয়েছেন।'

শহীদের মনে হল মিস রোশনা সত্য কথা বলছে না। কিন্তু কেনই বা সে মিথ্যে কথা বলতে যাবে? কি প্রয়োজন তার মিথ্যে কথা বলবার? শহীদ কথা বলল না। মিস রোশনা বলতে শুরু করল, 'আমি জানতাম না। সারাদিন এখানে ছিলাম না আমি। ওরা আজ দুপুরে কয়েক ঘন্টার জন্যে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল—আজই প্রথম।'

'কবে থেকে?'

'সোমবার থেকে।'

'আপনাকে বুঝি ইয়াকুব এখানে নিয়ে এসেছিল?'

মিস রোশনা চমকে উঠল। এবং রাঙা হয়ে উঠল তার মুখাবয়ব। কোন উত্তর দিল না সে। শহীদ বলল, 'আমি ইয়াকুবকে চিনি। একজন পুলিসকে আক্রমণ করার জন্যে তার বিচার হবে, আরও সব ব্যাপার আছে। হাজতে সে এখন। এসব আপনি জানেন?'

'শুনেছি সে কাউকে আক্রমণ করেছিল। না, সে আমাকে এখানে নিয়ে আসেনি। পোড়ো সেই বাড়িটা থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল বটে সে আমাকে। অন্য একজন গাড়ি করে এখানে নিয়ে এসেছিল, মঙ্গলবার রাতে। এখানে আমাকে একটা অন্ধকার সেলে রাখা হয়েছিল, যেখানে আপনি ছিলেন।'

'কিন্তু বেশ আরাম আয়েশে আপনাকে রেখেছে, দেখতে পাচ্ছি।'

মিস রোশনার মুখ রাঙা হয়ে উঠল আবার। বলল, 'মঙ্গলবার দিন আমাকে কিছু জিনিসপত্র এনে দেয় ওরা। সেলে অবশ্য কয়েক ঘন্টা রেখেছিল আমাকে।'

'কেন?'

'ওরা আমাকে ভয় দেখাতে চাইছিল। কিছু তথ্য আদায় করার উদ্দেশ্যে।'

'কি এমন তথ্য?'

মিস রোশনা চোখ বন্ধ করল। বলল, 'আমি জানি না। আমার ভাই শামিম হায়দারের বাড়িতে যে কাগজপত্রের জন্যে ওরা গিয়েছিল সেই কাগজপত্রের সন্ধানে এখনও মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। ওসব সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ কোন ধারণাই নেই আমার। অথচ ওরা মনে করে আমি জানি কাগজপত্রগুলো কোথায় আছে। আমার অজ্ঞতা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল ওরা পরে। বৃহস্পতিবার দিন এখানে নিয়ে আসে আমাকে। তারপর থেকে এখানেই রাখা হয়েছে আমাকে, আজ দুপুর বেলাটা ছাড়া।'

'কতজন লোক আছে এখানে?'

'তিনজনকে দেখেছি আমি।'

'আগে থেকে চিনতেন কাউকে?'

'না। দু'জন সম্ভবত এখানেরই লোক, তৃতীয় জন এসেছে ঢাকা থেকে। বেঁটে এবং কালো লোকটা। সব সময় সে এখানে থাকে না, কিন্তু আজ সে ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় কোন কারণ ঘটেছে, তা না হলে আমাকে বের করত না দুপুর বেলা।'

শহীদ বলল, 'কারণটা আমি। আচ্ছা, আপনি নিশ্চয় জানতেন যে ইয়াকুব আমাকে এবং আপনার ভাইকে আক্রমণ করেছিল আপনার ভাইয়ের বাড়িতে? তাই না?'

মিস রোশনা উত্তর দিল না। শহীদ প্রসঙ্গ বদল করে বলল, 'তাহলে আপনার যা যা দরকার সবই দিচ্ছে ওরা?'

'খাবার দিচ্ছে, কাপড়ও দিচ্ছে—ব্যস।'

'প্রথম রাত ছাড়া পরে আর আপনাকে প্রশ্ন করা হয়নি?'

'না। ঢাকা থেকে আসা লোকটা প্রশ্ন করেছিল।'

'ওরা শুধু মাত্র সেই কাগজপত্র বা ডকুমেন্টগুলো সম্পর্কে আগ্রহী?'

মিস রোশনা একমুহূর্ত কি যেন ভেবে বলে উঠল, 'মি. শহীদ, আমি যতটুকু জানি তার সবটুকুই বলেছি। এবং মিথ্যে কথা বলিনি আপনাকে।'

'কিন্তু অনেক কথাই আপনি আমাকে এখনও বলেননি।'

শহীদ কথাটা বলে দরজার দিকে তাকাল। এখানের দরজা জানালাগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর। কেউ শুনছে না তো ওদের কথাবার্তা? মনে একটা প্রশ্ন জাগল ওর—তাকে কেন এমন সেলে রাখা হয়েছিল যেখান থেকে বের হওয়া এত সহজে সম্ভব হল? বের হবার পর প্রায় নির্ধারিতভাবে কি ভাবে সে মিস রোশনার ঘরে পৌঁছুল। আলো জ্বলছিল একমাত্র মিস রোশনার কিচেনরূমে। তার মানে কি এই যে শত্রুরা চায় তার সাথে মিস রোশনার দেখা হোক? তাকে বন্দী করে না রেখে হত্যা করলেই সব ঝামেলা চুকে যেত। তা কেন করেনি শত্রুরা? নাকি সে মরে গেছে মনে করেছে ওরা?

শহীদ উঠে দাঁড়াল। মিস রোশনা বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি করতে যাচ্ছেন আপনি?'

'আশপাশটা দেখা দরকার। জানেন না বুঝি যে এখান থেকে ছাড়া পেতে হবে আমাদেরকে?'

'ছাড়া পাওয়া অসম্ভব। বের হবার সব দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। জানালাগুলোও বাইরে থেকে বন্ধ। এবং আমার বিশ্বাস কেউ না কেউ সব সময় পাহারা দিচ্ছে।'

শহীদ কথা না বলে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা বাইরে থেকেই

তালা মারা। মজবুত তালা। ধাক্কা দিলে আধইঞ্চিটাক ফাঁক হয় পাল্লা দুটো। কোথাও স্পাইহোল দেখা গেল না। দেয়ালগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল শহীদ। কিছু পাওয়া গেল না। ড্রেসারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল ও এবার।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। মনে হল কি যেন নড়েচড়ে উঠল।

ড্রেসারের প্যানেলগুলো সার্চ করতে শুরু করল শহীদ। যা আশঙ্কা করছিল পাওয়া গেল তা। কাঠের গায়ে বড় একটা ছিদ্র। খুব বেশি অবাক ভাব না দেখিয়ে সরে গেল শহীদ ড্রেসারের কাছ থেকে। মিস রোশনা প্রশ্ন করল, 'দেখলেন কিছু?'

'কিছু দেখছি বলে মনে হয় না।' চেয়ারে বসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল শহীদ।

আড়চোখে তাকাল ও ড্রেসারের গায়ের ছিদ্রটার দিকে। ছিদ্রের মধ্যে একটা চোখ রয়েছে, দেখতে ভুল হল না শহীদের। তার মানে সত্যি সত্যি নজর রাখা হচ্ছে তাদের প্রতি। শহীদ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মিস রোশনাকে বলল, 'এবার কথা শুরু করা যাক। বলুন, কেন আপনি ইয়াকুবের সাথে সেই পোড়োবাড়িতে গিয়েছিলেন?'

'আমাকে সে ডেকে পাঠিয়েছিল। যাওয়া উচিত বলেই মনে হয়েছিল।'

উত্তর দিতে অনিচ্ছা মিস রোশনার, বুঝতে পারছিল শহীদ।

'আপনি জানতেন সে একজনকে আঘাত করেছিল।'

'সে আমাকে একটা ঘরে রেখে গিয়েছিল। একজনের চিৎকার কানে ঢুকেছিল অবশ্য।'

'এবং কিছু করার কথা ভুলে পুতুলের মত বসেছিলেন সেখানে, কেমন?'

মিস রোশনা কোন উত্তর দিল না। শহীদ বলতে শুরু করল, 'ইয়াকুব আপনাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারে দেখা যাচ্ছে। ঢাকার সেই বাড়িতে, যেখানে আপনি ইরাকে যাবার আগে থাকতেন, সেখানে অধিকার দিয়েছিলেন বাস করবার। অথচ ওই ধরনের লোক তো আপনার সাথে মেলামেশার উপযুক্ত নয়। ব্ল্যাকমেল জঘন্য ব্যাপার। কেন সে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার সুযোগ পায়?'

মিস রোশনা উত্তর দিল না।

'চুপ করে থাকলে কোনই লাভ হবে না। এটা একটা জঘন্য কেস। হত্যা, হত্যার চেষ্টা, ধ্বংসাত্মক কাজ, গুলি ছোড়াছুড়ি—এসব আপনার এবং আপনাদের পরিবারকে নিয়ে ঘটে চলেছে। আপনার আব্বা সম্ভবত ফাঁসিতে ঝুলবেন, অন্যান্যরা নিহত হতে পারে, যদি এখনও আপনি সব কথা খুলে না বলেন। কেন আপনি ইয়াকুবকে যা ইচ্ছা করবার অধিকার দিয়েছেন? কেন আপনি গিয়েছিলেন ইরাকে? কি কাগজপত্রের সন্ধানে ফিরছিল ইয়াকুব? কেন…?'

অকস্মাৎ চুপ করে গেল শহীদ! কোথায় যেন কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ হল। দরজার দিকে তাকাল শহীদ।

দরজার নিচের সামান্য ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঢুকছে। কেঁপে উঠল শহীদের

সর্বশরীর।

সম্মোহতের মত দরজার দিকে তাকিয়ে রইল শহীদ। শহীদের দৃষ্টি অনুসরণ করে মিস রোশনা তাকাল দরজার দিকে। পোড়া কাঠের গন্ধ ঘরের ভিতর। চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল সে, 'আগুন!'

শহীদ অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমনটিই তো হবার কথা! এই চরম বিপদের মুখেই তো টেনে এনেছেন আপনারা।'

শহীদ কথাগুলো বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিচেনরূমের দ্বিতীয় দরজাটা খোলবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু নিরাশ হল। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা চেয়ার তুলে আগুন ধরা দরজাটায় আছাড় মারল এবার ও। ভেঙে টুকরো হয়ে গেল চেয়ার। দরজার তেমন কোন ক্ষতিসাধন হল না। মজবুত পুরু কাঠ। মিস রোশনার দিকে ফিরে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও, 'কোদাল বা কুড়ুল বা হাতুড়ি-টাতুড়ি কিছু আছে?'

হাতুড়ি পাওয়া গেল বটে একটা। কিন্তু দরজা ভাঙার জন্যে সেটা নেহাতই অচল। দরজায় হাত ঠেকাতেই উত্তাপ অনুভব করল শহীদ। মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর। মিস রোশনা চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও!'

শহীদ দেখল দ্বিতীয় দরজাটার ফাঁক দিয়েও ধোঁয়া ঢুকছে। জানালাগুলোর দিকে তাকাল শহীদ দ্রুত। জানালাগুলোতেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে বাইরে থেকে।

ধোঁয়ায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে ঘরটা। বাইরে বের হবার কোন পথ নেই। ঘন ঘন কাশছে—দু'জনেই। চোখ জ্বালা করছে। পানি গড়িয়ে পড়ছে দরদর করে। চোখ মেলে রাখা যাচ্ছে না। শহীদ পাগলের মত দরজার গায়ে হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে। ওর মাথার ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। দরদর করে ঘামছে। প্যান্টশার্ট ভিজে গেছে সম্পূর্ণ। ব্যর্থতা ছাড়া কিছু যেন আশা করার নেই। হাতুড়ি পড়ে গেল হাত থেকে ছিটকে। ফোস্কা পড়ে গেছে হাতের চেটোয়। দরজার কোন ক্ষতিই হয়নি। চিৎকার করে মিস রোশনাকে বলল শহীদ, 'দেশলাই আছে?'

কাশতে কাশতে দুটো দেশলাই বের করে দিল মিস রোশনা শহীদকে। মৃত্যু-ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে তার মুখের চেহারা। শহীদ ওর দিকে না তাকিয়ে দেশলাই জ্বেলে উপরদিকের দেয়াল পরীক্ষা করতে শুরু করল। বিরাট লম্বা ড্রেসারটা সরিয়ে দেখার কথা মনে হল ওর। মিস রোশনাকে ইঙ্গিতে ডাকল ও।

দু'জন মিলে ফেলে দিল ধাক্কা মেরে ড্রেসারটা। প্রায় দেড় মানুষ উপরে একটা গর্ত দেখা গেল। চোরাপথ। টেবিলটা টেনে নিয়ে এসে মিস রোশনাকে ধরে গর্তের মুখে তুলে দিল ও। মিস রোশনা দ্রুত নেমে গেল গর্ত দিয়ে। শহীদও নামল পরমুহূর্তে। কিন্তু দেশলাই জ্বেলে চারদিকটা দেখার পর জীবনের সকল আশা ত্যাগ

করল শহীদ।

চোরা পথ দিয়ে একটা প্যাসেজে এসে পড়েছে ওরা। কিন্তু প্যাসেজের দু'দিকের দুটো দরজাই বিপরীত দিক থেকে বন্ধ। ধোঁয়ায় ভরাট হয়ে রয়েছে প্যাসেজটা। চোখ মেলতে পারছে না শহীদ কোন মতে। শ্বাসের সাথে ফুসফুসে ধোঁয়াই ঢুকছে কেবল। মিস রোশনা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে অসহ্য কষ্টে কাশছে। শহীদ দুর্বল হয়ে পড়ছে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে শহীদ। কিন্তু মৃত্যু বরণ করা ছাড়া এখন আর কোন গত্যন্তর নেই। কোন শক্তি নেই শহীদের আর।

ধীরে ধীরে বসে পড়তে বাধ্য হল ও। তারপর শুয়ে পড়ল কাশতে কাশতে।

মধুপুর থানার ইন্সপেক্টর কবির আহমেদ বলল, 'সর্বত্র খোঁজা হচ্ছে, মি. কামাল। হয়ত ওঁরা মধুপুর জঙ্গলের দিকে আছেন, হয়ত গ্রামের দিকে কোথাও। খবর পাওয়া যাবে, যদি তাঁরা এই এলাকার মধ্যে কোথাও থেকে থাকেন। সব জায়গার রিপোর্ট এখনও এসে পৌঁছায়নি। অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে…'

কামাল বলে উঠল, 'এই এলাকা থেকেই শেষ নির্দেশ পেয়েছে পেট্রল কারগুলো। নিশ্চয় ওরা এই এলাকার আশেপাশে কোথাও আছে।'

কামালের সঙ্গে একজন দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক এসেছেন মধুপুর থানায়। কামাল তার কোন পরিচয় দেয়নি ইন্সপেক্টরকে। সে গম্ভীর ভারি কণ্ঠে বলে উঠল, 'ওরা এই এলাকার কোথাও থাকতে বাধ্য।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আমার অধীনে যত লোক আছে সবাইকে সন্ধানে পাঠিয়েছি। নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করুন। সন্ধান পাওয়া মাত্রই খবর পৌঁছে যাবে। তাছাড়া তত ভয়ের বোধহয় কিছু নেইও।'

দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক গম্ভীর এবং অস্বাভাবিক মোটা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই ধরনের কাজে ভয় এবং বিপদ সব সময়ের সঙ্গী। ভয় নেই এ কথা বলবেন না।'

এমন সময় বেজে উঠল ফোন। ইন্সপেক্টর রিসিভার তুললেন। ফোনের কথা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠল তার চেহারা। শক্ত করে রিসিভার ধরে বলে উঠল সে, 'শেখ অ্যাণ্ড মোহাম্মদ ফার্ম? চিনি! ঠিক আছে—এখুনি আসছি আমরা…!'

ফোন ছেড়ে দিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর। বলল, 'তিনজন লোককে পাওয়া গেছে আহত অবস্থায়—তাদের মধ্যে একজন মি. সিম্পসন। মি. শহীদের কোন সন্ধান নেই।'

'চলুন, দেখা যাক।'

প্রচণ্ড বেগে গাড়ি চালিয়ে শেখ অ্যাণ্ড মোহাম্মদ ফার্মের সামনে গাড়ি থেকে নামল ওরা। ফার্মে আগুন জ্বলছে তা ওরা দেখতে পেয়েছে দূর থেকেই। গাড়ি

থেকে নেমে প্রধান গেট দিয়ে ফার্মের উঠানে প্রবেশ করল ওরা তিনজন। কয়েকজন কনস্টেবল এবং একজন সাব ইন্সপেক্টর ছুটে এল ওদের দিকে। ফার্মে এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। ফার্মের বাঁ পাশের বস্তিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সাব ইন্সপেক্টর বলল, 'মি. সিম্পসন জ্ঞান ফিরে পাননি, স্যার। তিনজনকেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা এই ঘাসের উপর পড়েছিল। ওদের মধ্যে একজন শুধু রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছেছিল, আমরা দেখতে পাই তাকে।'

কামালের সঙ্গী ভদ্রলোক গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল, 'দমকল কি করছে?'

'দমকল বাহিনী বস্তির আগুন যাতে বেশি দূর ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার ব্যবস্থা করছে।'

কামালকে ইঙ্গিত করে দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক এগিয়ে চলল উঠান ধরে। সামনের সারি সারি ঘরগুলোর প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পিছনে ইন্সপেক্টর এবং সাব ইন্সপেক্টরও এল। কামাল বলল, 'দরজাটা ভাঙার উপায় করা যায় না?'

'যায়।'

দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক আশপাশে তাকালেন। সারি সারি ঘরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। হাত পনেরো বিশ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। এর বেশি সামনে এগোনো যাচ্ছে না গরমের কারণে। দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক বিরাট লম্বা একটা বাঁশ নিয়ে ফিরে এল গোয়াল ঘরের মাচা থেকে। সারি সারি ঘরগুলোর প্রধান দরজার বেশ কাছাকাছি এগিয়ে গেল সে। সাব ইন্সপেক্টর উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'কি করতে যাচ্ছেন আপনি? যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে ঘরগুলো! মরবেন নাকি?'

দীর্ঘদেহী উত্তর দিল না। আরও সামনে এগিয়ে গেল সে। তারপর লম্বা বাঁশটা দিয়ে আঘাত করল দরজাটার গায়ে। আগুন-ধরা দরজায়, ধাক্কা দিতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সকলে দেখল দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ঘরের ভিতর। দীর্ঘদেহী অপলক চোখে কি যেন দেখতে দেখতে গম্ভীর স্বরে কামালের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'ঘরের ভিতরের দরজাটা পুড়তে পুড়তে পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ কামাল? দরজাটা দিয়ে পাশের রুমটা দেখা যাচ্ছে। রুমটার একধারে ওই যে একটা টেবিল পুড়ছে।'

কামাল বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কি বলতে চাও তুমি?'

দীর্ঘদেহী বলল, 'টেবিলের উপরদিকের দেয়ালের দিকে তাকাও। একটা বড় গোল গর্ত দেখা যাচ্ছে। আর মেঝেতে একটা আলমারি বা ড্রেসার মত কি যেন পড়ে রয়েছে। এর মানে কি হতে পারে অনুমান করতে পারো? এরমানে ওই আলমারি বা ড্রেসারটা ফেলে দিয়ে টেবিলটাকে ওখানে রাখা হয়েছিল। কেন? সম্ভবত দেয়ালের ওই গর্ত দিয়ে প্রাণ রক্ষা করার জন্যে কেউ এত সব করেছে বলে মনে হয়। দেখা দরকার।'

'পাগল হয়েছেন আপনি! এই দাউ-দাউ আগুনের মধ্যে দিয়ে ওখানে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ওখানে গিয়ে লাভই বা হচ্ছে কি?'

দীর্ঘদেহী কোন কথা বলল না ইন্সপেক্টর কবির আহমেদের কথার উত্তরে, নড়লও না এতটুকু। কামাল বলল, 'কি করা যায়!'

দীর্ঘদেহী বলে উঠল, 'আর তো সময় নষ্ট করা যায় না।'

কথাটা বলে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে লাফ দিয়ে ছুটল সে। কামাল বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। বাকি দু'জন পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! মাথা খারাপ লোক নাকি আপনি, সাহেব! দাঁড়ান, দাঁড়ান।'

কিন্তু ততক্ষণে দীর্ঘদেহী জ্বলন্ত ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। ওরা তিনজন অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকিয়ে রইল। দীর্ঘদেহী খসে পড়া দরজা টপকে লাফ মারতে মারতে দ্বিতীয় ঘরটার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বিদ্যুৎবেগে লাথি মেরে জ্বলন্ত টেবিলটা দূরে সরিয়ে দিল সে। তারপর দেয়ালের দিকে মুখ করে লাফ মেরে গর্তটা ধরে ফেলল। ধীরে উঠে পড়ল তার শরীরটা। ধোঁয়ায় মাঝে-মধ্যে ঢেকে যাচ্ছে তার শরীর, ওরা তিনজন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না।

ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল দীর্ঘদেহী গর্তের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চরম উত্তেজিত কয়েকটি মুহূর্ত।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পুরো একটা মিনিট। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে সকলে। কিন্তু দীর্ঘদেহী দুঃসাহসী ভদ্রলোকের দেখা নেই।

দু'মিনিট পার হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'মি. কামাল, ভদ্রলোকের পরিচয় কি? এমন অসম্ভব দুঃসাহস আমি জীবনে কারও মধ্যে দেখিনি। ভদ্রলোক এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই পারতেন। আমার বিশ্বাস এতক্ষণে আগুনে পুড়ে খতম হয়ে গেছেন।'

কামালের মুখ-চোখ আশঙ্কায় পাথরের মত হয়ে উঠেছে। এমন সময় দমকলের শব্দ পাওয়া গেল। দুটো গাড়ি এসে থামল। দ্রুত কাজ শুরু করে দিল কর্মীরা। ইন্সপেক্টর দমকলবাহিনীর একজন অফিসারকে বলল, 'একজন ভদ্রলোক ভিতরে গেছেন মিনিট তিনেক হল। তাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুন আগে।'

অফিসার বললেন, 'আগুন নেভানর পর উদ্ধার করা সম্ভব। দেখছি আমরা কিভাবে কি করা যায়।'

পাইপ দিয়ে পানি নিক্ষেপ শুরু করা হল। কিন্তু অকস্মাৎ পাইপের পানির ধাক্কায় ধসে পড়ল সামনের দুটো ঘর। কামাল চোখ বন্ধ করল। সব আশা নিভে গেল ওর মন থেকে। থরথর করে কেঁপে উঠল ওর সর্বশরীর।

'ভদ্রলোকের কপালে মৃত্যু ছিল, কি আর করবেন!' ইন্সপেক্টর মন্তব্য করল।

আবার জিজ্ঞেস করল সে, 'ভদ্রলোকের নাম কি?'

কামাল কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'কুয়াশা!'

কিন্তু কেউ তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল না। ঘটনার নিদারুণ আঘাতে গলা তার এমন কেঁপে গেছে যে কি বলল বোঝা গেল না। পরমুহূর্তে ওদের পিছনে মোটা, ভারি একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমার সঙ্গে এসো কামাল। শহীদকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।'

বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। দেখল দীর্ঘদেহী সেই দুঃসাহসী ভদ্রলোক রূপান্তরিত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা সামনে। তার পোশাক পুড়ে গেছে সর্বত্র। হাতও অক্ষত নয়।

কামাল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। বাকি সকলের চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। কামাল নিজেকে সামলে নিয়ে ঢোক গিলে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কি ভাবে!'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'গর্ত দিয়ে নেমে দেখি একটা প্যাসেজে পড়ে রয়েছে দুটো দেহ। শহীদকে চিনতে পারলাম, অপরজন একটি যুবতী। দু'জনেই অজ্ঞান। প্যাসেজের দুটো দরজায় তখন আগুন জ্বলছে। একটা দরজা ভেঙে ফেলতে সময় লাগল। দরজা ভেঙে একজন একজন করে দু'জনকেই বের করে ঘাসের উপর শুইয়ে রেখেছি। ওদের অবস্থা বিপদজনক পর্যায়ে পৌঁছায়নি, ভাগ্য বলতে হবে। তবু কোন নার্সিং হোমে পাঠানো দরকার। এসো, দেরি কোরো না, কামাল।'

কামাল শুধু অস্ফুটে বলল, 'তোমার মত অসমসাহসী মানুষ পৃথিবীতে মাত্র একজনই আছে—সে হচ্ছ তুমি। একথা আজ আবার কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।'

কুয়াশা ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করেছে।

চার

নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে আছে শহীদ। খানিক আগে মি. সিম্পসন উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে তেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে না। মাত্র এক ঘন্টা ছিলেন তিনি হাসপাতালে। কামালও উপস্থিত।

মিস রোশনার কথা মনে পড়ে গেল শহীদের। উঠে বসল ও বেডে। অসুস্থতা-বোধ প্রায় সম্পূর্ণই দূর হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল ও, 'মিস রোশনা কোথায়?'

'তোমার পাশের রুমেই আছে সে। একটু বেশি অসুস্থ, তবে ঠিক হয়ে যাবে দু'একদিনের মধ্যেই।' মি. সিম্পসন বললেন।

কামাল শহীদকে উদ্ধারের জন্য কুয়াশার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা বলল। সব শুনে শহীদ নীরব রইল বহুক্ষণ। তারপর বলে উঠল, 'ওর প্রতি ঋণ আমাদের দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।'

মি. সিম্পসন রিপোর্ট পড়ে এসেছেন, তিনি জানালেন, 'শামিম হায়দার এবং আমান গাজীও নাকি বন্দী হয়েছিল। কিন্তু কিভাবে যেন আমান গাজী নিজেকে মুক্ত করে। মুক্ত হয়ে আমাকে এবং শামিম হায়দারকে জ্বলন্ত ঘর থেকে উদ্ধার করে

নিয়ে আসে উঠানে।'

শহীদ সব শুনল। তারপর কি যেন ভাবতে ভাবতে বলে উঠল, 'আমি আগামীকালই ফিরে যাচ্ছি ঢাকায়। কিন্তু কামাল, কুয়াশা আর তুই খবর পেলি কি ভাবে?'

কামাল বলল, 'আমি মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আশ্চর্যজনক দ্রুতভাবে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম কুয়াশার ডাক্তার বন্ধুদের আবিষ্কার করা ওষুধ খেয়ে। তুই তো সে খবর জানতিস না। কুয়াশা তোকে চমকে দেবে ভেবেছিল আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে। কুয়াশা তাই আমাকে নিয়ে তোর কাছে গিয়েছিল। মহুয়াদি বলল—তুই চলে গেছিস মি. সিম্পসনের সাথে। তোর খোঁজে ফোন করতেই সব জানা গেল। সাথে সাথে চলে এলাম মধুপুর থানায়।'

শহীদ বলল, 'যাক, এই কেসে কুয়াশার দান অনস্বীকার্য। সে আমাদের দু'জনকেই নতুন জীবন দান করেছে।'

পরদিন ঢাকায় ফিরল শহীদ।

বিকেলে শামিম হায়দারের বাড়িতে গেল ও। শামিম হায়দারকে না দেখতে পেয়ে শহীদ আমান গাজীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বন্ধু কোথায়?'

'তার আম্মাকে দেখতে গেছে। কিন্তু আপনার আগমনের হেতু? জবানবন্দী? জেরা? এ পর্যন্ত তিনজন পুলিস অফিসারকে সব কথা বলেছি আমি। আর একটা স্টেটমেন্টও সই করেছি।'

শহীদ বলল, 'আমি সত্য জানতে চাই।'

'সত্য আপনি আমার স্টেটমেন্টেই পাবেন, মি. শহীদ। আমরা একটা মেসেজ পেয়েছিলাম ওই ফার্মে যাবার, সেখানে গেলে রোশনাকে পাওয়া যাবে এই খবরও ছিল। হয়ত পুলিসের সাহায্য ছাড়া গিয়ে ভুল করেছি আমরা, কিন্তু সেই রকম নির্দেশই দেয়া হয়েছিল আমাদেরকে। যে নির্দেশ দিয়েছিল সে দু'একটা কথা জানত রোশনা সম্পর্কে। এখনও মনে করেন নাকি রোশনা স্বইচ্ছায় গায়েব হয়ে গিয়েছিল?'

'আমি জানি না!'

'মানে! কি বলতে চান আপনি! রোশনা প্রায় মরে গিয়েছিল, একি তার নিজের কাজ?'

শহীদ বলে উঠল, 'দুর্ঘটনা সচরাচর ঘটেই থাকে। এমন কোন প্রমাণ আমি পাইনি যাতে বোঝা যায় ও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওখানে ছিল।'

'আপনি পাগল হয়েছেন!'

'আমি পাগল হইনি। আমি জানি না মিস রোশনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল কিনা। ব্যাপারটা দাঁড়ায় সেই রকমই, কিন্তু সে নিজেও ব্যাপারটা তৈরি করে থাকতে পারে—যদি তাই-ই হয় তাহলে সে মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে। কি

ভুল? সে এমন একজন লোককে বিশ্বাস করে এই সব ব্যাপার তৈরি করছে যাকে বিশ্বাস করা তার উচিত হচ্ছে না। লোকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। এবং মিস রোশনার কীর্তিকলাপ এখনও সন্দেহজনক।'

'সন্দেহজনক!'

'সন্দেহজনক আপনার আচরণও।'

'কেন? কেন? কিসের জন্যে আমাকে সন্দেহ করা? একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং একজন পুলিস অফিসারকে রক্ষা করার জন্যে নাকি?'

শহীদ বলল, 'কিন্তু এখনও জানতে পারিনি আমি যে কিভাবে আপনি নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হলেন, এখনও জানতে পারিনি আমি যে, তারা কেন আপনাকে এমন সহজ ভাবে বেঁধেছিল যার ফলে আপনি মুক্ত হতে পারলেন। তারা অন্য কোন ব্যাপারে অমনযোগী হয়নি, কেন আপনার ব্যাপারেই হল? এবং এখনও আমি জানতে পারিনি যে আমি এবং মিস রোশনা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছি মনে করে আপনি সাহসিকতাপূর্ণ উদ্ধার পর্ব শুরু করেন কিনা। না, আমি পাগল নই। এবং এই সব প্রশ্নের উত্তর আমি চাই।'

আমান গাজী কেবিনেটের দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মদের বোতল বের করে গ্লাসে ঢালল। তারপর ফিরে এল স্বস্থানে। শহীদ বলে চলল, 'আপনি বিপজ্জনক লোকদের সাথে মেলামেশা করছেন, মি. গাজী। শামিম হায়দারের সাথে এত সখ্যতার কারণ কি আপনার?'

'শামিম হায়দার চমৎকার ছেলে। ওর বোনকে আমি ভালবাসি—তেমনি ওকেও। আমি বিপদমুক্ত দেখতে চাই রোশনাকে।'

'যাক, কোথায় গেছে শামিম হায়দার?'

'তার আম্মাকে দেখতে।'

শহীদ ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল। মিসেস জামিলের চাকরানী ফোন ধরল অপর প্রান্তে। সে জানাল শামিম হায়দার আজ ওখানে একবারও যায়নি। আর একটা খবর দিল সে—মিসেস জামিল মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পুলিস বিভাগের নার্স শহীদকে উপস্থিত হতে অনুরোধ জানাচ্ছে এখুনি মিসেস জামিলের বাড়িতে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে শহীদ ডায়াল করল মি. সিম্পসনকে। মিসেস জামিলের বাড়িতে একজন ডাক্তার পাঠাবার জরুরী পরামর্শ দিল ও মি. সিম্পসনকে। তারপর ছেড়ে দিল ফোন। আমান গাজীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে শামিম হায়দারের বাড়ি থেকে বিদায় নিল শহীদ। বাড়ির বাইরে পাহারারত একজন কনস্টেবল ছিল সিভিল ড্রেসে। সে শহীদের প্রশ্নের উত্তরে জানাল, শামিম হায়দার সকাল সাড়ে ন'টায় গাড়ি ছাড়াই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

শহীদ ভাবল, তারমানে শামিম হায়দার বাড়ির ভিতর লুকিয়েও নেই, সে তার

আম্মাকেও দেখতে যায়নি। লুকিয়েই বা থাকবে কেন সে? কেনই বা হায়দার পরিবারের কেউ কিছু লুকিয়ে রাখবে? নিজেদের জীবনকে অমন সব বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কি লাভ ওদের? শহীদ কিছুদিন আগে ভেবেছিল কেসটা বোধহয় মীমাংসা হয়ে যাবার পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভুল মনে হয়েছিল।

এখন সে ব্যাপারটার জটিলতা বুঝতে পারছে। মি. জামিল বলছেন তিনি তাঁর ভাইপো গোলাম হায়দারকে হত্যা করেননি, অথচ কে করেছে তা-ও বলছেন না। কেন এই আত্মত্যাগ? তবে কি কাউকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে রক্ষা করতে চাইছেন তিনি? কাকে?

নিজের ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগেনটা নিয়ে এগারো নম্বর চাঁন অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছুল শহীদ। চাকরানী দরজা খুলে দিল। এই চাকরানীটার বয়স হয়েছে, খ্যাঁদার মা বলে সবাই ডাকে তাকে। মি. জামিল হায়দারকে গ্রেফতার করার দিন এই-ই দরজা খুলে দিয়েছিল।

শহীদ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই খ্যাঁদার মা বলল, 'বিবিসাহেব বড্ড অসুস্থ। দু'জন ডাক্তার এসেছেন। আপনি উপরে যান, কিন্তু রুমের ভিতর থেকে আপনাদের নার্স দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

শহীদ উপরে এল খ্যাঁদার মা'র সঙ্গে। একটু পরই খুলে গেল মিসেস জামিলের রুমের দরজা। পুলিস বিভাগের সার্জন ড. মল্লিক বেরিয়ে এলেন রুমের ভিতর থেকে। শহীদ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। ড. মল্লিক বললেন, 'কোন মতে প্রাণ রক্ষা পেয়ে গেল মিসেস জামিলের। সময় মত হাজির হতে পেরেছিলাম অন্তত।'

'ব্যাপারটা আসলে কি?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তরে ড. মল্লিক বললেন, 'আমার বিশ্বাস আর্সেনিক পয়জন পেটে পৌঁছেছিল, কয়েক ঘন্টার মধ্যে ফাইনাল রিপোর্ট দিতে পারব আমি, মি. শহীদ। তবে আর্সেনিক না হলেও ওই জাতীয় কোন বিষ তাতে সন্দেহ নেই। মিসেস জামিল আমাদের নার্সের তত্ত্বাবধানে না থাকলে বাঁচতেন কিনা সন্দেহ।'

ড. মল্লিক চলে গেলেন। মিসেস জামিলের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান রুমের ভিতরই রয়ে গেছেন। শহীদ খ্যাঁদার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আজ সকাল থেকে কে কে দেখা করতে এসেছিল তোমার বিবিসাহেবের সাথে?'

'কেউ না, হুজুর। শামিম সাহেব ফোন করেছিলেন, ফোন ধরেছিল বাবুর্চি। বাবুর্চি আর আমি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই কাজ-কর্ম করার জন্যে। বাবুর্চি বাজারে গেছে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে।'

খ্যাঁদার মা'র আতঙ্কিত ভাবটা দৃষ্টি এড়াল না শহীদের। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিচে এসে দাঁড়াল শহীদ। খ্যাঁদার মা-ও সঙ্গে সঙ্গে এল। শহীদের চোখ পড়ল রান্না ঘরের দিকে। কি যেন দেখে এগিয়ে গেল ও। তারপর প্রশ্ন করল, 'বাবুর্চি কখন গেছে মার্কেটিং করতে?'

'সকালে।' খ্যাঁদার মা উত্তর দিল।

শহীদ জানতে চাইল, 'তুমি কোথায় ছিলে বাবুর্চি বাইরে যাওয়ার পর?'

'সাড়ে ন'টার সময় বাইরে গেছে বাবুর্চি। আমি উপরে বিছানা তৈরি করছিলাম। বিবিসাহেব আমাকে ডেকে বললেন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে, আর তাঁর পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে। বাবুর্চি চলে যাবার পর নিচে নামিনি আমি, হুজুর।'

শহীদ বলল, 'আমাকে বাড়ির পিছনের গেটটা দেখিয়ে দাও একবার।'

বাড়ির পিছনের দরজাটা শহীদ চিনত আগে থেকেই। কেন যে শহীদ খ্যাঁদার মাকে কথাটা বলল তা সে নিজেই ভাল বুঝতে পারল না। ও তখন চিন্তা করছিল কিচেনরুমের কথাটা। কিচেনরুমের মেঝেতে পোড়া সিগারেটের একটা টুকরো দেখতে পেয়েছে ও। গোল্ডলিফের টুকরো। এত দামী সিগারেট বাবুর্চি নিশ্চয় খায়নি। তাহলে কে খেতে পারে আর?

শহীদ পিছনের দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এই দরজার চাবি কার কাছে থাকে?'

'বাবুর্চির কাছে একটা, আমার কাছে একটা...হুজুর, আসলে এ বাড়ির সকলের কাছে এই দরজার চাবি একটা করে আছে। আর ছিল গোলাম হায়দার সাহেবের কাছেও একটা।'

'কেন? সকলের কাছে বাড়ির পিছন দিককার চাবি থাকার কারণ কি?'

'বাড়ির গ্যারেজটা পিছন দিকেই, হুজুর। প্রায়ই পিছন দিক দিয়ে সকলে আসা-যাওয়া করে।'

শহীদ বলল, 'দেখি, তোমার চাবিটা দাও আমাকে।'

চাবিটা দেখল শহীদ। তারপর ফিরে চলল বাড়ির ভিতর দিকে। দোতলায় একবার উঠল। খ্যাঁদার মাকে বিদায় করে দিয়েছে ও আশপাশ থেকে। একতলা এবং দোতলার মধ্যবর্তী সিঁড়ির ধাপের কাছে ডার্করুমটা—এই ডার্করুমে মিসেস জামিল তাঁর নিজের হাতে শখ করে তোলা ফটোগুলো ধোলাই করতেন, শহীদ কয়েক মিনিট রুমটার ভিতর কাটাল। কিন্তু নতুন কিছুই চোখে ঠেকল না ওর। এরপর মিসেস জামিলের বাড়ি থেকে বের হয়ে এল ও। সিধে আবার উপস্থিত হল শামিম হায়দারের বাড়িতে।

কলিংবেল টিপতে এবার দরজা খুলে দিল শামিম হায়দার। লিভিংরুমে গিয়ে বসল ওরা। শহীদ বলল, 'সকালবেলা খুব ব্যস্ত ছিলেন, কেমন? আপনার আম্মাকে দেখে কিরকম মনে হল আজ?'

'আম্মাকে দেখতে যাইনি আমি। এমনি রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছি।'

অস্বীকার করল শামিম হায়দার। শহীদ বলল, 'আপনি প্রমাণ করতে পারবেন আজ সকালে আপনার আম্মাকে দেখতে যাননি? কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আপনার চাবির গোছাটা দেখতে চাই আমি।'

শামিম হায়দার তার চাবির গোছা বের করে দিল। অনেকগুলো চাবির মধ্যে শহীদ দেখল খ্যাঁদার-মা'র কাছে যে চাবি আছে সেই রকম একটা শামিম হায়দারের কাছে রয়েছে। গোছাটা ফেরত দিয়ে শহীদ বলল, 'আপনি আপনার আম্মার বাড়িতে আজ গিয়েছিলেন। কথাটা অস্বীকার করার চেষ্টা করবেন না। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আপনাকে আমার সাথে থানায় যেতে বাধ্য হতে হবে।'

শহীদের কথা শেষ হওয়া মাত্র আচমকা শামিম হায়দার প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ওর মুখে। তারপরই ছুটল খোলা দরজার দিকে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘুসি খেয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল শহীদের। কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ওর নিজেকে সামলে নিতে। সামলে উঠে দৌড়াবার কথা ভাবতেই ও দেখল আমান গাজী ওর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে নয় অবশ্য, কিন্তু পথরোধ করার সম্পূর্ণ ইচ্ছা তার। শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে আমান গাজীর তলপেটে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি মেরে বসল শহীদ। তারপর দরজা দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল ও। বাইরে বের হয়ে দেখল পাহারাদানরত কনস্টেবলটি পেটে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বুঝতে বাকি রইল না আর শহীদ যখন দেখল গ্রীন রঙের টয়োটা করোনাটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রাস্তার মোড়ে। শামিম হায়দার কনস্টেবলটিকে ঘুসি মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

শহীদ ফিরে এল। আমান গাজী যে রূমে রয়েছে ওখান থেকে থানা হেডকোয়ার্টারে ফোন করল ও শামিম হায়দারের গাড়িকে আটক করার জরুরী নির্দেশ দিয়ে।

আমান গাজী ব্যথায় মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, 'আপনার শরীরে বড্ড জোর। লেগেছে। খামোকা মারলেন কেন আমাকে?'

'এ আর এমন কি, এর চেয়ে কড়া মার আপনার কপালে আছে।'

কথাটা বলে বেরিয়ে এল বাইরে।

মি. সিম্পসন অফিসেই ছিলেন।

সকল কথা জানাল শহীদ তাঁকে। মি. সিম্পসন বললেন, 'তাহলে কি শামিম হায়দারই তার মাকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, শহীদ? তাই যদি হয় তাহলে তো সে-ই তার চাচাত ভাইকে হত্যা করেছে বিষ দিয়ে। এবং মি. জামিল ছেলেকে রক্ষা করার জন্যে নিজে গ্রেফতার হয়েছেন।'

শহীদ বলল, 'অন্তত মনে হচ্ছে তা-ই। এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে শামিম হায়দার তার মায়ের বাড়িতে আজ গিয়েছিল। কিন্তু মিলছে না একটা ব্যাপার। গোলাম হায়দারকে সে খুন করেছে একথা তার মা জেনে ফেলেছে মনে করে যদি সে মাকে খুন করতেই যাবে তাহলে কেন সে আমান গাজীকে বলে গেল কোথায় যাচ্ছে সে, আর আমান গাজী আমাকে কেনই বা বলে দিল কথাটা? কেউ খুন করতে গেলে বলে-কয়ে যায় কি? যাকগে, এই কেসের অনেক রহস্যই এখনও

জানা নেই আমার। মি. সিম্পসন, আজই আমি মিস রোশনার সাথে দেখা করতে যাব। কিন্তু তার আগে আমি যেতে চাই সেই ফার্ম হাউসে।'

'ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক। আচ্ছা শহীদ, তোমার মনে আছে তো যে মি. জামিল হায়দারের অবৈধ এক সন্তান আছে এবং সেই সন্তানের কথা তাঁর ভাইপো গোলাম হায়দার জানত বলেই সে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে পেরেছিল। আমরা জানি যে আমান গাজীর কোন আত্মীয়স্বজন ইরাকে নেই। মি. জামিলের সেই অবৈধ সন্তানই আমান গাজী নয় তো? মিস রোশনার সাথে তার প্রেমের কথা সে যা বলছে তা হয়ত মিথ্যে কথা।'

শহীদ বলল, 'তা-ও হতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে, সিদ্ধান্ত নেবার আগে, মিস রোশনা কেন গিয়েছিল ইরাকে। আমার মনে হয় মিস রোশনা শুধু জানত তার বাবাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। কিন্তু সে জানত না তার চাচাত ভাই ব্ল্যাকমেল করছে। তার আম্মাকে ইরাক থেকে বয়স্ক এক আমান গাজী চিঠি লিখত, একথা হয়ত সে জানত। এবং ব্ল্যাকমেলের সাথে এই বয়স্ক আমান গাজীর সম্পর্ক আছে মনে করে সে খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যে হয়ত গিয়েছিল ইরাকে। কিন্তু বয়স্ক আমান গাজীর সাথে দেখা হয়ত তার হয়নি এবং সেই জন্যেই সম্ভবত ঢাকায় ফিরে অবদি তাকে অস্থির, অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। বদলে পরিচয় হয়েছিল ইরাকে তার সাথে যুবক আমান গাজীর। এবং ওরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি মিস রোশনার ফটো ছাপায় আপত্তি দেখে। কেন সে খবরের কাগজে ছবি ছাপতে কোন মতেই রাজি হয়নি?'*

এমন সময় বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলে কথা বললেন মি. সিম্পসন। ফোন ছেড়ে দিয়ে তিনি শহীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'শামিম হায়দারের গ্রীন টয়োটা পাওয়া গেছে যাত্রাবাড়ির কাছে রাস্তার উপর। তার দেখা পাওয়া যায়নি। আশা করা যায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে খোঁজ পাওয়া যাবে তার।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে, চলুন বেরিয়ে পড়ি আমরা।'

ফার্ম হাউসের দিকে যাবার পথে শহীদ গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ও ভাবছিল, মিস রোশনা তার সাথে কথা বলার প্রথম দিনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে তার আম্মাকে হত্যা করার চেষ্টা হতে পারে। ঠিক সেই ঘটনাই ঘটছে। তবে কি সব রহস্যই জানা আছে মিস রোশনার? কিন্তু কেন সে তাহলে সব কথা লুকিয়ে রাখছে, তার বাবা হত্যার আসামী জেনেও?

সম্পূর্ণ ব্যাপারটা একটা পারিবারিক ব্যাপার বলে মনে হয় না। কিন্তু তা

---

*কুয়াশা-৩২ দেখুন।

আসলে নয় হয়ত। মিস রোশনা মৌনব্রত অবলম্বন করে একথাই স্বীকার করেছে পারতপক্ষে যে তাকেও ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে। ফার্ম হাউসে তাকে জেরা করে ঢাকা থেকে আগত একজন লোক। কে সে? শামিম বা আমান গাজী নয় তো? হতে পারে, হয়ত মিথ্যে কথা বলেছে মিস রোশনা। কিন্তু শামিম হায়দার কেন ফার্ম হাউসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার বোনকে পুড়িয়ে মারতে চাইবে? আমান গাজীই বা তা চাইবে কেন? আমান গাজীই মি. জামিলের অবৈধ সন্তান তার কোন প্রমাণ নেই, শুধু দু'একটা ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সম্ভাবনার।

মি. সিম্পসন গাড়ি থামালেন মধুপুর থানায়। অফিস রুমে গিয়ে বসল ওরা। ইন্সপেক্টর কবীর আহমেদ উঠে দাঁড়াল।

মি. সিম্পসন তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। শহীদ প্রশ্ন করল, 'শেখ অ্যাণ্ড মোহাম্মদ ফার্ম সম্পর্কে কি কি তথ্য পেলেন, ইন্সপেক্টর।'

'স্যার, দুই বন্ধুর ফার্ম ওটা। তবে মোহাম্মদ মারা গেছে অনেক বছর আগে, তার কোন ছেলেমেয়েও নেই। শেখরাই চালায় ফার্মটা। ক্যাপিটাল নেই, ভাল চলে না ফার্ম। শেখ নামে একজন লোক এবং তার ছেলে থাকত—আগুন লাগার ঘটনার পর দু'জনাই পালিয়েছে। শেখের ছেলেটাই রাইফেল তুলে বাধা দিয়েছিল আপনাকে সম্ভবত। যে আক্রমণ করেছিল সে হয়ত শেখ স্বয়ং। কিছু গুজব শোনা গেছে ফার্মটা সম্পর্কে। বেশ কিছুদিন যাবত নাকি রহস্যময় আলো দেখা যায়, আশপাশের বাড়ির ছাদ থেকে গ্রামের লোকেরা নাকি দেখেছে। গুপ্তচর বলে বদনাম ছড়িয়ে পড়ে ওদের। কিন্তু অনুসন্ধান করে কোনদিন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। আগুন লাগার ঘটনা ঘটার আগে একজন কৃষকের কাছ থেকে জানা যায় যে একটা বিশেষ ধরনের গাড়িকে কয়েকবার এই ফার্মে যেতে-আসতে দেখেছে সে। গাড়িতে যারা আসত তারা সবাই পুরুষ। না, লোকগুলোর বর্ণনা দিতে পারেনি সে, দূর থেকে দেখেছিল। তবে একটা তথ্য জানা গেছে। প্রতি সাপ্তাহিক ছুটি কাটাবার জন্যে খন্দকার নামে একজন লোক ওই ফার্মে আসত। শিকারও করত সে।'

শহীদ জানতে চাইল, 'খন্দকারের চেহারার বর্ণনা?'

'বেঁটে কালো। এর বেশি কিছু জানা যায়নি তার সম্পর্কে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমরা ফার্ম হাউসটা দেখতে চাই।'

ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন, স্যার।'

ফার্ম হাউসের পিছন দিকে এল ওরা গাড়ি থেকে নেমে। মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'তোমার উদ্দেশ্যটা কি, শহীদ? কি আশা করছ তুমি?'

শহীদ ফার্ম হাউসের গুদাম ঘরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'সে কথা আমি নিজেই জানি না। হঠাৎ মনে হল ফার্ম হাউসটা আর একবার ঘুরে ফিরে দেখা দরকার—তাই।'

গুদাম ঘরের ভিতর খালি চটের বস্তা, পেঁয়াজের খোসা, শুকনো লঙ্কা, কপির শুকনো পাতা ছড়ানো ছিটানো। ঘরের একদিকের দেয়ালে নতুন সিমেন্ট করা হয়েছে গোল করে, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে। সেদিকে তাকিয়ে ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল ওর। হঠাৎ ও বলে উঠল, 'মি. সিম্পসন, ওই জায়গাটায় নতুন সিমেন্ট করা হয়েছে, কারণ কি?'

ইন্সপেক্টর এবং মি. সিম্পসন সেদিকে তাকালেন। ইন্সপেক্টর বলল, 'হয়ত চোরা পথ ছিল, সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তাই হবে।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু মনটা বড্ড খুঁত খুঁত করছে আমার। কারণটা আমি নিজেই জানি না। অকারণে খুঁত খুঁত করে না তো আমার মন। ইন্সপেক্টর, লোকজন আনার ব্যবস্থা করুন। ওর ভিতর কি আছে তা না দেখে ফিরছি না আমি।'

শহীদের কথা শুনে অবশেষে লোকজন ডেকে সিমেন্ট করা জায়গাটা ভাঙা হল। ভাঙা হতেই দেখা গেল চওড়া দেয়ালের ভিতর কে যেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে ঘাড়-মাথা গুঁজে। মৃতদেহটা দেখে মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার, শহীদ!'

লাশটাকে অনেক কষ্টে দেয়াল থেকে মেঝেতে নামানো হল। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে পরখ করল ওরা। মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'লোকটা এ-দেশীয় নয় বলে মনে হচ্ছে।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, লোকটা ইরাকী। এবং ওর নামও আমি জানি। ওর নাম মোহাম্মদ আমান গাজী, বা এই নাম সে কিছু সময় ব্যবহার করত। বয়স ষাটের কাছাকাছি।'

লাশটার পকেট থেকে একটা নোট-বই পাওয়া গেল। তাতে পাওয়া গেল তিনটে ফটো। একটা মিস রোশনার। দ্বিতীয়টা মিসেস জামিলের। তৃতীয়টা অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলার। নোট-বইয়ে নাম লেখা—মোহাম্মদ আমান গাজী।

শহীদ বলল, 'ইন্সপেক্টর, লাশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমরা এখানে আর সময় নষ্ট করতে পারছি না।'

পাঁচ

সেই রাতেই শহীদ নার্সিং-হোমে দেখা করল মিস রোশনার সঙ্গে। শারীরিক কুশলাদির পর শহীদ উদ্দেশ্যমূলক আলাপ শুরু করার জন্যে বলল, 'একটা কথা স্বীকার না করে আর উপায় নেই আমার—মি. আমান গাজী সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে আপনাকে। সে আপনাকে রক্ষা করেছে পুড়ে মরা থেকে, আমাকেও।

নিজে মুক্ত হয়ে পুলিসের দৃষ্টিতে না পড়লে মি. সিম্পসন সহ আমরা কেউ বাঁচতাম না। কেউ জানতেই পারত না আমরা কোথায় আছি।'

মিস রোশনা বলল, 'তাই নাকি।'

শহীদ কথাগুলো ব্যাখ্যা করে আবার বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল ও, 'আপনি ইরাকে মি. আমান গাজীর সাথে দেখা করতে কেন গিয়েছিলেন বলুন তো? আমার ধারণা আপনি জানতেন একজন মোহাম্মদ আমান গাজী আপনার আব্বাকে ব্ল্যাকমেল করেছে, এবং তার সাথে বোঝাপড়া করতে গিয়েছিলেন আপনি ইরাকে। গোলাম হায়দার ব্ল্যাকমেল করার ব্যাপারে একজন সহকারী হিসাবে কাজ করত। কিন্তু ইরাকেই বাস করত আসল ব্ল্যাকমেলার। তাই নয় কি? এবং আপনি যাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন তাকে পাননি, পেয়েছিলেন অন্য এক আমান গাজীকে, যে আপনার প্রেমে পড়ে। আপনি যে আমান গাজীকে খুঁজছিলেন তার বয়স ষাটের কাছাকাছি।'

বিস্মিত কণ্ঠে মিস রোশনা শুধু বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য! এত কথা জানলেন কিভাবে আপনি!'

'কারণ সেই বয়স্ক আমান গাজীর সন্ধান আমি পেয়েছি। এই ঢাকা শহরেই। আর ভয় নেই আপনার, সে আর কোন ক্ষতি আপনাদের করতে পারবে না।'

বিমূঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে মিস রোশনা, 'মানে! বলেন কি, সে কি তাহলে বলছে···।'

মিস রোশনা হঠাৎ থেমে গেল। হঠাৎ দু'চোখ ভরে উঠল তার পানিতে। ঝরঝর করে গাল বেয়ে ঝরে পড়ল পানির ধারা। শহীদ বুঝতে পারল এ পানি মুক্তির, দুশ্চিন্তা-মুক্তির, আনন্দের। অবশেষে চোখ মুখ মুছে সে বলতে শুরু করল, 'এবার সব কথা বলতে চাই আমি। আব্বাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। আমি এবং শামিম জানতে পারি যে গোলাম ব্ল্যাকমেল করছে, কিন্তু আমান গাজীর কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে এ কাজ করছে সে। আমান গাজী আমার আব্বা এবং আম্মার বন্ধু ছিল বহুদিন আগে। সে কিভাবে অবৈধ সন্তানের গোপন সংবাদ জানতে পেরেছিল তা আমরা জানি না। আমার বাবার বিয়ে হবার দু'বছর আগে ঘটনাটা ঘটে, অবৈধ সন্তান জন্মলাভ করে কোলকাতায়। তারপর আবার বিয়ে করেন তিনি। আম্মাকে তিনি ভালবাসেন, এবং আজ প্রায় তিরিশ বছর পরও কথাটা তাকে তিনি জানাতে পারেননি লজ্জায়। কথাটা আমরা জানতে পারি। আমান গাজীর সহকারী ছিল গোলাম হায়দার, আবার গোলাম হায়দারের সহকারী ছিল ইয়াকুব। ইয়াকুব আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। সেই জন্যেই ইরাকে যাবার সময় ওকে আমার বাড়ি ব্যবহার করার অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি। আমি ইরাকে গিয়েছিলাম আমান গাজীকে খুঁজে বের করে ব্ল্যাকমেলিং ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে! কেননা টাকার দাবি ক্রমশ বেড়ে চলেছিল ওদের, এবং আমার আম্মা

অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন।'

মিস রোশনা ঢোক গিলে শুরু করল, 'আসল আমান গাজীকে খুঁজে পাইনি আমি। বদলে পরিচয় হল যুবক আমান গাজীর সাথে। ওর প্রেমে পড়লাম আমি, এবং ও পড়ল আমার প্রেমে। আমাকে অস্থির চিন্তিত দেখে সাহায্য করার প্রস্তাব দিল ও আমাকে। কিন্তু আমি এড়িয়ে গেলাম প্রস্তাবটা। ভিতরে ভিতরে খোঁজ করতে লাগলাম বয়স্ক আমান গাজীর। এমন সময় খবর গেল গোলাম হায়দার নিহত হয়েছে এবং আমার আব্বাকে করা হয়েছে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার। আমার প্রেমিককে কিছু না জানিয়ে চলে এলাম ঢাকায়। ঢাকায় এসে ভাবলাম, সত্যিই কি আব্বা খুন করেছেন? কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারলাম না। এমনকি এখনও আমি জানি না গোলাম হায়দারকে আব্বা খুন করেছেন কিনা? যাই হোক, আমাদের পরিবারের এইসব কুৎসিত ঘটনা আমি জানতে দিতে চাইনি আমার প্রেমিক আমান গাজীকে। তাই তাকে কিছু না বলে চলে এসেছিলাম ঢাকায়। কিন্তু আমি জানতাম, সামান্য এতটুকু চিহ্ন পেলেই ছুটে এসে পড়বে ও আমাকে সাহায্য করার জন্যে ইর'ক থেকে। তাই খবরের কাগজে ছবি ছাপতে অমন অস্বাভাবিক ভীতি ছিল আমার।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'মিস রোশনা, কেন আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনার আম্মার প্রাণহানীর আশঙ্কা আছে?'

মিস রোশনা উত্তর দিল না। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'কাকে সন্দেহ করেন আপনি? কে আপনার আম্মাকে খুন করবে বলে মনে করেন?'

'কাউকে নয়। কথাটা আমি এমনি বলেছিলাম, যাতে করে আপনারা ধারণা করেন গোলাম হায়দারের হত্যাকারী আমার আব্বা নন, অন্য কেউ। এতে উপকার হত আব্বার। আমার আম্মার জীবন বিপদের মধ্যে ছিল না।'

শহীদ বলে উঠল, 'ছিল। এবং তা প্রমাণিতও হয়েছে। আপনার আম্মার প্রাণ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে, মিস রোশনা।'

বিস্ফারিত হয়ে উঠল মিস রোশনার চোখ জোড়া। চমকে উঠল সে কথাটা শুনে। জিজ্ঞেস করল, 'আম্মা। কেমন আছেন আম্মা?'

'অসুস্থতা কাটিয়ে উঠবেন তিনি। আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, খাবারের সাথে। যাক, এখনও আমি সত্য কথাটা জানি না। আপনি কি মনে করেন আপনার আব্বা গোলাম হায়দারকে হত্যা করেছেন, নাকি আপনার ভাই...'

'অসম্ভব! শামিম ওইরকম একটা নির্মম কাজ...না না! গোলাম হায়দারকে যে খুন করেছে সেই হয়ত আম্মাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। সেই একই বিষ। গোলামকে না হয় খুন করার ব্যাপারে কারণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আম্মাকে কেন যে—আম্মাকে কেউ কেন খুন করার চেষ্টা করবে?'

'হয়ত তিনি প্রকৃত খুনীকে চিনে ফেলেছেন।'

'কিন্তু আম্মা আপনাদেরকে যা-ই বলুন, আমাকে বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন গোলামকে খুন করেছেন আব্বাই! আব্বার নামেই সব দোষ চাপিয়েছেন আম্মা।'

শহীদ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জানতে চাইল, 'ইয়াকুব যে ডকুমেন্টগুলো আপনার ভাইয়ের বাড়িতে চাইতে গিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে আপনি কিছু বলেননি এখনও। সে কি আগে চায়নি ডকুমেন্টগুলো? ডকুমেন্টগুলো আসলে কিসের?'

'না, আগে সে আমার কাছ থেকে ওসব চায়নি। ডকুমেন্টের ব্যাপারে আমার সাথে কোন আলাপই করেনি, কথা হয়েছিল তার শামিমের সাথে। শামিমও সেগুলোর কথা কিছু জানে কিনা জানি না। কিন্তু ইয়াকুবের ধারণা শামিম জানে। তাই শামিমকে মেরেছিল ও, আমাকেও বেঁধে রেখে গিয়েছিল।'*

'কিন্তু ইয়াকুবকে তখন আপনি চিনতে পারেননি বলেছিলেন। কেন?'

'ইয়াকুব আব্বাকে ব্ল্যাকমেল করছিল সেই অবৈধ সন্তানের ব্যাপারে। ইয়াকুবকে চিনতে পেরেছি বললে প্রতিশোধ বশত হয়ত কথাটা দেশময় প্রচার করে দেবে—এই ভয়ে না চিনতে পারার কথাটা বলেছিলাম আমি আপনাকে।

শহীদ বিশ্বাস করতে পারল না মিস রোশনার কথাগুলো। বড় সহজে মেয়েটি মিথ্যে কথা বলতে পারে, এ অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে আগে। ও প্রশ্ন করল, 'ফার্ম হাউসে যে লোকটা ঢাকা থেকে গিয়ে কথা বলেছিল আপনার সাথে সে কি আমান গাজী নয়? ডকুমেন্টের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল যে?'

'না। তাকে আমি আগে কখনও দেখিনি। এ লোকটা বেঁটে, কালো। হ্যাঁ, ডকুমেন্টের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল।'

শহীদ মাথা নিচু করে চিন্তা করতে লাগল। আবার প্রশ্ন করার জন্যে মাথা তুলতেই ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল খোলা জানালার দিকে। আচমকা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল পরমুহূর্তে।

জানালার বাইরে কেবিনের দিকে মুখ করে একজন ছোটখাট কালো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতের রিভলভারটা মিস রোশনার দিকে তাক করা।

মিস রোশনা বসে ছিল বিছানার উপরে। শহীদ আচমকা ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিল তাকে। সেই সঙ্গে লাফ দিয়ে খাটের অপর দিকের মেঝেতে গিয়ে পড়ল ও। গর্জে উঠল রিভলভার। মেঝের এক কোণায় চলে গেল শহীদ গড়াতে গড়াতে। দ্বিতীয়বার আততায়ীর হাতের রিভলভার গর্জে উঠল। শহীদ বুঝতে পারল না প্রথম গুলিটা মিস রোশনাকে আহত করেছে কিনা। দ্বিতীয় গুলিটা মিস রোশনার মাথার উপর দিয়ে গিয়ে লাগল দেয়ালে। শহীদ নিজের রিভলভার বের করল

* কুয়াশা-৩২ দেখুন

দ্রুত। জানালা লক্ষ্য করে কোণ থেকে গুলি করল ও। গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই শোনা গেল দ্রুত পদশব্দ। তড়াক করে লাফ মেরে দরজার দিকে ছুটল শহীদ। দরজার বাইরে তখন চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। নার্সিং হোমের নার্সরা ছুটাছুটি করছে ভয়ে। একজন নার্সকে ধাক্কা মেরে বাঁ দিকে ছুটল শহীদ। করিডরের শেষ প্রান্তে এসে ও দেখল রিভলভারধারী বেঁটে এবং কালো আততায়ী ছুটে পার হয়ে যাচ্ছে নার্সিং হোমের গেট। ফায়ার করল শহীদ।

এত দূর থেকে গুলি লাগার কথা নয়। শহীদ আশাও করেনি। নার্সিং হোমের গেট অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে গেল আততায়ী। শহীদ প্রাণপণে ছুটল রাস্তার দিকে।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই শহীদ তীক্ষ্ণ শব্দ শুনল। কয়েকটা মোটর গাড়ি একই সঙ্গে অকস্মাৎ ব্রেক করেছে। তারই শব্দ হল।

ছুটতে লাগল শহীদ গাড়িগুলোর দিকে। রাস্তার সবগুলো চলন্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে হঠাৎ। শহীদ একাধিক গাড়ির হেডলাইটের অত্যুজ্জ্বল আলোয় দেখল রিভলভারধারী আততায়ী রাস্তার মাঝখানে পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। মাথাটা ফেটে মগজ বের হয়ে গেছে তার। হাতের রিভলভারটা কয়েক হাত দূরে পড়ে রয়েছে। রাস্তা টপকাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে নিজের ইহলীলা সাঙ্গ করেছে আক্রমণকারী। শহীদ কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই বুঝতে পারল মারা গেছে লোকটা।

থানায় ফোন করে লোকটার লাশ পুলিসের জিম্মায় সোপর্দ করে ফিরে এল শহীদ মিস রোশনার কাছে। যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তার ড্রাইভার দাবি করেছে যে রিভলভারধারী লোক নির্বিকার মুখে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে সে মরতে চেয়েছিল। রাস্তায় ডিউটিরত একজন কনস্টেবলও সে কথা সমর্থন করেছে। মিস রোশনা শহীদের প্রশ্নের উত্তরে জানাল যে এই লোকটাই ঢাকা থেকে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিল ফার্ম-হাউসে। এর নাম খন্দকার। মধুপুর থানার ইন্সপেক্টর খন্দকারের যে বর্ণনা দিয়েছিল তার সঙ্গে নিহত লোকটার চেহারা হুবহু মিলে গেছে।

মিস রোশনা শহীদের পরবর্তী প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করল। বলল, 'আমার যা বলবার সবই বলেছি।'

শহীদ মি. সিম্পসনের সঙ্গে দেখা করল নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে। মি. সিম্পসনকে সকল কথা বলল ও। মন্তব্য করল, 'মিস রোশনা আমাকে সব কথা বলে দিচ্ছে মনে করে গুলি ছুঁড়েছিল খন্দকার, এই আমার ধারণা। এবং আমান গাজীকেও হত্যার যে চেষ্টা করা হয়েছিল তা-ও এই সন্দেহে যে মিস রোশনা হয়ত তাকে সব গোপন কথা বলে দিয়েছে। অর্থাৎ একদল লোক চায় না তাদের গোপন কথা জানাজানি হয়ে যাক। মিস রোশনা সকল কথা জানে কিনা সন্দেহ আছে

আমার।'

মি. সিম্পসন জানালেন, 'শামিম হায়দারের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।'

শহীদ বলল, 'আমি একবার পুলিস কমিশনারের সাথে আলাপ করতে চাই, মি. সিম্পসন। আমার সাথে চলুন একবার।'

'নতুন কোন প্ল্যান?'

'না। একটা সন্দেহের কথা বলব তাঁকে। আলোচনা দরকার। কেসটার সম্পূর্ণ ভার প্রথম থেকেই যখন আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন তখন সব দিক দিয়ে এর শেষ না দেখে ছাড়ব না আমি। এমন ছ্যাচড়া কেস আমার জীবনে এটাই প্রথম।'

ওরা দেখা করল পুলিস কমিশনারের সঙ্গে।

কমিশনার কেসের সকল বর্তমান খবরই রাখেন। কুশল বিনিময়ের পর শহীদ বলতে শুরু করল, 'আমি মনে করি এখন আমরা জানি মিস রোশনা এবং তার প্রেমিক আমান গাজীর সম্পর্কটা। এই যুবক সম্পর্কে বেশি মাথা ঘামাবার আর দরকার নেই। কেসটার মীমাংসা এখন এক বা একাধিক রহস্যময় ডকুমেন্টের উপর নির্ভর করছে। ডকুমেন্ট কারা চাইছে তাদের পরিচিতি দরকার আমাদের। ইয়াকুব ছিল একজন এজেন্ট, তাতে সন্দেহ নেই কোন। আমান গাজী—বয়স্ক এবং নিহত আমান গাজীও—একজন এজেন্ট ছিল ব্ল্যাকমেলিং-এর ব্যাপারে এবং গোলাম হায়দারও ছিল আর একজন এজেন্ট। শামিম হায়দারকে যখন চাপ দেয়া হচ্ছিল ডকুমেন্টগুলো আদায় করার জন্যে তখনই নিহত হয় গোলাম হায়দার। ডকুমেন্টের ব্যাপারটা সৃষ্টি হতেই খুনোখুনি শুরু হতে থাকে।'

'এর মানে?' কমিশনার ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন।

শহীদ বলতে থাকে, 'ডকুমেন্টকে কেন্দ্র করেই এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের সূচনা। সুতরাং এই কেসের মীমাংসাও নির্ভর করছে ডকুমেন্টের উপর। কোথায় সেগুলো আছে, সেগুলো আসলে কি বস্তু এবং কারা সেগুলো চায়? একদিকে দেখতে পাচ্ছি শামিম হায়দার বিরাট ঝুঁকি নিয়ে গ্রেফতার না হবার জন্যে পালিয়ে গেছে। কিন্তু খন্দকার কেন নিহত হয়, প্রায় ইচ্ছাকৃত ভাবে? আমার সন্দেহ খন্দকার তার আসল নাম নয়। সে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছে, যেন কেউ তাকে ধরে তার পেট থেকে কথা আদায় করতে না পারে। রাস্তায় যে রকম ভিড় ছিল এবং আশপাশে এত বেশি পুলিস ছিল যে সে সময় পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, একথা সে জানত। তাই প্রায় স্বইচ্ছায় নিহত হয়েছে সে। খন্দকারের মৃত্যু এই কেসকে উঠিয়ে দিয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে। গোলাম হায়দারের হত্যা স্রেফ একজন ব্ল্যাকমেলারকে হত্যা নয়। এটা আমরা এখন বুঝতে পারছি। মরতে রাজি আছে, ধরা পড়ে জেরার সম্মুখীন না হবার চেয়ে, এমন কিছু লোক দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক বেপরোয়া, তারা যা করতে চায় তা করবেই, এইরকম একটা প্রতিজ্ঞা তাদের মধ্যে। বোঝা যায়, তাদের প্রচুর টাকা আছে। তারা একটা ফার্ম-হাউসের

মালিক এবং তার ছেলেকে বশ করার ক্ষমতা রাখে, তারা ইয়াকুবকে বশ করার ক্ষমতা রাখে, তারা গোলাম হায়দারকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতে পারার ক্ষমতা রাখত। তারা নির্দিষ্ট কিছু ডকুমেন্ট চায়, এবং আমাদেরকে সে ব্যাপারে সব কথা বলে দেবে সন্দেহ করে একের পর এক হত্যা এবং হত্যার চেষ্টা করে যাচ্ছে। চারটে প্রশ্নের উত্তর এখন প্রয়োজন। কাগজপত্রগুলো কোথায়? সেগুলো কার কাছে আছে? সেগুলো কি? সেগুলো কে বা কারা চায়? এবং আমরা শেষ প্রশ্নের উত্তর অনুমান করে বলে দিতে পারি।'

'কিন্তু আমি জানি, শহীদ, তুমি অনুমান করে কোন কথা বলা পছন্দ করো না।' কমিশনার স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন।

শহীদ বলল, 'কোন কোন সময়ে অনুমান করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। শেষ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে—ডকুমেন্টগুলো চায় বিদেশী কোন শক্তি। তাদের গুপ্তচর।'

শহীদ একটু হাসল। বলল, 'সময় হয়েছে যখন আমাদের খানিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিলে নয়। আমি চাই মি. জামিল হায়দারের অতীত কর্মজীবনের ইতিহাস নিখুঁতভাবে ঘেঁটে দেখতে। রিটায়ার করার আগে পর্যন্ত মি. জামিল ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সিভিল সার্ভেন্ট। পররাষ্ট্র বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন পররাষ্ট্র বিভাগের কি ধরনের ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ-কর্ম করতেন মি. জামিল। এবং সে ধরনের কোন ডকুমেন্ট নষ্ট হয়েছে বা হারিয়ে গেছে বা চুরি গেছে কিনা। এ কাজ আমার দ্বারা হবার নয়। কিন্তু তথ্যগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজন আমার।'

কমিশনার একটু চিন্তা করে জানালেন, 'বেশ। আমি আজই যাচ্ছি পররাষ্ট্র বিভাগে।'

শহীদ সন্তুষ্ট হল। খানিক পর বিদায় নিল ওরা কমিশনারের অফিস থেকে। মি. সিম্পসন ফিরে গেলেন তাঁর অফিসে। শহীদ গেল থানা হেডকোয়ার্টারের জেল হাজতে। ও দেখা করবে ইয়াকুবের সঙ্গে।

ইয়াকুবকে শহীদ নিহত আমান গাজীর ফটো দেখিয়ে বলল, 'তুমি এই লোককে হত্যা করেছ, তাই না?'

ছবি দেখে ইয়াকুব চমকে উঠল। চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'মিথ্যে কথা!'

শহীদ বলল, 'শেখ অ্যাণ্ড মোহাম্মদ ফার্মে তুমি হত্যা করেছ এই লোককে। অস্বীকার কোরো না।'

সম্মোহিতের মত ফ্যালফ্যাল করে ফটোটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'অসম্ভব! আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এটা। আমি খুন করিনি।'

শহীদ আর একটা ফটো বের করে ইয়াকুবের সামনে ধরল। বলল, 'চিনতে পারো ওকে?'

ফটোটা দেখেই ইয়াকুব আবার চমকাল, বলল, 'খন্দকার! খন্দকারই নিশ্চয় আমান গাজীকে হত্যা করেছে…নিশ্চয় তাই! ফার্ম হাউসেই ছিল ও। আমান গাজীর সাথে একাকী দেখা করেছিল ও। আমি ঢাকায় ছিলাম। খন্দকারই হত্যা করেছে—আমি না।'

শহীদ বলল, 'খন্দকার কে? ওর আসল নাম কি?'

'তা আমি জানি না। আমাকে ও-ই কাজে লাগিয়েছিল।'

শহীদ বলল, 'তুমি যে রিভলভার দিয়ে আমার দিকে গুলি ছুঁড়েছিলে সেই রিভলভারের গুলিতেই নিহত হয়েছে আমান গাজী।'

'আমান গাজী খুন হয়েছে তা আমি জানতামই না। খন্দকার পরে দিয়েছিল আমাকে রিভলভারটা।'

শহীদ ডকুমেন্টের ব্যাপারে প্রশ্ন করল এরপর। কিন্তু কোন উত্তর দিল না ইয়াকুব।

নিরাশ হয়ে ফিরে এল শহীদ বাড়িতে। পুলিস কমিশনার ওর বাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন ওর জন্যে।

পুলিস কমিশনারের চেহারা গম্ভীর দেখাচ্ছে। শহীদকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন গম্ভীর স্বরে, 'শহীদ, তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো ডকুমেন্টগুলো পররাষ্ট্র বিভাগের কিছু হবে বলে?'

'নিশ্চয়। ওই রকমই বিশ্বাস আমার।'

কমিশনার বললেন, 'তুমি ভুল করেছ, শহীদ। পররাষ্ট্র বিভাগের অফিসাররা আমার কথা শুনে হেসেছে। কেউ আমাকে নিয়ে হাসুক তা আমি পছন্দ করি না। পররাষ্ট্র বিভাগের যে সাবজেক্ট নিয়ে মি. জামিল কাজ করতেন সেই সাবজেক্ট সব ঠিক আছে। কিছু চুরি যায়নি, কিছুই হারিয়ে যায়নি। তোমার সন্দেহ ভিত্তিহীন।'

ছয়

পরপর পাঁচ দিন কেটে গেছে।

মি. সিম্পসন দেখা করতে এসেছেন শহীদের বাড়িতে।

গোলাম হায়দার হত্যারহস্য যেখানে ছিল সেখানেই থেমে গেছে। পুলিস কমিশনার মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন শহীদের উপর। ভিত্তিহীন সন্দেহ বশত তিনি পররাষ্ট্র বিভাগকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, শহীদের কথার উপর নির্ভর করে। তা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এ জন্যে তিনি শহীদকেই দায়ী মনে করেন।

কিন্তু শহীদ কোন কথা না বললেও মনে মনে ও তার সন্দেহই সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগের উত্তর শুনে মনে মনে নিরাশ না হয়েও পারেনি ও।

এদিকে নতুন কোন ঘটনাও ঘটেনি। কিছুই ঘটছে না। শহীদের জানা নেই এবার কোন পথ ধরে এগোবে সে।

মি. জামিলের দ্বিতীয় শুনানী হয়ে গেছে, শুনানীর দিন পড়েছে আটদিন পর আবার। শামিম হায়দার এখনও নিখোঁজ। একটা স্টেটমেন্টে সই করে ইয়াকুব স্বীকার করেছে যে সে খন্দকারের কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে কাজ করত, কিন্তু খন্দকার কার কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে কাজ করত তা সে জানে না। খন্দকারের অন্য কোন পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। বয়স্ক আমান গাজী সম্পর্কে শহীদ তথ্য সংগ্রহের জন্যে তার পাঠিয়েছে ইরাকে আবার। কোন উত্তর এখনও আসেনি।

মিস রোশনা তার নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। যুবক আমান গাজী এখনও একা অবস্থান করছে তার ভাই শামিম হায়দারের বাড়িতে। মিসেস জামিল বিষের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনি কিংবা তাঁর স্বামী নতুন কোন বিবৃতি দেননি। যেদিন তিনি বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হন সেদিন শামিম হায়দার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল একথা স্বীকার করেননি তিনি। তাঁর রুমে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেছে সন্দেহাতীত ভাবে যে তাঁকে আর্সেনিক বিষ খাওয়ানো হয়েছে। শহীদ ইয়াকুবের সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছে জেল-হাজতে। ইয়াকুব জানিয়েছে গোলাম হায়দারের সঙ্গে তার দেখা হত। গোলাম হায়দার বেপরোয়া ভাবে ব্ল্যাকমেল করত তার চাচাকে। এবং তার ধারণা গোলাম হায়দারকে তার চাচাই খুন করেছেন। যদিও নির্ভুল, নিখুঁত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অথচ মিসেস জামিল আক্রান্ত হবার পর এই ধারণাই দৃঢ় হয়ে ওঠে যে প্রকৃত খুনী স্বাধীন ভাবে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে।

শেখ অ্যাণ্ড মোহাম্মদ ফার্মের শেখ এবং তার ছেলের কোন সন্ধান এ পর্যন্ত করা যায়নি। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে খন্দকারকে তারা থাকতে দিত ফার্ম হাউসে। এবং তাদেরকে খন্দকার যা বলত তারা তাই পালন করত। বদলে তারা টাকা নিত।

মি. সিম্পসন চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, 'শহীদ, মাই বয়, তুমি এমন চুপচাপ হয়ে গেলে চলবে কেন। একটার পর একটা কেস আসছে, আর তুমি প্রত্যাখ্যান করছ। কতদিন কাটাবে এভাবে? বাদ দাও গোলাম হায়দার হত্যারহস্য। এবার অন্য কাজে মন দাও।'

শহীদ বিষণ্ন ভাবে একটু হাসল। বলল, 'অন্যান্য কেস হাতে না নেবার কারণ হচ্ছে কেসগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিংবা রহস্যময় কিছু নয়। পুলিসের সাহায্যেই ওগুলোর সমাধান সম্ভব। একটা কথা, মি. সিম্পসন। কমিশনার যাই বলুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখনও, যে, পররাষ্ট্র বিভাগের ডকুমেন্ট নিশ্চয় গোলাম হায়দার হত্যারহস্যে কোন না কোন ভাবে জড়িত। কেসটা যে সাধারণ ব্ল্যাকমেলিং কেস নয়, এর পিছনে বিদেশী গুপ্তচরদের কারসাজী আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই

আমার।'

মি. সিম্পসন কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। শহীদ আবার বলল, 'আমার বক্তব্য কেউ গুরুত্ব দিয়ে ভাবার কারণ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আমি পাচ্ছি। কেসটা যদি শুধু ব্ল্যাকমেলিংয়ের হত তাহলে ইয়াকুব চুপ করে থাকত না, খন্দকার ধরা পড়ার ভয়ে আত্মহত্যা করত না, নিহত হত না গোলাম হায়দার এবং বয়স্ক আমান গাজী। সামান্য ব্ল্যাকমেলিংয়ের জন্যে এতগুলো মারাত্মক মারাত্মক ঘটনা ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'আমি নিজে এ সবের কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তোমাকেও এমন বিচলিত আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

শহীদ জানতে চাইল, 'মিস রোশনার শেষ খবর কি?'

'মিস রোশনা ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্লাবে, হোটেলে যুবক আমান গাজীর সাথে। দিনের বেশির ভাগ সময়ই ওরা এক সাথে থাকছে।'

শহীদ বলল, 'ওদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। একটা কথা, বয়স্ক আমান গাজী সম্পর্কে নিখুঁত খবর এখনও আমরা পাইনি ইরাক থেকে। আমি তারের উত্তর পাঠিয়েছি। সে তার আসবে আশা করি আজকালের মধ্যেই। তৈরি থাকবেন, আমার মন বলছে কেসটার সব রহস্য উন্মোচিত হবার দিশা দেখা দেবে ওই তারের খবরেই।'

শহীদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গফুর এল দুটো খাম নিয়ে। শহীদ খাম দুটো হাতে নিয়ে দেখল একটা কামালের চিঠি। কামাল স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে গেছে কক্সবাজারে হাওয়া বদলাতে। দ্বিতীয় খামটা দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শহীদের মুখাবয়ব। খামটা ছিঁড়ে লম্বা একটা কাগজ বের করল ও। মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে তারপর ঘোষণা করল, 'যা আশা করেছিলাম তা এসে গেছে, মি সিম্পসন। ইরাক থেকে আমার তারের উত্তর এসেছে।'

মি. সিম্পসন উত্তেজিত গলায় বললেন, 'কি জানাচ্ছে ওরা?'

শহীদ তারটা পড়ল। তারপর বলল, 'শেখ মোহাম্মদ আমান গাজীর বয়স একষট্টি বছর। ইরাকে জন্ম। উনিশ'শ পঞ্চাশ এবং বাহান্নতে বিদেশী গুপ্তচর হিসাবে গ্রেফতার করা হয় তাকে ইরাকে, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হয় বাধ্য হয়ে। ছাড়া পেয়ে তুরস্ক রওনা হয় সে, সেখান থেকে ইসরাইলে পালায়। ইসরাইল থেকে ছদ্মবেশে সে আবার আসে ইরাকে। ইরাকে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গত পাঁচ সপ্তাহ আগে, কিন্তু গ্রেফতার হবার আগেই সে দেশ ছেড়ে পালায়। ইরাক সরকার এই ছদ্মবেশী গুপ্তচরের সন্ধান পাওয়া মাত্র তাদেরকে খবর পাঠাবার অনুরোধ জানাচ্ছেন।'

শহীদ মি. সিম্পসনকে বিদায় দিয়ে উপস্থিত হল মিস রোশনার বাড়িতে। মিস

রোশনাকে পাওয়া গেল ড্রয়িংরুমে যুবক আমান গাজীর সঙ্গে। শহীদকে দেখেই মিস রোশনা দ্রুত কণ্ঠে প্রশ্ন করে উঠল, 'আমার ভাইয়ের কোন সন্ধান পেলেন?'

শহীত আসন গ্রহণ করে বলল, 'সে প্রশ্ন আমিই করতে এসেছি আপনাদের দু'জনকে।'

আমান গাজী জানতে চাইল, 'আপনার বুঝি ধারণা শামিম গোপনে আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে? এই-ই তো আপনারা শুধু পারেন—খালি ধারণা করা, এই ধারণা করাটা দেখতে পাচ্ছি আপনাদের মজ্জাগত।'

মিস রোশনা বলল, 'তা কেন ধারণা করবেন মি. শহীদ। মি. শহীদ, আপনার ভাবা উচিত শ্যামিম অন্তত এই ভয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে না যে পুলিসের লোক সর্বক্ষণ আমাদের দু'জনকে চোখে চোখে রাখতে পারে। কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে শামিমকে কেন গ্রেফতার করতে চান আপনারা? আমার আব্বাকেই তো খুনী বলে সন্দেহ করেন।'

শহীদ বলল, 'হয়ত দু'জনই দায়ী।'

মিস রোশনা বলল, 'অসুবিধা হল এই যে আপনি ওদের দু'জনকেই ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না। যদি চিনতেন তাহলে বুঝতে পারতেন খুন-খারাবি করার মত মানুষ ওরা দু'জন নয়। আর বিষ-প্রয়োগে হত্যার মত জঘন্য নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতেই পারেন না আমার আব্বা। শামিমও আম্মাকে হত্যা করার কথা কল্পনাও করতে পারে না।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে আপনার বাবাই একদিন আর্সেনিক বিষ বাজার থে ক কিনেছিলেন।'

আমান গাজী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠল, 'যাকগে, ওসব কাজের কথা নয়। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে রোশনা যদি আমার নামের সেই বুড়ো দুর্ভাগা লোকটাকে খুঁজতে ইরাক না যেত তাহলে এ জীবনে ওর সাথে দেখা হত না আমার। লোকটার প্রতি এ-কারণে আমি কৃতজ্ঞ।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'একটা কথা, মিস রোশনা, আপনার আব্বাকে কি সত্যি সত্যি ব্ল্যাকমেল করা হত তার অবৈধ সন্তানের জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কখনও কি শুনেছেন এই সন্তানের কপালে কি ঘটেছিল? কত বয়স হয়েছিল তার? বেঁচে আছে, না মরে গেছে?'

'বয়স, আজ যদি সে বেঁচে থাকে, চৌত্রিশ হবে। ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করার পর আমার আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে সন্তানটিকে প্রতিপালনের জন্যে একজনকে দান করা হয়। কাকে দান করা হয় তা আমাকে বলেননি। সেই লোককে এক কালীন মোটা টাকা দিয়েছিলেন আব্বা। এবং আব্বা সেই লোকের আর কোন খবর পাননি, রাখেনওনি।'

শহীদ চুপ করে রইল। এমন সময় বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলল আমান গাজী। তারপর শহীদের উদ্দেশে বলল, 'আপনার ফোন। মি. সিম্পসন ফোন করেছেন।'

শহীদ রিসিভার নিল। মি. সিম্পসন অপর প্রান্ত থেকে বলে উঠলেন, 'হ্যালো, শহীদ?'

শহীদ বলল, 'বলছি। কি খবর, মি. সিম্পসন?'

'শহীদ, মিসেস জামিলের বাড়ির মেথরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা তথ্য পাওয়া গেছে। যেদিন মিসেস জামিল বিষ ক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন সেদিন সে নাকি শামিম হায়দারকে ও-বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছ, শহীদ? এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে ও-বাড়ির চাকরানী খ্যাঁদার মা শামিম হায়দারকে ভাল চোখে দেখে, তা সে যে-কোন কারণেই হোক, এবং সেদিনের ব্যাপারে সে মিথ্যে কথা বলেছে তোমার কাছে।'

শহীদ উপস্থিত দু'জনার সামনে কোন মন্তব্য না করে মি. সিম্পসনকে জানালেন, 'আমি দেখা করছি খানিক পর আপনার সাথে। ছাড়ছি, ধন্যবাদ।'

রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রেখে শহীদ চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে। আমান গাজী বলে উঠল, 'এই রে! আবার চিন্তা করছেন যেন কিছু? নিশ্চয় কিছু ধারণা করছেন আবার—ওই তো আপনাদের কাজ। তাই না?'

শহীদ হেসে ফেলে বলে উঠল, 'তাই আমার ধারণা!' কথাটা বলে শহীদ বেরিয়ে এল বাইরে।

সিধে মি. সিম্পসনের অফিসে পৌঁছল ও গাড়ি নিয়ে। মি. সিম্পসনকে অবাক করে দিয়ে ও বলল, 'মিসেস জামিলের বাড়িতে হামলা করব আমরা, অন্ধকার নামার পর। ও-বাড়ির পিছনের দরজার চাবিটা আমি যোগাড় করেছি খ্যাঁদার মা'র কাছ থেকে ক'দিন আগে। ওরা যদি আমাদের হামলার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে তাহলে সাবধান হবার সময় পাবে না হাতে। আমি আশা করছি খ্যাঁদার মা'রই সহযোগিতায় শামিম হায়দার আরামে আত্মগোপন করে আছে ওই বাড়িতে। আমাদের সাথে পুলিস তো যাবেই এক গাড়ি, গফুরকেও সঙ্গে নেব আমি। বাড়িটা সার্চ করার ওয়ারেন্ট দরকার হবে, সে ভার আপনার।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ভাল কথা, কমিশনারকে ইরাক থেকে বৈপ্লবিক তথ্যটা দেখানো দরকার বলে মনে করো না তুমি, শহীদ?'

শহীদ বলল, 'দরকার। কমিশনার আমার ওপর নিরাশ হয়েছেন যখন।'

ওরা কমিশনারের অফিসে উপস্থিত হল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই।

'নতুন কোন খবর?'

শহীদ কোন কথা না বলে ইরাক থেকে পাওয়া তারটা টেবিলের উপর রেখে আসন গ্রহণ করল। সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে একমনে টানতে লাগল ও। গভীর

ভাবে কি যেন চিন্তা করছে ও। তারটা পড়া শেষ হয়ে যেতে কমিশনার বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য! এই কেসে তাহলে এমন একজন লোক জড়িত ছিল যে কিনা আন্তর্জাতিক গুপ্তচর! কিন্তু, শহীদ, এতে তো প্রমাণিত হয় না যে পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে কাগজপত্র সরানো হয়েছে···।'

শহীদ বিদায় নেবার জন্যে আসন ত্যাগ করে মৃদু হাসল, 'অফিস থেকে ফাইলপত্র চিরতরে না সরিয়ে নিয়ে গিয়েও বাইরে পাচার করার নানা উপায় আছে।'

সাত

বাড়িটা ঘিরে ফেলা হল রাত এগারোটার সময়। পুলিসবাহিনী আত্মগোপন করে যে-যার জায়গায় সদাসতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শহীদ, মি. সিম্পসন এবং গফুর বাড়ির পিছন দিককার দরজা খুলে প্রবেশ করল ভিতরে। পা টিপে টিপে এগোতে লাগল ওরা প্যাসেজ ধরে একটার পর একটা রুম পাশ কাটিয়ে।

কিচেনরুমে বাতি জ্বলছে। দূর থেকেই দেখতে পেল শহীদ। ওরা তিনজন নিঃশব্দ পায়ে এগোল। কিচেনরুমের ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। শহীদ খ্যাঁদার মা এবং বাবুর্চির গলা চিনতে পারল। হাতে উদ্যত রিভলভার নিয়ে কিচেনরুমের ভিতর ঢুকল ও। পিছনে মি. সিম্পসন ও গফুর।

খ্যাঁদার মা শহীদের হাতে রিভলভার দেখে থরথর করে কেঁপে উঠল হঠাৎ। গলা চিরে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বের হয়ে পড়ার উপক্রম হল। বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গিয়ে খ্যাঁদার মা'র মুখটা চেপে ধরল শহীদ। তারপর গফুরের দিকে তাকিয়ে একটা ইঙ্গিত করল ও। গফুর এগিয়ে এসে বাবুর্চির একটা হাত ধরে টানতে টানতে বের করে নিয়ে গেল বাইরে। শহীদ গফুরকে আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী গফুর বাবুর্চিকে বাইরে দণ্ডায়মান পুলিসের গাড়িতে উঠিয়ে দিতে চলে গেল। হাজত ঘরে কয়েক ঘন্টা বন্ধ করে রাখলে এই ধরনের লোকেরা পেটের কথা সব বের করে দেয়।

গফুর চলে যেতে ধীরে ধীরে খ্যাঁদার মা'র মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল শহীদ। চাপা স্বরে বলল, 'যা জিজ্ঞেস করব তার উত্তর দেবে নিচু গলায়। জোরে কথা বলবার চেষ্টা করলে কপালে খারাবি আছে। শামিম হায়দার সেদিন এ বাড়িতে এসেছিল, অথচ তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে, কেন?'

খ্যাঁদার মা আতঙ্কে কাঁপছে থরথর করে। শহীদ আবার একটা প্রশ্ন করল, 'শামিম হায়দার কি উপরে এখন?'

খ্যাঁদার মা বিস্ফারিত চোখে শহীদের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানাল শুধু—হ্যাঁ।

গফুর ফিরে এল বাবুর্চিকে রেখে। আবার ইঙ্গিত করল শহীদ। এবার গফুর খ্যাঁদার মাকে ধরে নিয়ে গেল গাড়িতে তুলে দিয়ে আসার জন্যে।

গফুর ফিরে এল কয়েক মিনিট পরই। গফুরকে শহীদ চাপা স্বরে বলল, 'তুই একতলায় থাকবি। কাউকে ছুটে পালাতে দেখলে বাধা দিবি। রিভলভারটা বের করে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাক, দরকার না হলে গুলি করবি না কিন্তু।'

'জ্বী, দাদামণি!' নিচু, কিন্তু ভয়ানক গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলল গফুর।

গরিলার মত প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে সিঁড়ির পাশে। শহীদ উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায়। মি. সিম্পসন ওর পিছন পিছন উঠলেন।

চার-পাঁচটা তালা মারা রুমের পর একটা রুমের দরজার সরু ফাঁক থেকে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

শহীদ নিঃশব্দ পায়ে দরজাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার পাল্লায় হাতের ধাক্কা দিয়ে খোলার জন্যে তৈরি হল শহীদ। এমন সময় রুমের ভিতর থেকে একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এলঃ

'হ্যাঁ, আমিই, আমিই! কিন্তু তোমার কথা শুনতে চাই এখন আমি, দিচ্ছ ওগুলো আমাকে?'

শহীদ মেয়েলী কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল না। খুব ধীরে ধীরে, উত্তেজিত ভাবে, কিন্তু নিচু স্বরে কথা বলছে মেয়েমানুষটা। বোঝা যায় প্রতিশোধবশত কারও সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় সে, গলা শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারল শহীদ।

'সব কথাই জানা ছিল আমার, সব কথা!'

আবার শোনা গেল সেই মেয়েলী কণ্ঠস্বর। পরক্ষণেই একটি পুরুষ কণ্ঠস্বর শহীদের কানে ঢুকল, 'তুমি নেহাত ডাইনী একটা!'

'ওসব কথায় তোমার প্রতি আমার কোন মায়া মমতা জন্মাবে না। এখনও বলো বলছি কোথায় আছে সেই কাগজপত্রগুলো। তা না হলে…তা না হলে তোমার কপালে দুর্ভোগ আছে, শামিম!'

এই ক'টি কথা মেয়েলী কণ্ঠস্বরে আবার শুনতে পেল শহীদ। ও বুঝল মেয়েলোকটা কঠোর মন নিয়ে কথা বলছে। মেয়েমানুষটাকে চিনতে না পারলেও, শহীদ বুঝতে পারল পুরুষ কণ্ঠটা শামিম হায়দারের। তবে কি শামিম হায়দার কোন মেয়েকে নিয়ে এ বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে?

শামিম হায়দারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ডকুমেন্টের কথা আমি কিছু জানি না। যাও তুমি। তোমার রিভলভার সরিয়ে নাও বলছি।'

'না। এই মুহূর্তে যদি তুমি কাগজপত্রগুলোর কথা না বলো তাহলে কি করব জানো…তোমাকে আমি হাসতে হাসতে গুলি করব…।'

পিশাচিনীর মতই হেসে উঠে কথাগুলো বলল মেয়েলোকটা। আবার বলল সে 'ছেলেখেলা করছি না আমি, শামিম। তাড়াতাড়ি করো. যদি মরতে না চাও।

গোলাম হায়দারকে মেরেছি, তোমাকেও…!'

শহীদ নিঃশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মি. সিম্পসনের দিকে। তারপর আবার দরজার দিকে তাকাল ও। দরজার হাতলটা সন্তর্পণে ঘুরিয়ে দিল ও। তারপর হাতের রিভলভারটা দেখে নিল একবার চোখ বুলিয়ে। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎবেগে দরজার গায়ে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল পাল্লা দুটো। রুমের উজ্জ্বল বিজলী বাতিতে চোখ ঝলসে উঠল ওর। ও দেখল শামিম হায়দারের দিকে রিভলভার ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন বয়স্কা মহিলা। মহিলা বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শহীদের দিকে। পলকের মধ্যে রিভলভারটা ঘুরিয়ে ধরল সে শহীদের বুক লক্ষ্য করে। মি. সিম্পসন শহীদের পিছন থেকে চিৎকার করে উঠলেন উত্তেজিত গলায়, 'সাবধান, শহীদ!'

মি. সিম্পসন চিৎকার করার আগেই শহীদ বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়েছে। লাফিয়ে পড়ার পূর্বক্ষণে মহিলাকে চিনতে পারল শহীদ। বিস্ময়ে বিমূঢ় না হয়ে পারল না। মিসেস জামিল যে সব কীর্তিকলাপের জন্যে দায়ী তা ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

শহীদ লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল মিসেস জামিলের রিভলভার।

গুলিটা গিয়ে লাগল দেয়ালের গায়ে।

শহীদ বজ্রকঠিন হাতে মুচড়ে ধরল মিসেস জামিলের রিভলভার ধরা হাতটা। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল মিসেস জামিলের মুখ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে শহীদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে হিংস্র তাড়নায় নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন মিসেস জামিল। মি. সিম্পসন এগিয়ে এসে মিসেস জামিলের হাতে পরিয়ে দিলেন একজোড়া হাতকড়া। তারপর ঠেলে বসিয়ে দিলেন তাঁকে একটা চেয়ারে। মিসেস জামিল চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে ব্যর্থ আক্রোশে হাঁপাতে লাগলেন।

বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শামিম হায়দার হতচকিত হয়ে। এমন সময় বেজে উঠল কলিংবেল। মি. সিম্পসন বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে। শহীদ শামিম হায়দারকে জিজ্ঞেস করল, 'মি. শামিম, আপনি নিশ্চিত ভাবে কখন জানতে পারলেন যে আপনার আম্মাই আসল অপরাধী?'

বিমূঢ়, বিচলিত কণ্ঠে শামিম হায়দার বলল, 'এই মাত্র, মাত্র দশ মিনিট আগে, মি. শহীদ! এখানে উনি আসার আগে পর্যন্ত কিছুই জানতাম না আমি…'

'পলাতক হবার কারণ কি আপনার?'

'ভেবেছিলাম আমি পালালে আপনারা আমার প্রতি সন্দেহ করবেন, তাতে উপকার হবে আমার আব্বার। সেই একই কারণে আমি মিছে করে বলেছিলাম যে সেদিন আমি আম্মার সাথে দেখা করতে আসিনি। খ্যাঁদার মা যাতে কথাটা প্রকাশ না করে তার জন্যে তাকে টাকা দিয়েছিলাম। আপনাকে বোকা বানাতে

চেয়েছিলাম আমি।'

শহীদ অনুমান করে একটা কথা বলে ফেলল, 'আপনি জানতেন তাহলে যে আপনার আব্বা কাজের জন্যে বাড়িতে যে-সব ডকুমেন্ট অফিস থেকে দু'একদিনের জন্যে আনতেন আপনার আম্মা সেগুলোর ছবি তুলে বিক্রি করত বা কাউকে দিয়ে দিত?'

'হ্যাঁ…হ্যাঁ। অনেক দিন থেকেই জানতাম…।'

এমন সময় মি. সিম্পসন ফিরে এলেন নিচ থেকে। পিছন পিছন রুমের ভিতর ঢুকল মিস রোশনা হায়দার এবং যুবক আমান গাজী।

ওরা দেখল মিসেস জামিলের হাতে হাতকড়া লাগানো। মিস রোশনা হতভম্ব চোখে তাকাল শহীদের দিকে। গলা দিয়ে স্বর বের হল না ওর। পা পা করে এগিয়ে গেল সে মায়ের দিকে। মায়ের কাছে গিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ও।

মিসেস জামিল আচমকা মুখ তুলে তাকালেন। মেয়েকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অকস্মাৎ খেপে গেলেন যেন তিনি। দুহাত তুলে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করলেন তিনি মেয়ের কোমরে।

পিছিয়ে এল মিস রোশনা। তার চোখের কোণে পানি। মিসেস জামিল চেয়ারের হাতলে মাথা ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন এবার। মিস রোশনা অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'কি হয়েছে!'

শহীদ বলল, 'আমরা এখন জানতে পেরেছি সকল ঘটনা। মিসেস জামিলই হত্যা করেছেন গোলাম হায়দারকে। এবং আপনার আব্বা সকল দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কেননা তিনি সম্পূর্ণ সত্য জানেন না। মিস রোশনা, আপনি আসল সত্যটা অনুমান করেছিলেন, তাই না?'

মিস রোশনা বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে যে আম্মা…।'

শামিম হায়দার উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আম্মা করেছে। আম্মা আমাকে বলেছে যে তিনিই করেছেন। পোকা মারবার ওজুহাত দেখিয়ে আব্বাকে দিয়ে আর্সেনিক বিষ কিনিয়ে আনিয়েছিলেন তিনি। আম্মা জানতেন যে গোলাম হায়দার আব্বাকে ব্ল্যাকমেল করছিল, সেটাই ওঁকে সুযোগ করে দেয়। আম্মা বহুদিন থেকে দেশের গোপন দলিলপত্র বিক্রি করে আসছিলেন। আব্বা কাজের জন্যে যত দলিলপত্র বাড়িতে আনতেন আম্মা গোপনে সেসবের ফটো তুলে নিতেন। কয়েক মিনিট করে সময় লাগত এতে। সেই ছবিগুলো আম্মা দিতেন গোলাম হায়দারের হাতে। অবৈধ সন্তানের কথা জানত বলে গোলাম হায়দার আব্বাকে ব্ল্যাকমেল করতো। আম্মা ও আব্বাকে দিয়ে সে দু'ভাবে কাজ আদায় করত। তারপর আব্বা রিটায়ার করলেন, আর নতুন ডকুমেন্ট পাবার কোন উপায়

রইল না। এবার গোলাম হায়দার ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করল আম্মাকে—আম্মা গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে। সেই কারণেই আম্মা তাকে হত্যা করেন। গোলাম হায়দা আব্বার সাথে একটা নির্জন হোটেলে দেখা করেছিল তা ঠিক। কিন্তু আম্মাও সে একই সময়ে দেখা করেছিলেন গোলাম হায়দারের সাথে। গোলাম হায়দারে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেন আম্মা। আব্বা অবশ্যই জানেন যে আম্মা গোলা হায়দারকে খুন করেছেন। কিন্তু আম্মাকে বাঁচাবার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কার আম্মার গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে আব্বা নিজেকেই মনে মনে দায়ী করেন।'

শামিম হায়দার দম নিয়ে বলে চলল, 'আম্মা ভেবেছিলেন গোলাম হায়দারে হত্যা করলে সব বিপদ কেটে যাবে। কিন্তু তা হয় না। খন্দকার মাকে চাপ দিে থাকে। শেষ ডকুমেন্টটার জন্যে। ফলে আম্মার মাথা খারাপের মত অবস্থা হে দাঁড়ায় দুশ্চিন্তায়…।'

মি. সিম্পসন জানতে চাইল, 'মিসেস জামিল গোলাম হায়দারকে খুন করলে কেন?'

শামিম হায়দার অধৈর্যভাবে বলে চলল, 'সে আম্মাকে ব্ল্যাকমেল করতে শু করছিল বলে। নতুন কোন ডকুমেন্ট পাবার আশা নেই দেখে নতুন উপা রোজগার করার কথা মাথায় আসে গোলাম হায়দারের। সে আম্মাকে ব্ল্যাকমে করতে শুরু করে। দলিল-পত্র বিক্রি করার ব্যবস্থা আম্মা শুরু করে বেশ কয়ে বছর আগে। সেগুলো কিনত শেখ মোহাম্মদ আমান গাজী। এই লোকটা আম্মা আব্বা-আম্মার পুরাতন পারিবারিক বন্ধু ছিল এককালে। খন্দকার নামে একজ লোকের সাথেও সম্পর্ক ছিল আম্মার। খন্দকার বড় ধরনের একজন বিদেশ এজেন্ট। ঢাকায় থাকত।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'আমরা গ্রেফতার করেছিলাম মি. জামিলকে গোলা হায়দারকে হত্যা করার জন্যে। আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হয় অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি চিঠি পেয়ে। সেই চিঠিতে লেখা ছিল—"গোলাম হায়দারকে খুন কর হয়েছে"। কে পাঠিয়েছিল এই চিঠি?'

'খ্যাঁদার মা।'

'মানে!' অবাক হয়ে বলে উঠল শহীদ।

শামিম হায়দার বলল, 'হ্যাঁ, খ্যাঁদার মা-ই পাঠিয়েছিল। আম্মাকে সে ঘৃ করে। কেননা একজন লোকের সাথে ওর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। লোকটা এ বাড়ি ড্রাইভার ছিল। আম্মা ব্যাপারটা জেনে ফেলে ড্রাইভারকে বিদায় করে দেয় খ্যাঁদার মা'র রাগ সেই থেকে। তাছাড়া খন্দকারের কাছ থেকে টাকা পেয়ে ে ছোটখাট একজন গুপ্তচরও হয়ে উঠেছিল। পরে যখন সে দেখল পুলিস আম্মাে গ্রেফতার করতে পারছে না এবং যখন খন্দকার হুকুম দিল, তখন সে আম্মাকে বি খাইয়ে দেয়।'

'আপনি এত কথা জানলেন কেমন করে?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'বাবুর্চির সাথে ভাল সম্পর্ক এখন খ্যাঁদার মার। বাবুর্চিকে যখন সব কথা বলছিল সে, তখন আড়ি পেতে সব শুনেছি আমি। অবশ্য খ্যাঁদার মা-ই আমাকে এ বাড়িতে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। আমি লুকিয়ে থেকে রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছিলাম—আব্বাকে মুক্ত করবার জন্যে। কিন্তু আব্বাকে মুক্ত করতে গিয়ে আমার নিজের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে তা কে ভেবেছিল! কি ভীষণ লজ্জার কথা যে আমার নিজের জননী, আমাকে খুন করে ফেলতে চাইছিল! আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আপনারা সময় মত উপস্থিত না হলে আমি এতক্ষণ রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে থাকতাম। আমি আর রোশনা যা যা ভয় করেছিলাম তার সবই সত্য ছিল। রোশনা ইরাকে গিয়েছিল সেই নিহত বুড়ো আমান গাজীর সন্ধানে। ও জানতে গিয়েছিল ব্ল্যাকমেলিংয়ের ব্যাপারটা অবৈধ সন্তানের কারণে সৃষ্টি, নাকি এর পিছনে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। ওকে আমিই পাঠিয়েছিলাম। গোলাম হায়দার নিহত হবার আগে থেকেই চরম দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছিলাম আমরা।'

'কেন?' প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন।

'ইয়াকুব আমাদেরকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেছিল বলে। ইরাকে যাবার আগে রোশনা আম্মার রুম থেকে কিছু দলিল-পত্রের ফটোকপি পেয়েছিল, তার সাথে ছিল ইরাকের বুড়ো আমান গাজীকে লেখা একটা চিঠি। ওগুলো দেখেই ব্যাপারটা টের পায় রোশনা। প্রশ্ন দেখা দেয় আম্মা কেন এসব দলিল জাল করে বিক্রি করছেন? আম্মাকে কি ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে, না…।'

হঠাৎ থেমে গেল শামিম হায়দার। তারপর বলল, 'যাই হোক, আমরা ঠিক করি ব্যাপারটা জানতে হবে যেমন করেই হোক। কিন্তু রোশনা বুড়ো আমানের দেখা পায়নি ইরাকে। বুড়ো আমান ঢাকায় পালিয়ে এসেছে, এইটুকুই কেবল জানতে পারি আমরা। আম্মাকে সে টেলিফোন করে জানায় যে সে বিপদে পড়েছে।'

শহীদ বলল, 'বুড়ো আমান গাজীর নিয়োগ কর্তারা মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছিল তাকে। মি. শামিম, আপনি বলতে পারেন কি ধরনের ডকুমেন্ট ইয়াকুব চেয়েছিল আপনার কাছ থেকে?'

মিস রোশনা বলল, 'হ্যাঁ। আম্মার রুমে ফটোগ্রাফটা দেখেছিলাম আমি। ওগুলো কিভাবে যেন চুরি হয়ে যায়। এবং ইয়াকুব মনে করে সেগুলো আমরা নিয়েছি। ডকুমেন্টগুলোর ব্যাপারে আমরা মিথ্যে কথা বলেছিলাম, কেননা আমরা চেয়েছিলাম আব্বাকে রক্ষা করতে এবং চেয়েছিলাম ডকুমেন্টের কথা আর আম্মার অপরাধের কথা কেউ যাতে জানতে না পারে।'

যুবক আমান গাজী বলে উঠল, 'আমি কিন্তু মনে মনে ইয়াকুবকে ঘৃণা করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। আমার মন যেন জানত ইয়াকুব তোমাদেরকে ব্ল্যাকমেল

করছে। সেই জন্যেই ওকে অমনভাবে ধরে মেরে ফেলতে গিয়েছিলাম নিজেরই অজান্তে। মি. শহীদ, আপনার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি মনে করেছিলেন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ইয়াকুবকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম আমি। আপনার কোন দোষ দিই না আমি। সে ব্যাপারে আমি লজ্জিত।'

'ফটোকপি আছে?' শহীদ জিজ্ঞেস করল।

'না।' দু'ভাইবোন উত্তর দিল একই সঙ্গে।

কয়েক দিনের মধ্যেই শেখ এবং শেখের ছেলে ধরা পড়ল। দেশের গুপ্তচর বিভাগ উঠে পড়ে কাজ শুরু করে দিল বিদেশী গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে। জানা গেল গোলাম হায়দার ঢাকার বিদেশী দূতাবাস থেকে মোটা টাকা নিত গোপনীয় দলিল-পত্র হস্তান্তরিত করে। সেই একই দূতাবাসের শাখা বুড়ো আমান গাজীকে টাকা দিত ইরাক থেকে। মিসেস জামিলের সঙ্গে বুড়ো আমান গাজীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল বহু বছর আগে থেকে, এমন কি মিসেস জামিলের বিয়েরও বহু আগে থেকে। এই গোপন সম্পর্কের খবরটা বুড়ো আমান গাজী মি. জামিল হায়দারকে জানিয়ে দেবে বলে ভয় দেখায় মিসেস জামিলকে। মিসেস জমিল ভয় পেয়ে বুড়ো আমান গাজীর প্রস্তাব মত গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করতে রাজি হন। সেই থেকে গোলাম হায়দারের মাধ্যমে মিসেস জামিল বুড়ো আমান গাজীকে ডকুমেন্টগুলোর ফটোকপি সরবরাহ করে আসছিলেন। এ কাজে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা বুড়ো আমান গাজী যদি বিয়ের আগের তাদের সম্পর্কের কথা মি. জামিলকে জানিয়ে দিত তাহলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত।

অন্য আর একটি বিদেশী গুপ্তচর বিভাগের তরফ থেকে মঞ্চে আগমন ঘটে খন্দকারের। খন্দকার নিয়োগ করে ইয়াকুবকে। মি. জামিলের নতুন বিবৃতি অনুযায়ী জানা গেল ইয়াকুবই তার সেই অবৈধ সন্তান।

বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল মিসেস জামিলের।

মি. জামিল বেকসুর মুক্তি পেলেন।

কিছুদিন পর একটা নিমন্ত্রণ-পত্র পেল শহীদ। মিস রোশনা এবং যুবক আমান গাজীর বিয়ের।

ভলিউম ১১
কুয়াশা
৩১, ৩২, ৩৩
কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এবই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০